কে কথা কয়

হুমায়ূন আহমেদ

সূচিপত্র

১. অতি তুচ্ছ একটা বিষয় 3
২. চিঠি এসেছে হাতে হাতে....................34
৩. কথা মন দিয়ে শুনছেন....................49
৪. ইমরান সাহেবের ঘুম....................71
৫. কমল তার বাবার পাশে বসে আছে 98
৬. উজবেক মরমী কবি নদ্দিউ নতিম....................124
৭. কমল মেঝেতে বসে আছে....................147
৮. মতিন তার মেসের ঘরে শুয়ে আছে....................165
৯. হ্যালো মতিন....................195
১০. কমল তার খেলনা সাজানো শেষ করেছে 200
১১. ভোরের স্বদেশ পত্রিকা....................216
১২. বোনের বিয়ে ঠিক 243
১৩. সুইজারল্যান্ডে পড়তে যাবার ব্যাপারে....................260

১৪. নদ্দিউ নতিম সাহেবের গল্পের বই 274

১৫. তৌহিদা এসেছে নিউ সালেহা ফার্মেসিতে 279

১৬. ফার্মেসির ম্যানেজার হেদায়েতুল ইসলাম 296

১৭. তৌহিদাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে 311

১৮. অনেক দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে....................331

১৯. সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ 357

২০. কমল ছাদে....................360

২১. সালেহার বুক থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে....................380

২২. মুনা অবাক 397

২৩. চিঠিটা পড়ে ধাক্কার মতো....................413

২৪. একটা কবিতার লাইন....................416

২৫. নিশু ব্যাগ গোছাচ্ছে....................435

২৬. কম্পিউটারে কমলের গোপনীয় ডায়েরি....................445

২৭. মৃন্ময়ী জঙ্গলে এসে পৌঁছেছে....................460

২৮. সালেহ ইমরান কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন....................464

২৯. এই জীবনটাও তো সুন্দর....................472

১. অতি তুচ্ছ একটা বিষয়

ভূমিকা

আমার মেজো মেয়ে শীলা তখন ক্লাস টু কিংবা থ্রিতে পড়ে। তার হোমওয়ার্কের খাতা উল্টেপাল্টে দেখছি–এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। দেখি সে একটা সম্পূর্ণ লাইন উল্টো করে লিখেছে। এটা কি তার কোনো খেলা? ভালোভাবে দেখতে গিয়ে হতভম্ব। তার খাতাভর্তি এই ব্যাপার। অনেক লাইন উল্টো করে লেখা। আয়নার সামনে ধরলেই শুধু পড়া যায়। ডাক্তাররা বললেন, কিছু কিছু ইনফরমেশন তার মাথায় উল্টো করে আসে। ইংরেজিতে একে বলে Dyslexia। অটিস্টিক শিশুদের এরকম হয়।

অটিজম বা অটিস্টিক শিশুদের বিষয়ে সেই আমার সাঙ্গ পরিচয়। তারও অনেককাল পরে নুহাশ পল্লীতে একটি অটিস্টিক শিশুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। বাবা-মা বাচ্চাটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। তাকে ছেড়ে দিয়েছেন আম বাগানে। সে গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। মাঝে মাঝে নিচু হয়ে শুকনো পাতা কুড়িয়ে পকেটে রাখছে। বাচ্চাটার কাণ্ড দেখে মজা পেয়ে তার কাছে যাচ্ছি, বাচ্চার বাবা বিনীতভাবে বললেন, স্যার, যাবেন না। সে অপরিচিত কাউকে দেখলে প্রচণ্ড ভয় পায়। অপরিচিত কেউ তার গায়ে হাত দিলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এছাড়া তার আর কোনো সমস্যা নেই। সে অসম্ভব মেধাবী একজন ছাত্র। শুকনোপাতা কুড়ানো ছেলেটির সঙ্গে আমার কোনো কথা হলো না। এই বিষয় নিয়ে কোনোদিন কিছু লিখব সেরকম ইচ্ছাও তৈরি হলো না।

বছর তিনেক আগে লন্ডন থেকে ট্রেনে করে স্কটল্যান্ড যাচ্ছি। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। বাইরের দৃশ্য যত সুন্দরই হোক এত দীর্ঘ সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না। ট্রেনে পড়ার জন্যে একগাদা বই কিনলাম। এর মধ্যে একটা বইয়ের লেখিকা Karen Armstrong। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইটার নাম The Spiral Staircase। বইটিতে লেখিকা একটি অটিস্টিক শিশুর কথা লিখেছেন। কিছুদিন এমন একটি শিশুর তিনি বেবিসিটার ছিলেন।

কে কথা কয় উপন্যাসটির বীজ Karen Armstrong-এর বইটি থেকে এসেছে। আমি গবেষকটাইপ লেখক না যে, কিছু লেখার আগে বিস্তর গবেষণা করব। এই বইটিতে করতে হয়েছে। ইন্টারনেটের কারণে গবেষণা সহজ হয়ে গেছে। সব তথ্যই। আঙুলের মাথায়। বোতাম টিপতে পারলেই হলো।

Mark Haddon-এর লেখা–The curious incident of the dog in the night time বইটিও আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

কে কথা কয় গাঢ় আনন্দ নিয়ে লিখেছি। আনন্দের কিছু ভাগ পাঠক পেলেই জন্ম সার্থক মনে করব।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী

———–

০১.

এই মুহূর্তে অতি তুচ্ছ একটা বিষয় মতিনের মাথা আউলা-ঝাউলা করে দিচ্ছে। মতিনের উচিত বিষয়টা মাথা থেকে দূর করে সহজ স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া। সে তা পারছে না। অতি তুচ্ছ চিন্তার বিষয়টা এরকম–মতিনের সামনে যিনি বসে আছে তিনি অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন, আপনার নাম কী? তখন মতিন কী বলবে? সে কি তার পুরো নামটা বলবে, সার্টিফিকেটে যে নাম আছে সেই নাম–মতিন উদ্দিন খান পাঠান? শুরুতেই ইমপ্রেশন খারাপ হয়ে যাবে না? এমন একজন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে যার নামের শেষে খানও আছে পাঠানও আছে। পাঠান এমন পদবি যার শেষ অক্ষর বাদ দিলে হয়–পাঠা। চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করলে বাংলার আদি অকৃত্রিম পাঁঠা।

সে বলতে পারে, স্যার, আমার নাম মতিন। এটাও হবে ভুল। ফরম্যাল ইন্টারভিউতে ডাকনাম বলা যায় না। মতিন উদ্দিন বলা যায়, তাতেও সমস্যা আছে। তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে–সার্টিফিকেটে লেখা নাম মতিন উদ্দিন খান পাঠান, তুমি শুধু মতিন উদ্দিন বলছ কেন?

টেনশনে মতিনের পানির পিপাসা এবং ছোট বাথরুম একসঙ্গে পেয়ে গেল। মানুষের যখন তৃষ্ণা পায় তখন ছোট বাথরুম পায় না। আবার যখন ছোট বাথরুম পায় তখন তৃষ্ণা পায় না। মতিনের এই দুই জিনিস একসঙ্গে পায়। কেন পায় সে জানে না। ডায়াবেটিস হলে কী হয়? কে জানে তার হয়তো ভয়ঙ্কর ডায়াবেটিস আছে। পরীক্ষা করা হয় নি বলে এতদিন ধরা পড়ে নি। ডায়াবেটিস বিষয়ক নতুন চিন্তা মাথায় ঢুকতে চেষ্টা করছে। কিছুতেই এই চিন্তা মাথায় ঢুকতে দেয়া যাবে না। যিনি তার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তার

বিষয়ে চিন্তা করতে হবে–সুপুরুষ একজন মানুষ। মাথার চুল পেকে গেছে, এই নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। চুলে কলপ দেন না। ভদ্রলোক এখন সামান্য ঝুঁকে আসছেন। এখন কি প্রশ্ন করবেন?

তোমার নাম মতিন উদ্দিন খান পাঠান?

জি স্যার।

নামের শেষে দুটা পদবি সচরাচর দেখা যায় না।

স্যার, আমার নামটা রেখেছিলেন আমার বাবার পীর সাহেব। পীর সাহেবের দেশ ইউপিতে–সেখানে মনে হয় এই ধরনের নাম রাখা হয়।

তোমার পড়াশুনা কতদূর?

ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পাস করেছি। এমএ করার ইচ্ছা ছিল। টাকা পয়সা জোগাড় হয় নি। (আবার উত্তরে ভুল হয়ে গেল। টাকা-পয়সা জোগাড় হয় নি কথাটার মধ্যে ফকির ভাব আছে। করুণা প্রার্থনা। আমাকে দয়া কর, ভিক্ষা দাও টাইপ প্রার্থনা।)

অনার্সের রেজাল্ট কী?

রেজাল্ট ভালো না। সেকেন্ড ক্লাস। নিচের দিকে।

Autusic শব্দটার মানে জানো?

জি-না স্যার।

Autistic baby, Autistic children এ ধরনের শব্দ পাও নি?

জি-না।

মতিন পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেল। সামান্য একটা শব্দের মানে না জানার জন্যে চাকরি হবে না, এটা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। বড় বড় দুর্ঘটনা অতি সামান্য কারণে ঘটে। মতিনের বড় মামা কলা খেতে খেতে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজার থেকে ফিরছিলেন। নিজের ছুড়ে ফেলা কলার খোসায় পা পিছলে তিনি উল্টে পড়ে গেলেন। লোকজন ধরাধরি করে তুলল, তিনি বসা অবস্থা থেকে আবার পড়ে গেলেন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার দেখে বললেন, মারা গেছে।

তোমার নামটা তো অনেক বড়। ছোট করে কী ডাকা যায় বলো তো?

মতিন ডাকতে পারেন স্যার।

মতিন তোমার ডাকনাম?

জি-না, আমার ডাকনাম মতি।

তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমার স্ত্রী চলে আসবে, তখন দুজনে মিলে তোমার সঙ্গে কথা বলব। এর মধ্যে চা খাও। আমি তোমাকে চা দিতে বলে দিচ্ছি।

স্যার, আমার একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার, বড়টা না, ছোটটা।

অফকোর্স। যে চা নিয়ে আসবে সে তোমাকে বাথরুম দেখিয়ে দেবে। ফিল ফ্রি।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। মতিনের ইচ্ছা করছে নিজেকেই নিজে লাথি মারে। উনার সঙ্গে বাথরুম নিয়ে এত কথা বলার কিছুই ছিল না। উনি তো চলেই যাচ্ছেন। উনি চলে যাওয়া মানেই ফাকা ঘর। তখন সে দারোয়ান, বয় বাবুর্চি টাইপ যে-কোনো একজনকে বলতে পারত–ভাই, আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে? আমার হাত-মুখ ধোয়া দরকার। তা না বলে সে বলেছে, আমার একটু বাথরুমে যাওয়া দরকার। বড়টা না, ছোটটা। বাথরুমে গিয়ে সে কী করবে সেটা তার ব্যাপার এত ব্যাখ্যা কেন? তবে এখনো পুরোপুরি নিরাশ হবার মতো ঘটনা ঘটে নি। মূল ইন্টারভিউ বেগম সাহেবের অ অপেক্ষা করছে আসল চাবিকাঠি নিশ্চয়ই তার হাতে। রাজা দেশ চালালেও চাবি থাকে রানীর কাছে। অবশ্যি রানী দেশ চালালে চাবি তাঁর কাছেই থাকে। তারা কখনো রাজাকে চাবি দেন না। রানীরা চাবি হাতছাড়া করেন না।

মতিনের জন্য চা এসেছে। মাঝারি সাইজের কাচের ট্রেতে চায়ের কাপ। ট্রে এবং চায়ের কাপের মধ্যে যোগাযোগ আছে। যে ডিজাইনের ট্রে, একই ডিজাইনের চায়ের কাপ। এত সুন্দর লাগছে দেখতে! মতিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। সব সৌন্দর্য ক্ষমতাবানদের হাতে চলে যাচ্ছে। মহান কোনো শিল্পী অপূর্ব কোনো ছবি আঁকলেন, সেই ছবির স্থান হলো গার্মেন্টসের মালিকের বসার ঘরে।

বেয়ারা টাইপ লোকটি চায়ের ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, স্যার, আসেন আমার সঙ্গে।

মতিন অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাব?

বড় সাহেব বলেছিলেন, আপনি বাথরুমে যাবেন।

ও আচ্ছা আচ্ছা। গুড। চল যাই। তোমার নাম কী?

লোকটি নাম বলল না। বিরক্ত মুখে সে হাঁটছে। মতিন তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। অতি ধনবানদের কাজের লোকরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় যায় না। ব্যাপারটা মতিনের মনে ছিল না। মনে থাকলে নাম জানার ঝামেলায় যেত না।

বাথরুম দেখে মতিনের চোখ ঝলসে গেল। এমন একটা সুন্দর জায়গায় ছোট বাথরুম করা গেলেও বড় বাথরুম করা সম্ভবই না। মতিন কাজ সারলো। চোখে-মুখে পানি দিল। বাথটাবের এক কোনায় বসল। এ জাতীয় বাথরুমে আবার আসার সুযোগ নাও আসতে পারে। সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার। যেখানে সে বসেছে সেখানে কাচের জারে একগাদা সাবান। কোনোটা মাছের মতো, কোনোটা ফুলের মতো। একটা সাবান পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা খুব কি অন্যায় হবে? সাবানের হিসাব কি তাদের কাছে আছে? চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বের হয়ে চায়ে চুমুক দেয়া দরকার। চায়ের কথা মনে হতেই মতিনের সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বাথরুমের কোথাও লেখা নেই–নো স্মোকিং। একটা সিগারেট ধরিয়ে দ্রুত কয়েকটা টান দেয়া যায় না? বাথরুম গান্ধা হয়ে যাবে? বাথরুম তো গান্ধা হবার জন্যেই। কমোডে যে জিনিস ফেলা হয় তা থেকে নিশ্চয়ই কর্পূরের সুবাস বের হয় না!

মতিন সিগারেট ভেবে প্যান্টের পকেট থেকে যে জিনিস বের করল তার নাম মোবাইল সেট। মোবাইল টেলিফোন নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মতো আর্থিক অবস্থা মতিনের না। এই বস্তুটি তাকে দিয়েছে নিশু। নিশু তার সঙ্গেই পড়তো। মতিন ছিটকে বের হয়ে এসেছে, নিশু বের হয় নি। সে এমএ শেষ করেছে। এখন তার ইংল্যান্ডে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে ফনেটিক্সে পিএইচডি করবে। নিশুকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই সে ফাটাফাটি ভালো ছাত্রী। অনার্স, এমএ দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস।

নিশুর সঙ্গে মিনিটখানিক কথা বললে কেমন হয়? এক মিনিটে চা আর কতটা ঠাণ্ডা হবে? হলে হবে।

হ্যালো নিশু!

তুমি কোথায়?

আমি টাট্টিখানায়।

টাট্টিখানায় মানে? টাট্টিখানা কী?

টাট্টিখানা শব্দটি প্রায় লুপ্ত। এটা কোনো তৎসম শব্দ না। আদি বাংলা শব্দ। এর অর্থ বাথরুম। আমি এই মুহূর্তে বাথরুমে বসে আছি। হাইফাই ধরনের বাথরুম।

বাথরুম থেকে টেলিফোন করেছ কেন?

খুবই জরুরি কারণে টেলিফোন করেছি। Autistic শব্দটার মানে জানো?

কেন জানব না! Autistic শব্দটা এসেছে Autism থেকে। বিশেষ একধরনের মানসিক ব্যাধি। Austistic children. যে সব শিশুর এই সমস্যা থাকে তারা নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকে। নিজেদের একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে নেয়। Autistic শিশুদের কিছু বিশেষ বিশেষ গুণ দেখা যায়। এরা সাধারণত খুব মেধাবী হয়। অঙ্ক ভালোবাসে। এতে হবে, না-কি আরো বলব?

এতেই হবে। নিশু, তুমি এত জ্ঞানী কেন? যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তার কপালে দুঃখ আছে। স্বামীরা আর যাই পছন্দ করুক, জ্ঞানী স্ত্রী পছন্দ করে না। স্বামীদের পছন্দের তালিকায় একনম্বরে আছে ফর্সা, হাবা টাইপ স্ত্রী।

মতিন, তুমি কি বিকেলে আমাদের বাসায় আসতে পারবে?

পারব।

ঠিক পাঁচটায় আসবে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। আচ্ছা, তুমি কি সত্যি বাথরুম থেকে কথা বলছ?

হুঁ। বিশ্বাস না হয় আমি এখন ফ্ল্যাস টানব। ফ্ল্যাসের শব্দ শুনবে। রেডি, ওয়ান-টু-থ্রি।

মতিন ফ্ল্যাস টানল।

মতিনের ইন্টারভিউ শুরু হয়েছে। ব্যারিস্টার সালেহ ইমরান সাহেবের পাশে যে তরুণী বসে আছেন ইনিই বোধহয় তার স্ত্রী। ব্যারিস্টার সাহেবের বয়স পঞ্চাশের উপরে হলেও তাঁর স্ত্রীর বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশি হবার কোনোই কারণ নেই। মতিনের মনে হলো সে তার জীবনে এমন রূপবতী মেয়ে দেখে নি। তবে সে এই তরুণীর দিকে তাকাতে পারছে না। ইনি অতিরিক্ত লো-কাট ব্লাউজ পরেছেন। মতিনের তাকাতে লজ্জা লাগছে। সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে এই তরুণীর দিকে তাকিয়ে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এই তরুণী কী ধরনের ব্লাউজ পরেছেন তা তিনি জানেন। এ ধরনের ব্লাউজ পরলে পুরুষরা তাঁর দিকে কীভাবে তাকাবে তাও জানেন। তাহলে মতিনের লজ্জা পাবার কী আছে!

ব্যারিস্টার সাহেব কোনো কথা বললেন না। কথা শুরু করলেন তাঁর স্ত্রী।

Autistic children এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনি পরিচিত?

মতিন জবাব দেবার আগেই ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, মুনা, এটা সে জানে না। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

মতিন বলল, স্যার, এখন আমি জানি। এটা শিশুদের একধরনের মানসিক পীড়া।

মুনা বললেন, আমাদের একটাই ছেলে। বয়স টেন প্লাস। সে Autistic child. আমরা তার জন্যে একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গী খুঁজছি। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে এই বিষয়টি আমরা অবশ্যি ব্যাখ্যা করি নি।

মতিন সামান্য হকচকিয়ে গেল। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল–একজন সার্বক্ষণিক টিউটর প্রয়োজন। টিউটরের সৃজনশীলতা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে ধরা হবে। বেতন আকর্ষণীয়।

তার কোনোরকম সৃজনশীলতা আছে বলে সে মনে করে না। অবশ্যি একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় তার দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের বিষয় উজবেক কবি নদ্দিউ নতিমর কাব্যভাবনা। খুবই খটমটে ধরনের প্রবন্ধ। চাকরির দরখাস্তের সঙ্গে দুটি প্রবন্ধের ফটোকপিও সে দিয়ে দিয়েছে। তাকে ইন্টারভিউতে কেন ডাকা হয়েছে সে বুঝতে পারছে না। মানসিক প্রতিবন্ধী একটি শিশুর সঙ্গে উজবেক কবি নতিমের কাব্যভাবনার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

ব্যারিস্টার সাহেব এইবার কথা বললেন। এই ভদ্রলোকের গলার স্বর ভারি। তিনি থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ আলাদা উচ্চারণ করে কথা বলেন। শুনতে ভালো লাগে।

মতিন সাহেব!

জি স্যার।

আপনি যদি টিউটরশিপটা নিতে রাজি হন, আপনাকে এখানেই থাকতে হবে। তার মানে এই না যে, দিনরাত চব্বিশঘণ্টা আপনাকে এ বাড়িতেই থাকতে হবে। অবশ্যই আপনি আপনার নিজস্ব কাজকর্ম করবেন। তবে আশা করব রাতটা এখানে কাটাবেন। আমরা আপনাকে মাসে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি আছি। টাকার পরিমাণটা কি ঠিক আছে?

মতিন হড়বড় করে বলল, জি ঠিক আছে। আপনারা কি এই চাকরিটা আমাকে দিচ্ছেন?

ব্যারিস্টার সাহেব বললেন, চাকরি ভাবা ঠিক হবে না। আমি আমার ছেলের জন্যে একজন সৃজনশীল সঙ্গী খুঁজছি। আমি আপনার দুটি প্রবন্ধই খুব মন দিয়ে পড়েছি। কবির কবিতার ব্যাখ্যা আপনি সুন্দর দিয়েছেন।

মতিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, স্যার, আপনাকে একটা কথা বলা দরকার। কথাটা আপনি কীভাবে নেবেন আমি জানি না। দুটি প্রবন্ধই ভুয়া।

ভুয়া মানে?

মতিন বলল, নদ্দিউ নতিম নামে উজবেকিস্তানের কোনো কবি নেই। পুরোটাই আমার বানানো। ফাজলামি করে লেখা। নদ্দিউ নতিম উল্টালে হবে মতিন উদ্দিন। আমিই সেই মতিন উদ্দিন।

ব্যারিস্টার সাহেব তার স্ত্রীর সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রীর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা গেলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা মুছে ফলে গম্ভীর হয়ে গেলেন। ব্যারিস্টার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, এই কাজটা কেন করেছেন জানতে পারি?

মতিন বলল, পত্রিকাওয়ালারা নতুনদের গল্প, কবিতা কিছুই ছাপায় না। তবে বিদেশী কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা ভারি ভারি প্রবন্ধ আগ্রহ করে ছাপায়। টাকাও দেয়।

নদ্দিউ নতিমের কবিতাগুলি আপনার লেখা?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

জি-না। কবিতাগুলি নিশুর লেখা। আমি কবিতা লিখতে পারি না।

নিশু কে?

আমার ক্লাসমেট ছিল। খুবই ভালো ছাত্রী। এখন পিএইচডি করতে লন্ডনের এবারডিন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে।

মুনা বললেন, নিশু ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

আপনার প্রেমিকা?

জি-না, সাধারণ বান্ধবী। সে আমার প্রেমিকা হবে এত যোগ্যতা আমার নেই।

আপনার ধারণা আপনি খুবই সাধারণ?

জি।

ব্যারিস্টার সাহেবের স্ত্রী বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যেতে পারেন। আপনি কষ্ট করে এসেছেন, আপনার সময় নষ্ট হয়েছে, তার জন্যে আমরা দুঃখিত।

আমাকে আপনারা নিচ্ছেন না?

মুনা বললেন, না। আপনি বুদ্ধিমান, কিন্তু ডিসঅনেস্ট। একজনের চরিত্রে যখন ডিসঅনেস্টি থাকে তখন সেই ডিসঅনেস্টি নানানভাবে প্রকাশ পায়। Autistic children-রা এই বিষয়টা চট করে ধরে ফেলে। তারা Revolt করে। তখন তাদের মানসিক সমস্যা তীব্র হয়। অ্যাপিলেপটিক অ্যাটাক হয়। আমি আমার বাচ্চার মঙ্গল চাই। অমঙ্গল চাই না। আপনি কিছু মনে করবেন না।

আমি কিছু মনে করছি না।

মাসে পনের হাজার টাকা হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে গেছে। তার জন্যে মতিনের তেমন খারাপ লাগছে না। বরং তার খানিকটা স্বস্তি লাগছে। মানসিক প্রতিবন্ধী একজনের সঙ্গী হওয়া জগতের প্রিয় কাজের একটি হতে। পারে না। মতিনের চোখের সামনে ভাসছে মাথা মোটা একটা ছেলে থপথপ। করে আসবে। হু হু করে চিৎকার করবে। যখন চিৎকার করবে তখন মুখ দিয়ে। লালা পড়বে। মতিনকেই টিস্যু পেপার দিয়ে মুখের লালা পরিষ্কার করতে হবে। কিছুই বলা যায় না, সেই ছেলে তখন তার হাত কামড়ে ধরতে পারে। মতিন। আনন্দ নিয়েই উঠে দাঁড়াল। মুনার দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাডাম, উঠি?

বেলা এগারোটা। দিনের সবে শুরু। ব্যারিস্টার সাহেবের রোজ ভ্যালি নামক বিশাল বাড়ি থেকে বের হয়ে মতিনের মন আরো ভালো হয়ে গেল। আকাশ মেঘলা। দিনের আলোতে কোমল ভাব। জ্যৈষ্ঠের শেষ। আষাঢ় এখনো শুরু হয় নি। তবে আসি আসি করছে। যে-কোনোদিন শুরু হয়ে যাবে। সেই দিনটা আজও হতে পারে। মতিন শব্দ করেই আওড়াল–

সুর করি বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার
অন্ধকার যমুনার তীর...

বাকি লাইনগুলি আর মনে আসছে না। এই সমস্যাটা তার ইদানীং হচ্ছে। কবিতার লাইন মনে আসছে না। অতি পরিচিত মানুষদের নাম ভুলে যাচ্ছে। সে নিজেও কি মানসিক প্রতিবন্ধীদের একজন হয়ে যাচ্ছে? কিছুদিন পর মুখ দিয়ে লালা পড়বে। হুঁ হুঁ করবে। বন্ধু-বান্ধবদের হাতে কামড় দেবে। বিচিত্র কিছুই না।

মতিন চিন্তিত মুখে হাঁটছে। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে–সুর করি বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার, অন্ধকার যমুনার তীর... তারপর কী? তারপর? তাকে এই মুহূর্তে নিশু বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। নিশুকে জিজ্ঞেস করলেই সে গড়গড় করে বাকি লাইন বলে দেবে। মতিন কী করবে বুঝতে পারছে না। নিশুকে জিজ্ঞেস করে ঝামেলা শেষ করবে, না-কি নিজেই মনে করার চেষ্টা করবে? নিজের চেষ্টা করাই উচিত। মতিন রিকশা নিয়ে নিল। সে এখন যাবে নিশুদের বাসায়। রিকশা করে যেতে তার একঘণ্টার মতো লাগবে। এই একঘণ্টা চিন্তা করে বাকি লাইনগুলি বের করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

রিকশা দ্রুত চলছে। রিকশার চলা আর রেলগাড়ির চলা এক না। রিকশার চলায় কোনো ছন্দ নেই। তারপরেও মতিনের মাথায় তালে তালে বাজছে–সুর করি বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার...

নিশু বাসায় নেই। নিশুর বাবা রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন অঙ্ক সক আজিজ আহমেদ বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে খবরের কাগজ তছেন। তিনি মতিনকে দেখে আনন্দিত চোখে তাকালেন। মতিন বলল, চাচা, নিশু কই?

আজিজ আহমেদ বললেন, সকালবেলা আমাকে নাশতা দিয়েই বের হয়ে গেছে। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি–মা, কোথায় যাও? শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করি নি।

কেন জিজ্ঞেস করেন নি?

মেয়ে বড় হয়েছে। দুদিন পরে লন্ডন যাচ্ছে। সেই মেয়েকে তো কোথায় যাও, কী জন্যে যাও, কখন ফিরবে, এইসব জিজ্ঞেস করা যায় না। সে আমাকে সন্দেহপ্রবণ বাবা ভেবে বসতে পারে। ঠিক বলেছি না?

জানি না ঠিক বলেছেন কি-না। নিশুকে দরকার ছিল।

টেলিফোন কর। এখন তো মোবাইল টেলিফোন নামে এক বস্তু বের হয়েছে প্রাইভেসি শেষ। মতিন, তুমি কি চা খাবে?

চা খেতে চাচ্ছিলাম। বানাবে কে? কাজের মেয়ে আছে?

না। ছুটা কাজের মেয়ে ছিল, সে কাজ শেষ করে চলে গেছে। অসুবিধা নেই, আমি বানাব। তুমি তো চায়ে তিনচামচ চিনি খাও, ঠিক না?

জি ঠিক। আমার চায়ে দুটা টি-ব্যাগ দিবেন।

আজিজ আহমেদ খুশি মনে চা বানাতে গেলেন। চা বানানো, রান্নাবান্নার কাজগুলি তিনি অতি আনন্দের সঙ্গে করেন।

মতিন, তুমি কি দুপুরে এখানে খাবে?

ভালো কিছু থাকলে খাব। ডাল আলুভর্তা হলে না।

সকালে ধূপখোলার বাজার থেকে পদ্মার ফ্রেশ ইলিশ এনেছি। ইলিশ মাছের ঝোল, কাকরুল ভাজি। চলবে না?

ইলিশ মাছের সঙ্গে তরকারি কী?

আজিজ আহমেদ বিরক্ত গলায় বললেন, তোমরা এই একটা ভুল কর, ইলিশ মাছের সঙ্গে তরকারি খোঁজ। তুমি যে তরকারিই ইলিশ মাছের সঙ্গে দিবে, মাছের স্বাদ নষ্ট হবে। তরকারি হলো ইলিশ মাছের জন্য ইন্টারফেরেন্স। ইলিশ মাছ, গলদা চিংড়ি ইন্টারফেরেন্স পছন্দ করে না।

মতিন বলল, চাচা, আমি আমার চা পশ্চিমের বারান্দায় একা একা খাব। আপনার কোনো সমস্যা নেই তো?

সমস্যা নেই, তবে সিগারেটটা একটু কম খাও। It is a killer.

কমানোর চেষ্টা করছি চাচা। পারছি না। টাকা-পয়সা টুকটাক যা পাই সব সিগারেটের পেছনে চলে যায়।

সিগারেট তো আমিও খাই–কিন্তু আমার সব হিসাব করা। সকালের নাশতার পর একটা, দুপুরে ভাত খাবার পর একটা, রাতের ডিনারের পর। একটা। ঘরে সিগারেট রাখি না। প্রতিবার নিজে গিয়ে একটা করে সিগারেট কিনে আনি। এতে এক্সারসাইজও হয়।

চাচা, এখন কি চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খাবেন? দেব?

দিতে পার।

বারান্দায় চা খেতে খেতে মতিন টেলিফোনে নিশুকে ধরবার চেষ্টা করল। যতবারই কল করা হয় ততবারই একটি মেয়েগলা বলে–এখন সংযোগ দেয়া যাচ্ছে না। পরে আবার চেষ্টা করুন।

আজিজ আহমেদ বিপুল উৎসাহে রান্নাবান্নায় নেমে পড়েছেন। তিনি নিজে খেতে পছন্দ করেন। নিশুর খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই। রান্না করা ইলিশ মাছ এবং রুইমাছের তফাত সে ধরতে পারে না। তরকারিতে লবণ। কম-বেশি হলেও সে ধরতে পারে না। একবার তিনি ভুলে লবণ ছাড়া কই মাছের ঝোল বেঁধেছেন। এক নলা মুখে দিয়েই তার মেজাজ খুব খারাপ হলো। অথচ নিশু মাথা নিচু করে খেয়েই যাচ্ছে। তিনি বললেন, কই মাঝের ঝোল। খেতে কেমন হয়েছে? নিশু বলল, খেতে ভালো হয়েছে বাবা। কী একটা মসলা যেন বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু খেতে ভালো হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে যে মেয়ে এমন উদাসীন তার জন্যে ভালো-মন্দ রান্না করা অর্থহীন। তবে ভালো খাওয়া মতিন খুবই পছন্দ করে। সে রান্নার ভালো মন্দ বোঝে। তার জন্য রান্না করায় আনন্দ আছে।

মতিন কিছুক্ষণ রান্নার প্রক্রিয়া দেখল, তারপর বারান্দায় রাখা চেয়ার টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে বসল। বারান্দার একটা অংশ চিক খাঁটিয়ে আলাদা। করা। সেখানে চেয়ার-টেবিল আছে। একটা বইয়ের শেলফ আছে। বইয়ের শেলফে অবশ্যি ইংরেজি-বাংলা ডিকশনারি ছাড়া কিছুই নেই। জ্ঞানী মেয়ের জ্ঞানী বই। এটা হলো নিশুর দিনের পড়ার জায়গা। নিশু দিনেরবেলা ঘরের ভেতরে পড়তে পারে না।

মতিনের মাথায় নতুন একটা লেখা চলে এসেছে। লেখাটাকে দ্রুত মাথা কে নামিয়ে ফেলা দরকার। সে আগ্রহ নিয়ে লিখছে। এই সময় সিগারেট তেলে ভালো হতো। প্যাকেটের সিগারেট শেষ! দোকান থেকে সিগারেট কিনে আনা সম্ভব না। কারণ বৃষ্টি নেমে গেছে। নিশুদের বাসায় কোনো ছাতা নেই।

যে প্রবন্ধটি মতিন লিখছে তার শিরোনাম–

প্রখ্যাত উজবেক কবি নদ্দিউ নতিমের বিশেষ সাক্ষাৎকার

নদ্দিউ নতিম অন্তর্মুখী জগতের নিঃসঙ্গ বাসিন্দা। তাঁর জীবনচর্যা প্রকৃতি সম্পৃক্ততায় সিক্ত হলেও জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই মহান কবির একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন ফরাসি সাংবাদিক লেমি পিঁয়ারো। ফরাসি ভাষা থেকে মূল সাক্ষাৎকারটির সরাসরি বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ করা হলো।

পিঁয়ারো : কবি, আপনি কেমন আছেন?

কবি : আমি বিষণ্ণ আছি। মানুষ হয় ভালো থাকে, নয় মন্দ থাকে। আমি থাকি বিষণ্ণ।

পিঁয়ারো : কেন বিষণ্ণ থাকেন?

কবি ; প্রকৃতি বিষণ্ণ বলেই আমি বিষণ্ণ। পিঁয়ারো : প্রকৃতি কি বিষণ্ণ?

কবি : অবশ্যই। প্রকৃতির উৎসে আছে বিষণ্ণতার মহান সঙ্গীত। প্রকৃতি কেন বিষণ্ণ জানো? প্রকৃতি বিষণ্ণ সৃষ্টিশীলতার বেদনায়। সৃষ্টির প্রধান শর্ত বেদনা। বেদনার হাত ধরে থাকে বিষণ্ণতা।

পিঁয়ারো : এই বিষয়ে আরো কিছু বলুন–

কবি : আনন্দ এবং বেদনা সমগ্র প্রাণিকুলেই আছে। কিন্তু বিষণ্ণতা মানব জাতির নিজস্ব বিষয়। একটা কাক হয় আনন্দে থাকে, নয় বেদনায় থাকে। বিষণ্ণতায় কখনো থাকে না।

পিঁয়ারো : আপনি কী করে এত নিশ্চিত হলেন? হয়তো কাকদের জগতেও বিষণ্ণতা আছে!

[আমার এই কথায় কবি মনে হলো কিঞ্চিৎ আহত হলেন। তার কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। ভুরু কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তিনি শান্তগলায় তার একটি বিখ্যাত কবিতার কয়েক পঙক্তি আওড়ালেন।]

প্রজাপতির ডানায় তুমি বিষণ্ণতা খুঁজতে যেও না।
প্রজাপতির বাণিজ্য বেদনায়।
তার দুটি ডানার একটিতে লাভ

অন্যটিতে লোকসান।...

মতিন তরতর করে লিখে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক বৈঠকেই লেখা নেমে যাবে।

প্রজাপতি বিষয়ক কবিতাটা আরো দুর্বোধ্য করতে হবে। নদ্দিউ নতিমের সব কবিতাই তার লেখা। ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়িতে কেন সে হুট করে নিশুর নাম বলে ফেলল কে জানে! নিশুর নাম মাথায় ঘুরঘুর করছিল বলেই হয়তো বলেছে। কিংবা তার সাবকনশাস মস্তিষ্ক নিশুকে কবি হিসেবে দেখতে পছন্দ করছে। তাকে আজ একবার বাংলাবাজারে যেতে হবে। নদ্দিউ নতিমের একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা সে করছে। এক গা প্রকাশক (গাধা প্রকাশক) যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে। সেই গা প্রকাশক মতিনের প্রবন্ধ দুটার ফটোকপি গম্ভীর মুখে দেখল। কয়েক লাইন পড়ল।

মতিন বলল, আপনি নিশ্চয় উজবেক এই মহান কবির নাম শুনেছেন।

গা প্রকাশক ভুরু কুঁচকে বলল, অবশ্যই শুনেছি। উনার নাম জানব না এটা কেমন কথা বললেন! সৃজনশীল লেখার খোঁজখবর আমাদের রাখতে হয়।

এই মহান কবি সারা জীবনে মাত্র ছয়টি গল্প লিখেছেন। আমি অনুবাদ করেছি। আপনারা কি ছাপবেন?

গল্প ছাপব না। বাংলাদেশে ছোটগল্প চলে না। উপন্যাস হলে ভেবে দেখতাম।

মতিন বলল, উনার গল্প না ছাপাই ভালো। কিছুই বলা যায় না, হয়তো গভর্নমেন্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেবে। খুবই ইরোটিক গল্প।

অশ্লীল?

চূড়ান্ত অশ্লীল। গল্পগ্রন্থের নামই নদ্দিউ নতিমের ছয়টি বাজেয়াপ্ত অশ্লীল গল্প। কবি নিজেই নিজের গল্প বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। পরে অবশ্যি উজবেকিস্তানে নিষিদ্ধ হয়। জার্মানি এবং ইংল্যান্ডেও নিষিদ্ধ। শুধু ফরাসি গভর্নমেন্ট নিষিদ্ধ করে নি। ওরা উদার জাতি।

গা প্রকাশক সঙ্গে সঙ্গে বলল, পাণ্ডুলিপি নিয়ে বুধবারে আসুন।

আজ বুধবার।

নিশু বাসায় ফিরল দেড়টায়। সে বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গিয়েছে। তার গা ভর্তি কাদা। কাদা লেগেছে কিছুক্ষণ আগে। ফুটপাত ধরে আসছিল। পাশ দিয়ে শা করে ট্রাক চলে গেল। রাস্তায় জমে থাকা কাদা-পানির সবটাই এসে পড়ল নিকার গায়ে। এই দৃশ্য দেখে ট্রাকের হেল্পার মোহিত। সে জানালা দিয়ে মুখ বের করে হে হে করে হাসছে। নিশু তার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলল, চুপ শালা!

যে মেয়ে অনার্স এমএ দুটিতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম তার মুখে চুপ শালা গালি মানায় না। কিন্তু নিশুর মুখে মানিয়েছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী (তার অবস্থা কাহিল,

সেও মাখামাখি) হৃষ্ট গলায় বলল, উচিত কথা বলেছেন আপা। এইভাবেই এদের শিক্ষা দিতে হয়।

আজিজ আহমেদ মেয়েকে দেখে বললেন, একী ব্যাপার! দেখে মনে হচ্ছে। ডাোবা থেকে উঠে এসেছিস। যা, ভালো করে সাবান ডলে গোসল করে ফেল। গরম পানি দেব?

গরম পানি লাগবে না। আমি ছাদে বৃষ্টিতে গোসল করব।

চট করে গোসল করে আয়। রান্না শেষ। আজ একটা স্পেশাল আইটেম আছে–কুমড়া ফুলের বড়া। বেসন মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। খেতে বসলে গরম গরম ভেজে দেব।

আমি খাব না।

খাবি না কেন?

খেয়ে এসেছি। পুরান ঢাকায় গিয়েছিলাম, হাফ প্লেট তেহারি খেয়েছি। ত্রিশ টাকা করে প্লেট। সঙ্গে অর্ধেকটা সিদ্ধ ডিম দেয়।

সামান্য খা।

না। ফুলের ভাজি তোমরা খাও। আর বাবা শোন, আমি তোমাকে বলেছি আমার বারান্দার পড়ার জায়গায় অন্য কেউ বসলে আমার রাগ লাগে! বলেছি না?

বলেছিস।

মতিন যে কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল। বিরাট স্কলার হয়ে গেল। তুমি না করতে পারলে না?

আজিজ আহমেদ ব্রিত গলায় বললেন, ও যে ঐখানে বসেছে খেয়াল করি নি।

নিশু কঠিন গলায় বলল, আমি গোসল সেরে দরজা বন্ধ করে ঘুমাব। আমাকে পাঁচটা না বাজা পর্যন্ত ডাকবে না। আর কয়েকটা কুমড়া ফুল আমার জন্যে রেখে দেবে, রাতে খাব। সাবান আর টাওয়েল এনে দাও।

সাধারণত দেখা যায় বৃষ্টিতে গোসলের জন্যে ছাদে উঠলেই বৃষ্টি থেমে যায়। কিংবা ঝিরঝির শুরু হয়। নিশুর বেলায় উল্টো হলো–ঝুম বৃষ্টি নামল। নিশু ঠিক করে ফেলল যতক্ষণ এমন ঝুম বৃষ্টি থাকবে ততক্ষণই সে ভিজবে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বৃষ্টি থাকলে পাঁচটা পর্যন্তই ভিজবে। আজকের বিকেল পাঁচটা তার জন্য ইম্পোর্টেন্ট। বিকেল পাঁচটায় সে মতিনকে কিছু জরুরি কথা। বলবে। সময়টা পাঁচটা না হয়ে ছটা হতে পারত, সাতটাও হতে পারত, কিন্তু একবার নিশু যখন ঠিক করেছে পাঁচটা তখন পাঁচটাই। সময়ের ব্যাপারে এই সমস্যাটা তার আছে।

আজিজ আহমেদ মতিনকে নিয়ে খেতে বসেছেন। তিনি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কুমড়া ফুলের বড়া কেমন হয়েছে?

মতিন বলল, ছোটগল্পের মতো হয়েছে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মানে বুঝলাম না!

মতিন বলল, ছোটগল্পের ডেফিনেশন ভুলে গেছেন চাচা? শেষ হইয়াও হইল না শেষ–এই অবস্থা। কুমড়া ফুলের বড়া শেষ হবার পরেও তার স্বাদ জিভে লেগে থাকছে।

ভালো বলেছ।

নিশু খাবে না?

না। মেজাজি মেয়ে। আছে মেজাজ নিয়ে। এই মেয়ে এত মেজাজ কোথায় পেল সেটাও বুঝি না। আমি নিজে খুবই ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তোমার চাচি ছিলেন আমার চেয়েও ঠাণ্ডা। মাঝখান থেকে মেয়ে হয়ে গেল ধানি মরিচ।

বিয়ের পর জামাইয়ের ক্যাঁচা খেয়ে ঠিক হয়ে যাবে।

আজিজ আহমেদ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কি তার বিয়ের কথা তোমাকে কিছু বলেছে?

মতিন বলল, না।

আমাকে তো বলেছে ইংল্যান্ড যাবার আগে বিয়ে করবে। হাসবেন্ড সঙ্গে নিয়ে যাবে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপে তো স্পাউস সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা আছে।

আপনাকে যখন বলেছে তখন অবশ্যই বিয়ে করবে। নিশু হচ্ছে রোবটের মতো। রোবটরা কমান্ডে চলে। নিশু তার নিজের কমান্ড নিজেই দেয়। কমান্ড ইস্যু হবার পর সেই কমান্ডে চলে।

নিশুর পছন্দের কেউ কি আছে?

অনেকেই আছে।

আজিজ আহমেদ বললেন, যাকে সে বিয়ে করবে তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করাবে না? চা খেতে নিয়ে এলো। একসঙ্গে চা-টা খেলাম, হালকা কথাবার্তা বললাম।

নিশুর কিছু প্লানিং নিশ্চয়ই আছে। পরিকল্পনার বাইরে সে কিছু করবে না।

এটাও ঠিক বলেছ। মেয়েটা অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক যন্ত্র। ইলিশ মাছের তরকারিটা কেমন হয়েছে?

দেবদাস টাইপ হয়েছে।

তার মানে?

দেবদাসের শেষ লাইনগুলি মনে আছে চাচা? মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময় যেন একটি সুখ করস্পর্শ কপালে আসিয়া পৌঁছে। যেন একটি দয়ার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে জীবনের ইতি হয়।

আজিজ আহমেদ বিস্মিত গলায় বললেন, এর সঙ্গে ইলিশ মাছের ঝোলের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক আছে–মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে-সময় যেন একটি ইলিশ মাছের পিস মুখে আসিয়া পৌঁছে। যেন সরষে ইলিশের ঝোল টানিতে টানিতে জীবনের ইতি হয়।

আজিজ আহমেদ হতাশ গলায় বললেন, বাবা, সবসময় জোকারি করা ঠিক না। সবসময় জোকারি করলে তুমি মানুষের সামনে পাতলা হয়ে যাবে। তুমি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেও মানুষ গুরুত্ব দিবে না। ভাববে জোকারি করছ।

ঠিক বলেছেন চাচা, আর জোকারি করব না। ইলিশ মাছটা খুব ভালো হয়েছে। আমি আরেক পিস নিব।

নিশুর যখন ঘুম ভাঙল তখন সন্ধ্যা। ঘড়িতে বাজছে সাতটা। আজিজ আহমেদ মাত্র মাগরিবের নামাজ শেষ করেছেন। মেয়ের ঘুম ভাঙলে মেয়েকে নিয়ে চা খাবেন। নিশু এসে বাবার সামনে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ থমথম করছে।

বাবা, তোমাকে পাঁচটার সময় ডেকে দিতে বলেছিলাম, তুমি ডাক নি কেন?

তুই এত আরাম করে ঘুমাচ্ছিলি, ডাকতে মায়া লাগল। বোস, চা খা।

চা খাব না। তোমাকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলাম। দায়িত্ব পালন করতে পারলে না। আমার অ্যাপয়নমেন্ট ছিল মতিনের সঙ্গে। জরুরি কথা ছিল। বাবা, আমার খুব খারাপ লাগছে।

মা রে, ভুল হয়ে গেছে! তুই টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বল।

আমি সামনা-সামনি কথা বলতে চেয়েছিলাম।

তাকে আসতে বল। ডাকলেই চলে আসবে। মা শোন, মেজাজ ঠাণ্ডা করে বোস। একসঙ্গে চা খাই। দুদিন পরে চলে যাবি।

নিশু বাবার সামনে থেকে সরে গেল। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তার ঘুম পুরোপুরি কাটে নি। সে আবার শুয়ে পড়বে। ঘুম নিয়ে তার এই ব্যাপারটা আছে। মাঝে মাঝে ঘুমের স্পেল আসে। খেয়ে না-খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমায়। আবার মাঝে মাঝে আছে জেগে থাকার স্পেল। একবার তিনদিন। তিন রাত সে এক মিনিটের জন্যেও ঘুমায় নি। তাতে তার তেমন কোনো

অসুবিধাও হয় নি।

নিশু মতিনকে টেলিফোন করল বিছানায় শুয়ে। ঘর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি নতুন করে শুরু হয়েছে। জানালা সামান্য খোলা। পর্দা বাতাসে কাঁপছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট এসে চোখে-মুখে লাগছে। নিশুর চমৎকার লাগছে।

মতিন শোন, তোমার মনে কি এমন কোনো ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, আমি তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি?

মতিন বলল, না, নেই। তুমি মূল কথাটা বলে ফেল। প্যাঁচানোর দরকার নেই।

নিশু বলল, আমি বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে, দেশের বাইরে যাবার আগে বিয়ে করব।

কথা রাখ। বিয়ে করা কঠিন কাজ না। পিএইচডি করার চেয়ে সহজ।

সমস্যা হচ্ছে, একটি ছেলে আমার পাশে শুয়ে আছে–এই চিন্তাটাই আমার কাছে আগলি লাগে।

ও আচ্ছা!

আমার একটা টেকনিক্যাল বিয়ে করা দরকার। এমন একজনকে স্বামী হিসেবে আমার দরকার যে আমার সমস্যা বুঝবে। তাকে যখন বলব, ডিল ইজ অফ–সে সরে দাঁড়াবে। স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার খাটানোর কোনো চিন্তা যার মাথায় থাকবে না।

আমি কি সেই ভাঙা কুলা?

হ্যাঁ।

আমাকে তোমার সঙ্গে ইংল্যান্ডে যেতে হবে?

অবশ্যই না। তুমি তোমার মতো এখানেই থাকবে। নদ্দিউ নতিমের উপর গবেষণা করবে। তার গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করবে। তুমি কি রাজি?

চিন্তা করে দেখি।

এত চিন্তার কী আছে?

চিন্তার কিছু নেই?

অবশ্যই না। তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তুমি তোমার কুৎসিত মেসটা ছেড়ে বাবার সঙ্গে থাকবে।

জামাই-শ্বশুর এক বাড়িতে?

হ্যাঁ। বাবার বয়স হয়েছে। এখন নানান উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা করেন। তুমি বাবার সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

তুমি যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো অবস্থায় নিশ্চিন্ত থাকবে। তার মানে তুমি রাজি না?

না। শুরুতে নিমরাজি হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ তৌহিদার কথা মনে পড়ল। নিশু বলল, তৌহিদা কে?

মতিন বলল, বড় আপাদের সঙ্গে থাকে। আশ্রিতা টাইপের একজন। আমার দুলাভাইয়ের দূর সম্পর্কের বোন। বড় আপার খুব ইচ্ছা আমি তাকে বিয়ে করি।

তুমি রাজি?

নিমরাজি। আমি কোনো কিছুতেই রাজি হই না। সবকিছুতেই নিমরাজি হই!

ঠিক আছে।

নিশু শোন, একটা কবিতা ব্রেইনে শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। দুটা লাইন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বাকিটা আসছে না। শর্ট সার্কিটটা খুলে দাও।

লাইন দুটা বলো।

সুর করি বারবার পড়ি বর্ষা...

নিশু যন্ত্রের মতো বলল–

সুর করি বারবার পড়ি বর্ষা অভিসার
অন্ধকার যমুনার তীর।
নিশিথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা
খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটির।

নিশু টেলিফোন অফ করে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

২. চিঠি এসেছে হাতে হাতে

চিঠি এসেছে হাতে হাতে। যে ভদ্রলোক চিঠি নিয়ে এসেছেন তিনি অস্থির প্রকতির তিনি হয় একজন গুরুত্বপূর্ণ লোক, আর তা না হলে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন। তার মতো একজন মানুষ ডাকপিয়নের ভূমিকায় নেমেছে। এটা তিনি নিতে পারছেন না। ভদ্রলোকের চেহারা সুন্দর। গোলগাল মুখ। গায়ের রঙ দুধেআলতায়। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট পরেছেন। তাঁকে শার্টটায় খুব মানিয়েছে।

মতিন চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, ঠিক আছে। চিঠি রিসিভ করলাম।

অতি গুরুত্বপূর্ণ মানুষটি ভুরু কুঁচকে বললেন, শুধু রিসিভ করলে হবে না। আমার সামনে চিঠি পড়বেন। এবং চিঠির জবাব দেবেন। সেই জবাব আমি নিয়ে যাব।

এখনই চিঠি পড়তে হবে?

অবশ্যই।

মতিন হাই তুলতে তুলতে বলল, আমি তো ভাই এখন চিঠি পড়তে পারব। আমার চিঠি পড়ার নির্দিষ্ট সময় আছে। আমি রাতে শোবার আগে আগে চিঠি পড়ি। অন্য সময় পড়ি না।

এখন পড়বেন না?

না। আর শুনুন, এভাবে আঙুল তুলে আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আঙুল তুলে কথা আমার পছন্দ না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই আঙুল তুলে কথা বলা মানায়, আর কাউকে মানায় না।

গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা এবার চুপসে গেল। মতিনের মনে হলো, ফুলানো একটা গ্যাস বেলুন থেকে খানিকটা গ্যাস বের হয়ে গেল। আরো কিছু গ্যাস বের করতে পারলে ভালো হতো। সেই সুযোগ কি এই লোক দেবে?

মিস্টার মতিন, এটা একটা আর্জেন্ট লেটার। স্যার আমাকে জবাবটা হাতে হাতে নিয়ে যেতে বলেছেন।

মতিন বলল, জবাব না নিয়ে গেলে উনি কি আপনাকে মারবেন? চড় থাপ্পড় ঘুসি?

এইসব আপনি কী বলছেন? আমি একজন লইয়ার। স্যারের জুনিয়র।

লইয়াররা চড় থাপ্পড় খায় না? ধরুন এখন যদি আমি আপনার গালে ঠাশ করে একটা চড় দিয়ে বসি, আপনি কী করবেন? মামলা করবেন? মামলাটা কোন ধারায় হবে?

আমি আপনার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি এই ভঙ্গিতে কথা বলছেন কেন?

মতিন বলল, আপনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন? লোকটা হতাশ গলায় বলল, জি।

তাহলে গাড়িতে বসুন। অপেক্ষা করুন। আমি হাত-মুখ ধোব। নাশতা খাব। চা খাব। তারপর আপনার স্যারের আর্জেন্ট লেটার পড়ে জবাব লিখে দেব। আমি চাই না আপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ একজন লইয়ার তার বসের কাছে। চড় থাপ্পড় খাক। আপনার নাম কী?

আহমেদ ফারুক।

আহমেদটাকে সামনে এনেছেন কেন? আহমেদ পেছনে থাকার কথা না? আপনার বাবা-মা নিশ্চয়ই আপনার নাম রেখেছিলেন ফারুক আহম্মেদ। আপনি স্টাইল করে আহম্মেদকে করেছেন আহমেদ। এবং সেই আহমেদ নামের সামনে নিয়ে এসেছেন। ঘোড়ার পেছনে থাকে গাড়ি। আপনার বেলায় সামনে গাড়ি পেছনে ঘোড়া।

মতিন সাহেব, আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বা আগ্রুমেন্টে যাব। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করি না। আপনি জবাবটা দিয়ে দিন।

আপনি আমার ঘরেও অপেক্ষা করতে পারেন। তবে আপনার মতো মানুষ আমার এখানে বসে আরাম পাবেন না। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে থাকবেন। ঘরে ফ্যানও নেই। এরচে এসি চালিয়ে গাড়িতে বসে গান শোনা ভালো। না-কি আমার এখানেই বসবেন?

আমি গাড়িতেই অপেক্ষা করব।

গাড়িতে চা পাঠাব? আমাদের মেস বাড়িতে লেবু চা ভালো বানায়।

থ্যাংকস, চা লাগবে না।

মতিন অনেক সময় নিয়ে দাড়ি শেভ করল। গোসল সারল। মেসের মনেজারের কাছ থেকে পত্রিকা এনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পত্রিকা পড়ল। সে কোনোদিন পত্রিকার এডিটরিয়াল পড়ে না। আজ সে তাও পড়ল। আহমেদ ফারুক নামের রাজপুত্র টাইপ মানুষটাকে যতটা সম্ভব দেরি করানো যায়। আহমেদ ফারুক সাহেবের একটা শিক্ষা হোক। তেমন কোনো কারণ ছাড়াই লোকটাকে প্রথম থেকেই তার অপছন্দ হচ্ছিল।

নাশতা শেষ করে পর পর দুকাপ চা খেয়ে মতিন চিঠি পড়তে বসল।

প্রিয় নদ্দিউ নতিম,

আপনার বিষয়ে পরে আমি এবং আমার স্ত্রী কিছু চিন্তাভাবনা করেছি। যে নদ্দিউ নতিম নামের একটি ফিকটিসাস ক্যারেক্টর তৈরি করে তাকে নিয়ে প্রবন্ধ ছাপতে পারে সে অবশ্যই Creative person.

আমি এবং আমার স্ত্রী খুবই আনন্দিত হবো যদি আপনি আমাদের অফার গ্রহণ করেন। আপনার পক্ষে কি এ মাসের সতেরো তারিখ থেকে কাজ শুরু করা সম্ভব? আমি উনিশ তারিখ কাঠমাণ্ডু যাচ্ছি। তার আগেই ছেলের বিষয়টা ঠিক করে যেতে চাচ্ছি।

আপনি যদি অফার গ্রহণ করতে সম্মত হন তাহলে আমার জুনিয়র ফারুক সাহেবকে জানিয়ে দেবেন। আমার ছেলে কমল অতি অল্প যে কয়জন মানুষকে পছন্দ করে ফারুক তাদের একজন। আমার ছেলে সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে সে আপনাকে বলতে পারবে।

আপনি ভালো থাকুন।

বিনীত–
এস, ইমরান

আহমেদ ফারুক গাড়িতে বসে ছিলেন না। তিনি গাড়ির চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তার হাতে সিগারেট। তবে জ্বলন্ত সিগারেট না। আগুন ছাড়া সিগারেট। তিনি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছেন। সিগারেট ছাড়ার প্রথম ধাপ যখন সিগারেটের তৃষ্ণা চাপবে তখন আগুনবিহীন সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে টানতে হবে। মতিনকে আসতে দেখে ফারুক আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। মতিনের হাতে কোনো খাম বা কাগজ দেখা যাচ্ছে না। ফারুকের ভুরু কুঁচকে গেল। এই উদ্ভট মানুষটা কি এখনো চিঠি পড়ে নি? তার ফাজলামি ধরনের গা-জ্বালানো কথা আরো কিছুক্ষণ শুনতে হবে?

মতিন বলল, আপনার কি সিগারেট ধরানোর জন্যে দেয়াশলাই লাগবে?

না লাগবে না। আপনি চিঠির জবাব এনেছেন?

এনেছি।

কই দিন। আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে।

মতিন বলল, আমাকে একটু পল্লবী নামিয়ে দিতে পারেন?

কোথায়?

পল্লবী। মীরপুরের পরে। আমার বড় বোনের বাসা। দুপুরে তার ওখানে আমার খাওয়ার কথা।

পল্লবী নামিয়ে দিতে হবে?

নামিয়ে যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি একটা সিএনজি ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব। যদিও এই মুহূর্তে ট্যাক্সি ভাড়া দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। সেটাও সমস্যা না। ট্যাক্সি ভাড়া বড় আপা দিয়ে দেবে। তবে তার সামান্য মন খারাপ হবে এই ভেবে যে, তার আদরের ভাইটার ট্যাক্সি ভাড়া দেবার সামর্থ্যও নেই।

আপনি গাড়িতে উঠুন।

ধন্যবাদ। আপনি সিগারেটটা যদি না খান আমাকে দিয়ে দিতে পারেন। আজ নাশতার পর সিগারেট খাওয়া হয় নি। সিগারেটের প্যাকেটে চারটা সিগারেট ছিল। প্যাকেটটাই খুঁজে পাচ্ছি না।

ফারুক হাতের সিগারেট দিয়ে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, সিগারেট এখানেই শেষ করুন। গাড়িতে এসি চলবে। তখন সিগারেট খাওয়া যাবে না।

মতিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনার স্যারের ছেলের বিষয়টা বলুন।

ফারুক বিরক্ত গলায় বলল, কী বিষয় বলব?

সে কি ভয়ঙ্কর?

মেজাজ খারাপ হলে যে-কোনো মানুষই ভয়ঙ্কর হয়। হয় না? বেশিরভাগ মানুষই মেজাজ কন্ট্রোল করতে পারে। যারা Autistic children, কিংবা যাদের ডাউন সিনড্রম আছে তারা মেজাজ কন্ট্রোল করতে পারে না।

ডাউন সিনড্রম আবার কী?

এটাও একধরনের অসুখ। ডাউন সিনড্রমে শিশুরা একটা বাড়তি ক্রোমোজম নিয়ে জন্মায়। এখন আপনি নিশ্চয়ই আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, ক্রোমোজম কী?

ক্রোমোজম কী?

ডিটেইলে আপনাকে বলতে পারব না। আমি নিজেও জানি না। সব মানষের থাকে ৪৬টা করে ক্রোমোজম। ২৩টা সে পায় বাবার কাছ থেকে, ২৩টা পায় মার কাছ থেকে।

মতিন বলল, ক্রোমোজমের প্রসঙ্গ থাক। মূল জায়গায় আসুন–ছেলে কি ভয়ঙ্কর?

যখন রেগে যায় তখন।

ভয়ঙ্কর হলে কী করে? কামড়ায়?

বেশির ভাগ সময় অ্যাপিলেপটিক সিজার হয়ে যায়, তবে মাঝে মধ্যে আশেপাশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কখন তার মেজাজ খারাপ হয়?

বলা মুশকিল। তার অপছন্দের কিছু ঘটলেই মেজাজ খারাপ হয়।

কী কী তার অপছন্দ?

উঁচু শব্দ অপছন্দ। মেঝেতে চেয়ার টানার শব্দ, চায়ের কাপে চামচের শব্দ।

সব শব্দ বন্ধ? কাজকর্ম কীভাবে চলে, ইশারায়?

সব শব্দ বন্ধ না। উঁচু শব্দ বন্ধ।

মেজাজ যখন খারাপ হয় তখন তা ঠিক করার উপায় কী?

গান বাজালে মেজাজ ঠিক হয়। সে সুগন্ধ খুব পছন্দ করে। তাও সব সুগন্ধ না। যেমন ধরুন লেবু। সে লেবু বা লেবু ফুলের গন্ধ সহ্যই করতে পারে না।

মতিন সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, কোন ধরনের গান সে পছন্দ করে? রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল, না-কি ভাটিয়ালি?

ফারুক গম্ভীর গলায় বলল, আপনার কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে ঠাট্টা-ভাব আছে। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।

মতিন বলল, আমি এইভাবেই কথা বলি। কী গান ঐ ছেলে পছন্দ করে?

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ফারুক বলল, ললা নোটের যে-কোনো মিউজিকই তার পছন্দ। তবে সে হাই নোটস নিতে পারে না। উঠুন গাড়িতে উঠুন।

মতিন গাড়িতে উঠল। ফারুক বলল, আপনি কি কমলের সঙ্গী হবার প্রস্তাবটা নিচ্ছেন?

মতিন হাই তুলতে তুলতে বলল, না। ঐ পাগলা ছেলের কামড় খাওয়ার। কোনো শখ আমার নেই। এখন কি আপনি গাড়ি থেকে আমাকে নামিয়ে দেবেন?

না। আপনাকে পল্লবীতে নামিয়ে দেব।

থ্যাংক য়্যু। শুরুতে আপনাকে আমার যতটা খারাপ মানুষ মনে হয়েছিল। আপনি তত খারাপ না। আপনার স্যারকে বলবেন–আমি চাকরিটা নেব। সতেরো তারিখ বোচকা-বুচকি নিয়ে উপস্থিত হবো।

মতিনের বড়বোনের নাম সালেহা। বয়স চল্লিশের উপরে।

চিররুগ্ন মহিলা। সপ্তাহে তিনদিন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকেন। কখনো তিনি জ্বরে কাতর। কখনো বুকে ব্যথা। অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থাকেন। তাকে তখন প্রায় কোলে করে বাথরুমে আনা নেয়া করতে হয়। তার ডিসপেপসিয়াও আছে। জাউ ভাত ছাড়া কিছুই খেতে পারেন না। ষা োল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে চব্বিশ বছর কাটিয়ে তিনি এখন ক্লান্ত। সংসারে কোনো সন্তান আসে নি। এই নিয়েও সালেহার

মনে তেমন। কোনো দুঃখবোধ আছে বলে মনে হয় না। তৌহিদা নামের যে মেয়েটি তার দেখাশোনা করে তাকে তিনি প্রায়ই বলেন–আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে। আমার শরীরের যে অবস্থা ছেলেমেয়ে হলে উপায় কী হতে বল!

তৌহিদা সালেহার স্বামী হাবিবুর রহমানের মামাতো বোন। সে অনেক দিন। ধরে তার ভাইয়ের সংসারে আছে। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় এসেছিল, এখন। সে লালমাটিয়া কলেজে পড়ে। আগামী বছর বিএ পরীক্ষা দেবে। মেয়েটির গায়ের রঙ ময়লা হলেও সে অত্যন্ত সুশ্রী। তার কলেজের বান্ধবীরা প্রায়ই তার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে সালেহার কাছে আসে। তিনি তাদের সবাইকে বলেন, তৌহিদার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে। ওর বিয়ে নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না।

তৌহিদা চুপচাপ ধরনের মেয়ে। সে নিজের মনে সংসারের সব কাজ সামাল দেয়। যথাসময়ে কলেজে যায়। তার কলেজ বাসার খুব কাছে না। হেঁটে যেতে আধঘণ্টার মতো লাগে। সে হেঁটে যায় আসে। কলেজে যাওয়া-আসার জন্য ভাইয়ের কাছে বাড়তি টাকা চাইতে তার খুবই লজ্জা লাগে।

হাবিবর রহমান একটা ফার্মেসির মালিক। ফার্মেসির আগে নাম ছিল নিউ হাবিব ফার্মেসি। বিয়ের পর পর স্ত্রীর নামে ফার্মেসির নামকরণ করেছেন। এখন নাম নিউ সালেহা ফার্মেসি। বছর দুই আগে একটা দরজির দোকান করেছেন। তার নাম নিউ সালেহা টেইলারিং। প্রতিটি দোকানের নামের আগে তিনি নিউ ব্যবহার করেন। কারণ নিউ শব্দটা তার জন্যে লাকি। তার তিনটি বেবিটেক্সি আছে (দি নিউ সালেহা পরিবহন)। প্রতিদিন একেকটা বেবিটেক্সি থেকে তিনি তিনশ টাকা করে পান।

হাবিবুর রহমানকে একজন সফল মানুষ বলা যেতে পারে। সফল মানুষরা চিররুগ্ন স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। হাবিবুর রহমান সতুষ্ট। তার কোনোরকম বদ নেশা নেই। রাত নয়টায় তিনি দোকান বন্ধ করে বাসায় চলে আসেন। এশার নামাজ পড়ে রাতের খাবার শেষ করে টিভি দেখতে বসেন। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান দেখেন তা না। টিভিতে যা চলে তা-ই তার ভালো লাগে। তবে সাড়ে দশটা বাজতে না বাজতেই তাঁর হাই উঠতে থাকে। রাত এগারোটার দিকে বেবিটেক্সির ড্রাইভাররা তাঁকে দিনের ভাড়া দিয়ে যায়। তিনি টাকা স্টিলের আলমারিতে তুলে ঘুমাতে যান। এক ঘুমে তাঁর রাত কাটে। তিনি সুখী মানুষদের দলে।

মতিন তার বোনের বাসার কলিংবেল টিপছে। অনেকক্ষণ ধরেই টিপছে, দরজা খুলছে না। মতিনের মনে হলো বাসায় তার বড়বোন ছাড়া কেউ নেই। বড়বোন। বিছানায়। বিছানা থেকে নামতে পারছেন না বলে দরজা খুলছে না। আধঘণ্টা ধরে কলিংবেল টেপার অর্থ হয় না। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। দুটা কাজ করা যায়–এক. ফিরে যাওয়া, দুই. কোনো একটা চায়ের দোকান থেকে এককাপ চা খেয়ে নব উদ্যমে কলিংবেল টেপা শুরু করা। দুটার কোনটা করবে এই সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই দরজা খুলল। দরজার ওপাশে তৌহিদা। সে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে ফেলল। যেন সে এক বিরাট লজ্জায় পড়েছে। মতিন বলল, মিস তৌ, কী খবর?

তৌহিদা অস্পষ্ট গলায় বলল, ভালো।

আমার আপার অবস্থা কী? সে কি নতুন কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত? না কি এখনো পুরনো অসুখ নিয়েই আছে?

তোহিদা জবাব দিল না। মতিন বলল, চট করে চা খাওয়াও। বেশিক্ষণ থাকব না। আপাকে চোখের দেখা দেখেই বিদায়। আপা কই?

তৌহিদা কাপা কাঁপা গলায় বলল, বুবু বাসায় নাই।

কোথায় গেছে?

ভাইজান উনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন। বুবুর বুকে ব্যথা, ইসিজি করবেন।

ঘরে শুধু তুমি আর আমি?

তৌহিদা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। তার কেমন জানি লাগছে। মনে হচ্ছে। ঘরবাড়ি দুলছে। মাথার ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে। খুবই পিপাসা পাচ্ছে। তার উচিত এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঠাণ্ডা একগ্লাস পানি খাওয়া। পানি খেয়েই মতিন নামের মানুষটার জন্যে চা বানানো। কিন্তু সে নড়তেও পারছে না। তার পা ভারি হয়ে। আছে। মতিন নামের মানুষটা আশেপাশে থাকলেই তার এরকম হয়। স্বামীর আশেপাশে দাঁড়ালে কি সব মেয়ের এরকম হয়? মতিন অবশ্যি এখনো তার। স্বামী না। কিন্তু একদিন তো হবে।

মতিন বলল, কী হলো মিস তৌ! তুমি এরকম জম্বির মতো হয়ে গেছ কেন? জম্বি কী জানো?

না।

মৃত মানুষ আবার জীবন ফিরে পেলে যা হয় তার নাম জম্বি।

তৌহিদা মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তার কথা বুঝতে পারছে না। মৃত মানুষ জীবিত মানুষ এইসব কী বলছে!

মতিন বলল, বসো। আপা যখন নেই তখন তোমার সঙ্গেই কথা বলি। এত দূরে বসতে হবে না। আমার কাছে বসো। খালি বাসা, কেউ দেখবে না।

তৌহিদার শরীর ঝনঝন করছে। মানুষটা এইসব কী বলছে–খালি বাসা, কেউ দেখবে না। কী কেউ দেখবে না? আচ্ছা এই মানুষটা কি তার গায়ে হাত দিতে চায়? গায়ে হাত দিতে চাইলে সে কি নিষেধ করবে? নিষেধ করা মোটেই ঠিক হবে না। কারণ মানুষটা তার স্বামী। স্বামীরা যখন ইচ্ছা তখন তার স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে পারে।

মিস তৌ!

জি।

তোমার কি শরীর খারাপ?

জি-না।

এরকম ঘামছ কেন?

জানি না।

আপা কতক্ষণ আগে গেছেন বলো তো?

জানি না।

জানি না বলে তৌহিদা চমকে উঠল। সে অবশ্যই জানে। কেন জানবে না। আধঘণ্টা আগে গিয়েছে। তাহলে সে কেন বলল–জানে না?

মিস তৌ!

জি।

আমার কাজ আছে, আমি উঠলাম। আপাকে বলবে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। পার্মানেন্ট কিছু না। টেম্পোরারি। তবে বেতন ভালো। মাসে পনেরো হাজার। বলতে পারবে না?

জি পারব।

তৌহিদা মুখে বলেছে জি পারব, কিন্তু কী পারবে এটা সে এখন বুঝতে পারছে না। মানুষটা বলেছে আমার কাজ আছে আমি উঠলাম। তাহলে একটু আগে কেন বলল, খালি বাসা কেউ দেখবে না? মানুষটা চা খেতে চেয়েছিল। এখন কি সে চা খেতে চাচ্ছে না? সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তৌহিদা এখন যদি বলে, চা না খেয়ে আপনি যেতে পারবেন না, তাহলে কি খুব খারাপ হবে? কেন খারাপ হবে? তৌহিদা অবশ্যই তাকে চা খেতে বলবে। শুধু যে

বলবে তা-না, সে মানুষটার হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে তাকে বসিয়ে দেবে। মানুষটা বসে যাবার পরও সে তার হাত ছাড়িয়ে নেবে না। একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাত ধরে। বসে থাকবে, এর মধ্যে দোষের কিছু নেই।

মিস তৌ, তুমি দরজা লাগিয়ে দাও, আমি যাচ্ছি।

তৌহিদা চাপা গলায় শুধু বলল, জি আচ্ছা। মতিন চলে যাবার পরের এক ঘণ্টা সে তার নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল।

৩. কথা মন দিয়ে শুনছেন

আপনি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন?

মতিন থতমত খেয়ে বলল, অবশ্যই অবশ্যই। যদিও সে মন দিয়ে শুনছিল না। তার সামনে বসা মুনা নামের অস্বাভাবিক রূপবতী মহিলা তার মধ্যে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সে মহিলার মুখের দিকে ঠিকমতো তাকাতে পারছে না, আবার চোখও ফিরিয়ে নিতে পারছে না। মুনার আজকের পোশাক আরো উগ্র। আবার এ-ও হতে পারে–ইনি যে সমাজে বাস করেন সেই সমাজে এই পোশাকই শালীন পোশাক।

মতিন সাহেব!

জি ম্যাডাম।

কমলের সঙ্গে আপনার দেখা করানোর আগে তার আচার-আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া প্রয়োজন। তাই না?

জি ম্যাডাম।

মতিন জি ম্যাডাম বলেছে ঠিকই, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বুঝতেই পারল না কমলটা কে। কমল নামটি অনেকবার তার সামনে উচ্চারিত হয়েছে। সে অটিসটিক শিশু কমলের সঙ্গী হিসেবে চাকরি পেয়েছে, এই ব্যাপারগুলি তার মাথায় স্থায়ী হচ্ছে না। তার সামনে বসা মহিলার রূপ আরেকটু কম হলে মতিনের জন্যে সুবিধা হতো। ব্লাউজের কাট এত না

হলেও সুবিধা হতো। ব্লাউজের নিচে মহিলা কিছু পরেন নি তা বোঝা যাচ্ছে। এই সমাজে বোধহয় ব্রা পরার চল নেই।

মতিন সাহেব!

জি ম্যাডাম।

একটা ব্যাপার মাথায় রাখবেন, কমল অসম্ভব বুদ্ধিমান। সে অতি দ্রুত তার। বুদ্ধিতে আপনাকে বিচার করবে।

ও আচ্ছা!

আপনার ত্রুটিগুলি সে ধরতে চেষ্টা করবে। তারপর আপনার ত্রুটিগুলি সে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

ত্রুটি মানে?

আপনি যদি ভীতু হন তাহলে সেটা আপনার একটা ত্রুটি। আপনার ভীতিটা সে কাজে লাগাবে। আপনি যদি রাগী মানুষ হন সে আপনার রাগটা কাজে লাগাবে।

বুঝতে পারছি না।

একজন ভীতু মানুষকে সে কাবু করবে ভয় দেখিয়ে। একজন রাগী মানুষকে সে আরো রাগিয়ে দেবে। সে অগ্রসর হবে অতি ঠাণ্ডা মাথায়।

ও আচ্ছা!

আপনি যত সহজে ও আচ্ছা বললেন, বিষয়টা তত সহজ নয়। একটি Autistic শিশুর কিছু আচরণ পূর্ণবয়স্ক মানুষদের মতো।

Autistic সব শিশুই কি একরকম?

না, একেকজন একেক রকম, তবে তাদের কমন কিছু মিল আছে। যেমন, এরা অতি বুদ্ধিমান। তাদের প্রধান চেষ্টা থাকে আশেপাশের সবাইকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে। আপনাকে কিছু বইপত্র দেব, বইপত্রগুলি মন দিয়ে পড়বেন।

জি আচ্ছা।

ইন্টারনেটে এই ধরনের শিশুদের বিষয়ে বেশ কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে, আপনি সেগুলি দেখতে পারেন।

ইন্টারনেট কীভাবে ব্যবহার করতে হয় আমি জানি না।

এমন কোনো জটিল ব্যাপার না। আপনাকে শিখিয়ে দেয়া হবে। আপনি কি এখন ছেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত?

জি ম্যাডাম।

আপনার মনে কি কোনো প্রশ্ন আছে?

মতিন ইতস্তত করে বলল, এই ধরনের শিশুরা কি ভায়োলেন্ট হয়?

মুনা বললেন, হয়। তবে বেশিরভাগ এই ভায়োলেন্স নিজের প্রতি দেখায়। অন্যের প্রতি না। কমল রেগে গিয়ে আপনাকে কামড়ে ধরবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ভয় পাবেন না।

আমি ভয় পাচ্ছি না।

মুখে ভয় পাচ্ছি না বললেও মতিন ভয় পাচ্ছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে পা থপথপ করে একটা ছেলে এসে চেয়ার ধরে দাঁড়াবে। তার চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ। সে দড়ি দিয়ে বাঁধা জন্তুর মতো থেমে থেমে বড় বড় নিঃশ্বাস নেবে। তার মুখ হা হয়ে থাকবে। মুখ থেকে মাঝে মধ্যেই লালা। গড়িয়ে পড়বে।

মুনা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

মতিন উঠে দাঁড়াল, তবে তার মাথা সামান্য ঝিমঝিম করে উঠল। মুনা উঠে দাঁড়ানো মাত্র দমকা বাতাস গায়ে লাগার মতো সেন্টের গন্ধ নাকে এসে লেগেছে। গন্ধটার মধ্যেই গা ঝিম ধরানোর ব্যাপার আছে। মতিন ভেবে পাচ্ছে না, এই মহিলা উঠে দাঁড়ানো মাত্র গন্ধটা তার নাকে এসে লাগল কেন? তিনি গায়ে সেন্ট মেখেছেন, সেই সেন্ট তো বসে থাকা অবস্থাতেও গায়ে ছিল।

মতিন কমলের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরটা বেশ বড়। মাঝখানে কাঠের পার্টিশন আছে। পার্টিশনে অতি সূক্ষ্ম কারুকাজ। নিশ্চয়ই খুব দামি জিনিস। পুরো ঘরে হালকা নীল রঙের কার্পেট। জানালার পর্দা নীল। দরজার পর্দাও নীল। মতিন

যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে এই ঘরটা মনে হয় কমলের খেলার ঘর। কিছু খেলনা। আছে। স্টাফড অ্যানিমেল। কম্পিউটার আছে। নিচু একটা টেবিল আছে। টেবিলে ছবি আঁকার রঙতুলি। কাগজ। বেশ কয়েকটা কাগজে গাঢ় হলুদ রঙ মাখানো।

পার্টিশনের ওপাশটা মনে হয় কমলের শোবার ঘর। বিছানার একটা কোনা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। বিছানার নিচে এবং উপরে প্রচুর বইপত্র ছড়ানো। দুটি বইয়ের নাম পড়া যাচ্ছে–FUN IN ALGEBRA, THE DARK BY PASS।

মতিন সাহেব!

জি ম্যাডাম।

আপনি পার্টিশনের এই পাশে থাকবেন। ঐ পাশে কখনো যাবেন না বা উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টাও করবেন না। কমল এটা পছন্দ করে না। একেবারেই পছন্দ করে না।

জি আচ্ছা।

মুনা গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, হ্যালো বাবু, এসো এদিকে।

পার্টিশনের ওপাশ থেকে শান্ত গলায় একটি শিশু বলল, No.

মনা বললেন, এসো বলছি। তোমার সঙ্গে একজনের পরিচয় করিয়ে দেব।

শিশুটি আগের মতোই শান্ত গলায় বলল, No,

যাকে নিয়ে এসেছি তার নাম মতিন। উনি তোমার খুব ভালো কোম্পানি হবেন। তুমি তার সঙ্গে গল্প করতে পারবে। উনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

শিশুটি বলল, তাকে জিজ্ঞেস করো ফিবোন্নাক্কি সিরিজের ফোর্থ সংখ্যা কী?

মতিন হতভম্ব হয়ে মুনার দিকে তাকাল। ফিবোনাক্কি সিরিজের নাম সে তার জন্মে শোনে নি। মুনা তিনটা আঙুল বের করে মতিনকে দেখিয়ে ইশারা করছেন। মতিন যন্ত্রের মতো বলল, তিন।

তখনি কমল পার্টিশন ধরে দাঁড়াল। সে তাকিয়ে আছে মতিনের দিকে।

মতিন একটা ধাক্কার মতো খেল। এত সুন্দর শিশু সে তার জীবনে দেখে নি। কোনোদিন দেখবে এরকমও মনে হচ্ছে না। গায়ের রঙ কাঁচা হলুদের মতো বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। মতিন কাঁচা হলুদ কখনো দেখে নি, তবে এখন তার মনে হচ্ছে এই শিশুটির গায়ের রঙকেই কাঁচা হলুদ বলে। পাতলা ঠোঁট। দেখে মনে হচ্ছে একটু আগে হালকা গোলাপি রঙ দিয়ে কেউ ঠোঁট এঁকেছে। বড় বড় চোখ। সেই চোখ শান্ত এবং হয়তো বা

কিছুটা বিষাদ মাখা। মাথাভর্তি এলোমেলো কোঁকড়ানো চুল। মতিনের ইচ্ছা করছে চিরুনি এনে ছেলের চুল আঁচড়ে দিতে।

মতিন বলল, কেমন আছ?

কমল বলল, পরাখা মিতু। পরাখা বখু মিতু!

মতিন হকচকিয়ে গেল। এর মানে কী? হিজিবিজি কী কথা সে বলছে? মতিন মুনার দিকে তাকাল। মুনা কিছু বলছেন না।

কমল বলল, ওযা লেচ। ওযা লেচ নিক্ষুএ।

মতিন এই বিচিত্র ভাষার অর্থ হঠাৎ করেই বের করে ফেলল। ছেলেটা উল্টো করে বাক্যগুলি বলছে।

পরাখা মিতু হলো–তুমি খারাপ। পরাখা বখু মিতু হলো–তুমি খুব খারাপ। একটু আগে সে বলেছে ওযা লেচ, এর অর্থ চলে যাও। ওযা লেচ নিক্ষুএ-র অর্থ এক্ষুনি চলে যাও।

যে উল্টো করে বাক্য বলছে তার সঙ্গে কথা বলতে হলে উল্টো করে বাক্য বলা দরকার। মতিন কী বলবে বুঝতে পারছে না। তুমি কেমন আছ? এই কথা জিজ্ঞেস করা যায়। তুমি কেমন আছর উল্টো কী হবে? ছআ নমকে মিতু? ঠিক আছে তো? মনে মনে পুরো বাক্য উল্টানো মুশকিল। কাগজে লিখতে পারলে ভালো হতো। কাগজে লিখে আয়নায় ধরা। আয়নায় লেখা যেভাবে আসে সেভাবে বলা।

মতিন বলল, ছআ নমকে মিতু?

কমল স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি ভালো আছি। থ্যাংক য়্যু ফর আসকিং। ফিবোনাক্কি সিরিজের ফিফথ টার্মটা কী? সে এখন আর মা

কমল উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে। তবে সে এখন আর সামনের দিকে তাকিয়ে নেই। সে তাকিয়ে আছে তার হাতের গোল বলটার দিকে। বলটা আসলে একটা মিনিয়েচার গ্লোব। কাচের ভেতরের স্থলভাগ ও জলভাগ ঘুরছে। বলটা হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় পৃথিবী ঘুরছে, যদিও কাচের বলটা স্থির।

কমল আবারো বলল, দেরি করছ কেন? বলো ফিবোনাক্কি সিরিজের ফিফথ টার্মটা কী?

মতিন তাকাল মুনার দিকে। মুনা কিছু বলছেন না তবে তাকে সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। আঙুলের ইশারায় কিছু দেখালে মতিন সেখান থেকে কিছু বলতে পারত। তিনি কিছু দেখাচ্ছেন না। মতিন বলল, আমি জানি না।

কমল বলল, তুমি জানো না?

মতিন বলল, না। ফিবোনাক্কি সিরিজ কী, এইটাই আমি জানি না।

কমল বলল, ফোর্থ টার্মটা তো তুমি ঠিক বলেছ। তখন কি কেউ তোমাকে সাহায্য করেছে?

মতিন বিড়বিড় করে বলল, হ্যাঁ।

কমল বলল, তুমি একজন লায়ার। আমি লায়ার পছন্দ করি না।

মতিন চুপ করে রইল। কমল বলল, তুমি আমার সঙ্গে ট্রিকস করছ। আমি ট্রিকস পছন্দ করি না।

কমলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎচমকের দ্রুততায় একটা ঘটনা ঘটল। কমল তার হাতের গ্লোব ছুড়ে মারল। লাগল বাঁ-দিকের কপালে। তার কাছে মনে হলো তার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

রাত দশটা।

মতিন বিছানায় শুয়ে আছে। রাজকীয় শয়ন বলা যেতে পারে। ঘরে এসি চলছে। গায়ে রাখা হালকা চাঁদরেও শীত মানছে না। মনে হচ্ছে চাদরটা আরেকটু ভারি হলে ভালো হতো।

বালিশের পাশে রাখা মোবাইল টেলিফোন বেশ কয়েকবার বেজেছে। মতিনের ধরতে ইচ্ছা করছে না। আরামদায়ক আলস্যে তার শরীর ডুবে আছে। উলিফোনে কথা বলে সে আলস্য নষ্ট করা ঠিক না। টেলিফোনে কথা বলার কাজটা যথেষ্টই পরিশ্রমের। পরিশ্রমটা মানসিক।

টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে। রিংটোনে সুন্দর বাজনা। এই বাজনা নিশুর ঠিক করে দেয়া। কিছুদিন পর পর সে বাজনা বদলে দেয়। এই ব্যাপারে তার যুক্তি হচ্ছে, কাপড় যেমন

নোংরা হয়ে যায় বাজনাও তেমন নোংরা হয়। কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা আছে, বাজনা ধোয়ার ব্যবস্থা নেই বলেই বাজনা বদল।

কে বারবার টেলিফোন করছে? বোতাম টিপে ইচ্ছা করলেই জানা যায়, সেই ইচ্ছাটাও কেন জানি করছে না। যে তাকে ডাকছে সে ডাকতে থাকুক।

দরজায় ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হচ্ছে। এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা। এমন আধুনিক বাড়ির দরজা হবে মাখনের মতো। নিঃশব্দে খুলবে। নিঃশব্দে বন্ধ হবে। ক্যাচক্যাচানি হবে না।

দরজা খুলেছে রহমত। রহমত তিনতলার খেদমতগার। তার শরীর কুস্তিগিরের মতো। কুস্তিগিরদের চোখের দৃষ্টিতে বোকা বোকা ভাব থাকে। কাঠিন্য থাকে না। রহমতের চোখের দৃষ্টি কঠিন। রহমতের সামনে চমৎকার একটা ট্রলিতে এককাপ কফি। এই কফির কাপ হাতে করে আনা যেত। তাতে অবশ্যি বড়লোকি কায়দার প্রকাশ ঘটত না।

মতিন বলল, আমি রাত দশটার পর চা-কফি কিছুই খাই না। এত রাতে চা-কফি খেলে ঘুম হয় না। ক্যাফিনঘটিত সমস্যা।

রহমত বলল, ডিকেফিনেটেড কফি দিব স্যার?

বেয়ারা শ্রেণীর কারো মুখে ডিকেফিনেটেড শব্দটা শুনলে ধাক্কার মতো লাগে। সে এই শব্দটা যে শুনে শুনে শিখেছে তা-না। সে এই শব্দের মানেও জানে।

মতিন বলল, তোমার পড়াশোনা কী?

রহমত বলল, ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি।

ভালো করেছ, এখন ট্রলি নিয়ে বিদায় হও, আমি ঘুমাব।

রহমত বলল, বড় সাহেব কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন।

কী কথা?

উনি কী কথা বলবেন সেটা তো স্যার আমি জানি না। তবে মনে হয় আজকের ঘটনা নিয়ে কথা বলবেন। এই যে আপনার মাথা ফাটল, স্টিচ দেয়া। লাগল।

মতিন বলল, তুমি তোমার বড় সাহেবকে বলল যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি।

রাতে আর কথা হবে না।

মিথ্যা কথা বলব স্যার?

তুমি মিথ্যা বলো না?

নিজের কারণে বলি, অন্যের কারণে বলি না।

তাহলে যাও সত্য কথাটাই বলো।

সত্য কথাটা কী?

সত্য কথাটা হলো, আমি এখন কথা বলতে চাচ্ছি না। একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনাটা হজম করছি। গুরুপাক ঘটনা তো, হজম করতে সময় লাগছে। এই কথাটা গুছিয়ে বলতে পারবে?

পারব স্যার।

মতিন শোয়া থেকে উঠে বসতে বসতে বলল, রহমত, তোমার কি কফি খাওয়ার অভ্যাস আছে?

জি স্যার আছে।

রাত দশটার পর কফি খাও?

জি স্যার খাই।

তাহলে চেয়ারটা টেনে আমার সামনে বসো। কফি খাও। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।

রহমত বলল, চেয়ারে বসতে হবে না স্যার। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কফি খাব।

মতিন বলল, তুমি চেয়ারে বসে আরাম করে কফি খাও। এতে আমার সম্মানের কোনো হানি হবে না। আমি কোনো সম্মানিত ব্যক্তি না। বেকার গ্রাজুয়েট। বেকার গ্রাজুয়েটকে সম্মান করতে হয় না।

রহমত চেয়ারে বসতে বসতে বলল, শুকরিয়া।

মতিন বলল, কতদিন ধরে এ বাড়িতে আছ?

রহমত কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, তিন বছর।

কমল ছেলেটির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে?

আছে।

যোগাযোগটা কোন পর্যায়ের? ভালো যোগাযোগ?

জি স্যার। উনি আমাকে ডাকেন আংকেল ফলিয়া।

ফলিয়াটা কে?

জানি না। উনি নিজের মনে অনেক কিছু বানান।

তোমার সঙ্গে তার গল্প হয়?

জি স্যার।

কী নিয়ে গল্প?

উনি যখন যেই বই পড়েন সেই বই নিয়ে গল্প।

ফিবোনাক্কি সিরিয়েল কী জানেন?

জি স্যার। ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ...। ছোট সাহেব আমাকে বলেছেন, আমি মুখস্থ করেছি।

এই সংখ্যাগুলির বিশেষত্ব কি তুমি জানো?

জানি স্যার। ছোট সাহেব বলেছেন, এর প্রতিটি সংখ্যা আগের দুটা সংখ্যার যোগফল।

এরকম সিরিয়েল আরো আছে?

জি স্যার আছে। যেমন ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫...

এর বিশেষত্ব কী?

বিশেষত্ব জানি না স্যার।

অঙ্ক ফঙ্ক ছাড়া আর কী নিয়ে কথা হয়?

নানান বিষয়।

আজ কথা হয়েছে?

জি হয়েছে।

কী নিয়ে কথা হলো?

বিজ্ঞানের কথা।

বিজ্ঞানের কথাটা কী?

শব্দের গতি।

শব্দের গতি মানে কী?

রহমত কফির কাপ ট্রলিতে রাখতে রাখতে বলল, শব্দ ঘণ্টায় সাতশ পঞ্চাশ মাইল বেগে যায়। শব্দের গতি এর চেয়ে বেশি হলে আমাদের কী সুবিধা হতো এই নিয়ে কথা।

কী সুবিধা হতো?

ছোট সাহেব বলেছেন কী সুবিধা হতো। আমি বুঝতে পারি নাই। উনার বেশিরভাগ কথাই আমি বুঝতে পারি না।

কিন্তু তুমি ভাব কর যেন বুঝতে পারছ।

জি ভাব করি, কিন্তু ছোট সাহেব বুঝতে পারেন যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আজকের ঘটনা নিয়ে কথা হয়েছে? আমার মাথা ফাটার ঘটনা?

জি-না।

আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখন যাও।

রাতে স্ন্যাকস জাতীয় কিছু খাবেন স্যার? দিয়ে যাব?

না, শুধু এসিটা এমন করে দাও যেন ঘর আরো ঠাণ্ডা হয়।

একুশ সেন্টিগ্রেডে দেয়া আছে।

এমন কর যেন শীতে কাঁপতে কাঁপতে ঘুমাতে পারি।

আঠারো দেই?

দাও।

রহমত বলল, টেম্পারেচার কীভাবে কন্ট্রোল করে আপনাকে শিখিয়ে দেই স্যার–যদি বেশি ঠাণ্ডা লাগে তাহলে নিজে নিজে ঠিক করতে পারবেন।

না। আমি শিখব না। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা শিখতে চায় না। আমি তাদের দলে।

রহমত ঘর থেকে বের হবার আগে আগে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, বড় সাহেব লাইব্রেরি ঘরে আছেন। দুই মিনিটের জন্যে কি আসবেন? বড় সাহেব খুব খুশি হবেন।

মতিন হাই তুলতে তুলতে বলল, উনার সঙ্গে এখন দেখা হলে আমি খুব অখুশি হবো। আমার কাছে আমার খুশিটা অনেক ইম্পোর্টেন্ট। কাজেই দেখা হবে না।

জি আচ্ছা স্যার।

ঘর অতি দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মতিনের গায়ের চাঁদরে শীত মানছে না। কাবার্ডে হলুদ রঙের একটা কম্বল আছে। মনে হচ্ছে কম্বল গায়ে দিতে হবে। মতিনের মোবাইল টেলিফোন আবার বাজছে। ধরব না ধরব না করেই মতিন টেলিফোন ধরল। তার ধারণা ছিল নিশু টেলিফোন করেছে। তা-না, টেলিফোন করেছেন মতিনের বড় বোন সালেহা। তাঁর গলা কাঁপা কাঁপা।

এই নিয়ে তোকে এগারোবার টেলিফোন করলাম। তুই কোথায়?

মতিন বলল, বড় আপা, আমি একটা ডিপ ফ্রিজের ভেতর শুয়ে আছি।

সালেহা আতঙ্কিত গলায় বললেন, কোথায়?

ডিপ ফ্রিজের ভেতর। তোমরা যেখানে মাছ-মাংস রেখে বাসি কর সেখানে।

তোর কোন কথাটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা, কোনটা ঠাট্টা কোনটা সিরিয়াস আমি কিছুই বুঝি না। এখন আর বুঝতে চাই না। তৌহিদার কাছ থেকে শুনলাম তুই বাসায় এসেছিলি। কী জন্যে?

ফ্রিজের ভেতর ঢোকার আগে তোমার কাছ থেকে দোয়া নিতে এসেছিলাম।

ফাইজলামি রেখে সত্যি কথা বল, তোর টাকার দরকার?

না।

দরকার থাকলে বল।

দরকার নেই।

তুই তৌহিদাকে কিছু বলেছিস?

কী বলব?

সেটা তো আমি জানি না। কিছু বলেছিস কি-না? সে কান্নাকাটি করছে। আমি যতবার বলি, কী হয়েছে, ততবারই ফুঁপিয়ে ওঠে। তোদের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়েছে?

সমস্যা হবার জন্যে সামান্য হলেও ঘনিষ্ঠতা লাগে। সেই ঘনিষ্ঠতা তো তৌ-এর সঙ্গে আমার নেই।

তৌটা কে?

তৌহিদাকে ছোট করে তৌ ডাকি। তৌ যে হবে আমার বৌ।

তুই কি সত্যিই তৌহিদাকে বিয়ে করবি?

অবশ্যই।

কবে?

তৌ যখন বলবে তখন। তৌ যদি বলে আগামী পরশু তাতেও আমি হর্ষু।

হর্ষ মানে কী?

হর্ষু মানে হর্ষিত। আনন্দিত।

আমার সঙ্গে এরকম ফাজলামি করে কথা বলিস কেন? আমি তোর বড় বোন। আমি কি তোর ইয়ার বন্ধু? এখন সত্যি করে বল, তুই কোথায়?

একজন ভয়ঙ্কর বড় লোকের বাড়ির এসি দেয়া ঘরে শুয়ে আছি। এসির টেম্পারেচার আঠারোতে দেয়া বলেই ঘরটা ডিপ ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা। এই জন্যেই তোমাকে বলেছি ডিপ ফ্রিজের ভেতর শুয়ে আছি।

এত বড় লোকের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিস কেন?

কারণ এই বাড়ির একটা গুণ্ডা ছেলের দেখভালের চাকরি পেয়েছি। থাকা খাওয়া ফ্রি। মাসিক বেতন পনের হাজার।

গুণ্ডা ছেলে মানে কী?

গুণ্ডা ছেলে মানে গুণ্ডা ছেলে। সে বাড়ি দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দুটা স্টিচ দিতে হয়েছে। আপা, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বলতে পারব না। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। মোবাইল অফ করে আমি এখন কম্বলের ভেতর ঢুকে যাচ্ছি।

মতিন মোবাইল অফ করে গুটিসুটি মেরে চাঁদরের ভেতর ঢুকে গেল। বিছানা থেকে নেমে কম্বল আনার মতো পরিশ্রম করতেও ইচ্ছা করছে না। এখন সে সরীসৃপদের মতো নিজের গায়ের উত্তাপে নিজেকে গরম করবে।

নতুন জায়গায় চট করে তার ঘুম আসে না। তবে আজ মনে হয় ঘুম আসবে। এখনই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে। এসির একঘেয়ে শো শো শব্দটাও কাজে আসছে। Montony is sleeps carriage. একঘেয়েমি ঘুম হ্রদ। ভালো নাম মনে এসেছে তো! ঘুম হ্রদ। এই নামে উজবেক কবি নদ্দিউ নতিম অবশ্যই একটা কবিতা লিখতে পারেন–

ঘুম্র হ্রদ

অঘুমো রাজকন্যা ছিল ঘুম্রহ্রদে
তাকে ঘিরে জল নাচে শোঁ শোঁ শব্দ হয়
রাজকন্যার ভয় হয় তার শরীরে অসুখ
অসুখের নাম কী? প্রশ্ন করে জলপাখি
অঘুমা রাজকন্যা দেয় না উত্তর।

উত্তর-এর সঙ্গে মিল হয় এমন একটা শব্দ দরকার। শব্দ মাথায় আসছে না।

দেয় না উত্তর
… … নির্ভর
… … মর
… … পর
… … সর
… … ঝড়

আচ্ছা ঝড় নিয়ে কাজ করা যায়। উত্তরের সঙ্গে ঝড় ভালোই মিলে।

অঘুমা রাজকন্যা দেয় না উত্তর
তখন হ্রদ জেগে ওঠে
জেগে ওঠে দক্ষিণের ঝড়॥

ঠিক হলো না। উত্তর শব্দটা ছিল বলেই মাথায় দক্ষিণ ঘুরঘুর করছে। এই উত্তর সেই উত্তর না।

কবিতাটা উল্টো করে লিখলে কেমন হয়? কমলের মতো শিশুদের জন্যে উল্টো কবিতা। মিল থাকবে শুরুতে। সেটা কঠিন হবে। কবিতা যা আছে তাকেই উল্টানো যাক।

দহ্র ম্রঘু

দেহ্র ম্রঘু লছি ন্যাকজরা মোঘুখ
য়হ ব্দশ শোঁ শোঁ চেনা লজ রেঘি কেতা

খসুঅ রেরীশ রঁতা য়হ য়ভ রন্যাকজরা
খিপালজ রেক শ্নপ্র? কী মুনা রখেসুঅ।
রত্তউ না য়দে ন্যাকজরা মাঘুঅ।

মতিন লক্ষ করল উল্টো করে কবিতা লিখে সে বেশ মজা পাচ্ছে।

আচ্ছা নিশুকে টেলিফোন করে কিছু উল্টো কথা বললে কেমন হয়? রাত অনেক হয়েছে। রাত কম হলে অ্যাক্সপেরিমেন্ট করা যেত। নিশুকে উল্টালে হয় শুনি। শুনি নামটাও তো সুন্দর।

৪. ইমরান সাহেবের ঘুম

সকাল নটা।

ব্যারিস্টার সালেহ ইমরান সাহেবের ঘুম অনেক আগেই ভেঙেছে। তিনি শোবার ঘরের টিভির সামনে বসে আছেন। টিভিতে সিএনএন ধরা আছে। তবে শব্দ হচ্ছে না, শুধুই ছবি। মুনা ঘুমাচ্ছে। টিভির শব্দে তিনি স্ত্রীর ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছেন না। মুনা কাল অনেকরাত জেগে এইচবিওতে একটা ভূতের ছবি দেখেছে। আজ সে বেলা পর্যন্ত ঘুমুবে, এটাই স্বাভাবিক।

সালেহ ইমরান টিভির পর্দার দিকে তাকাচ্ছেন না। তাঁর হাতে কয়েকটা পত্রিকা। তাঁর নজর পত্রিকার হেডলাইনে। আজকের প্রধান খবর–কারগিল। সীমান্তে ভারত পাকিস্তান খণ্ডযুদ্ধ। এই খণ্ডযুদ্ধের একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এই যুদ্ধ পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে দুটি দেশের যুদ্ধ।

আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। অন্যদিন খবরের কাগজ পড়ার মধ্যেও একটা তাড়াহুড়া থাকে। সেই তাড়াহুড়া আজ নেই। তিনি এককাপ চা এবং এককাপ কফি এর মধ্যে খেয়ে নিয়েছেন। যেদিন চা ভালো হয় সেদিন কফি ভালো হয় না। যেদিন কফি ভালো হয় সেদিন চা ভালো হয় না। আজ দুটিই ভালো হয়েছে। সালেহ ইমরানের আরেক কাপ কফি খেতে ইচ্ছা করছে। তিনি অপেক্ষা করছেন। মুনা ঘুম ভেঙেই কফি খাবে। ছুটির দিনে স্ত্রীর সঙ্গে কফি খাওয়া আনন্দের ব্যাপার। সেই আনন্দের জন্যে অপেক্ষা করা যায়।

মুনার ঘুম ভেঙেছে। সে বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, হ্যালো! গুড মর্নিং।

সালেহ ইমরান স্ত্রীর দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন। মুনার গায়ে কোনো কাপড় নেই। মুনা গায়ে কাপড় রেখে ঘুমাতে পারে না। তার না কি হাঁসফাস লাগে। দম বন্ধ হয়ে আসে। স্ত্রীর এই অভ্যাসের সঙ্গে সালেহ, ইমরান দীর্ঘ পনের বছর ধরে পরিচিত, তারপরেও মুনার এই অবস্থায় অতি স্বাভাবিক হাসাহাসি তিনি নিতে পারেন না।

মুনা টিভির সামনে গেল। রিমোট নিয়ে চ্যানেল চেঞ্জ করে এইচবিওতে দিতে দিতে বলল, অ্যাই, বেল টিপে কফি দিতে বলো।

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি গায়ে কিছু একটা দাও, তারপর বলি।

মুনা বলল, তুমি ভুলে যাচ্ছ, দিনের প্রথম কফি আমি এভাবেই খাই।

সালেহ ইমরান বললেন, তাহলে গায়ে চাদর টেনে বিছানায় বসো। কেউ একজন ঘরে ঢুকে তোমাকে এই অবস্থায় দেখবে, এটা কি ভালো হবে?

আমাদের শোবার ঘরে আমরা না ডাকা পর্যন্ত কেউ ঢুকবে না। এটা তুমি ন ভালো করে জানো।

তারপরেও তো ভুল করে কেউ ঢুকে পড়তে পারে।

কেউ এরকম ভুল করলে দেখবে তাদের মেমসাহেব নগ্ন হয়ে স্যারের পাশে বসে আছে। এই দৃশ্য দেখলে পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে যাবে না। সোলার সিস্টেমে তেমন কোনো বিপর্যয় হবে না।

সালেহ ইমরান চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। নিজেই কিচেন থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে ঢুকলেন। মুনা আগের অবস্থায় নেই। সে বড় বড় ফুলের গাউন জাতীয় পোশাক গায়ে দিয়েছে। বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসেছে। টাওয়েল দিয়ে মুখ মুছে নি। মুখে বিন্দু বিন্দু পানি। সালেহ ইমরান কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুনাকে খুবই সুন্দর লাগছে।

মুনা কফিতে চুমুক দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বলল, তুমি তো কাল ছবিটা অল্প খানিকক্ষণ দেখে ঘুমিয়ে পড়লে। পুরোটা দেখলে মজা পেতে।

সালেহ ইমরান বললেন, ভূতের ছবি দেখে কেউ মজা পায় না, ভয় পায়।

শেষপর্যন্ত ছবিটা কিন্তু ভূতের ছিল না। ভৌতিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাচ্চা মেয়েটা করত।

কেন করত?

কারণ মেয়েটা মানসিক রোগী।

মুনা সালেহ ইমরানের কোল থেকে সবকটা খবরের কাগজ টেনে নিল। সে কাগজ পড়বে না। দ্রুত পাতা উল্টে ছবিগুলি দেখবে। ছবির ক্যাপশন পড়বে।

সালেহ ইমরান ঠিক করলেন স্ত্রীকে উপদেশমূলক কিছু কথা বলবেন। যেমন, আজ তিনি টিভিতে সিএনএন দেখছিলেন। মুনা তাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করে চ্যানেল বদলে দিল। কোল থেকে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে নিল।

মুনা বলল, ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হচ্ছে–পড়েছ খবরটা?

সালেহ ইমরান গম্ভীর গলায় বললেন, হুঁ!

এই যুদ্ধে আমরা কাদেরকে সাপোর্ট করব? ইন্ডিয়াকে না পাকিস্তানকে?

যুদ্ধকে আমরা সাপোর্ট করব কেন? যুদ্ধ কি সাপোর্ট করার মতো বিষয়?

মুনা বলল, তুমি গলা গম্ভীর করে কথা বলছ কেন? কোনো কারণে কি আমার উপর রেগে আছ?

না।

কেউ আমার উপর রাগ করলে কিংবা বিরক্ত হলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারি।

কেউ যদি তোমার উপর খুশি হয় সেটা কি ধরতে পার?

মুনা বলল, অবশ্যই পারি। কফি নিয়ে ঘরে ঢুকে তুমি আমাকে দেখে খুশি হয়ে গেলে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি।

ক্ষিধে লেগেছে, চল নাশতা খেতে যাই।

মুনা বলল, আমি নাশতা খাব না। আমার চোখ থেকে ঘুম যায় নি। আমি আবার ঘুমাব। তুমি নাশতা খেয়ে নাও।

ঠিক আছে।

কাল রাতে তোমাকে যে একটা কথা বলেছিলাম সেটা মনে আছে?

কী কথা?

মতিন নামের লোকটাকে বিদায় করে দিতে। সে এক সপ্তাহ এই বাড়িতে আছে। এক সপ্তাহের বেতন দিয়ে তাকে বিদায় করে দিবে। কী কারণে তাকে বিদায় করবে সেটা রাতে একবার বলেছি। তোমার মনে না থাকলে আরেকবার বলতে পারি।

আরেকবার বলো।

মুনা বিছানায় উঠে গায়ের কাপড় খুলে চাদর দিয়ে নিজেকে ঢাকতে ঢাকতে বলল, মতিন নামের লোকটা ঘর থেকে বাইরে পা দেয় নি। ঘরের বাইরে পর্যন্ত আসে নি। কমলের ঘরে যায় নি। কমলের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করে নি। নিজের ঘরে বসে দিনরাত টিভি দেখেছে, গান শুনেছে, বই পড়েছে, সিগারেট খেয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এই চাকরিটা নিয়েছে রিলাক্স করার জন্যে।

একটা ছোট্ট ঘরে সাতদিন বসে থাকার মধ্যে কি কোনো রিলাক্সেসান আছে?

একেকজন একেকভাবে রিলাক্স করে। মতিন নামের লোকটির রিলাক্সেসান এই রকম। তুমি আমাকে আরেককাপ কফি দিয়ে তারপর নাশতা খেতে যাও। ভালো কথা, আজ শুক্রবার, কমলের মুভি ডে। সন্ধ্যাবেলা তার সঙ্গে মুভি দেখতে হবে, ভুলে যেও না।

ভুলব না।

থ্যাংক ইউ, অ্যান্ড আই লাভ ইউ। শোন, তোমাকে কফি আনতে হবে না। আমি এখনই ঘুমিয়ে পড়ব।

মুনা চাঁদরের নিচে ঢুকে গেল।

সালেহ ইমরান লাইব্রেরি ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে মতিন বসে আছে। তার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই সাতদিনে লোকটা মনে হচ্ছে শেভ করে নি। তবে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে লোকটাকে খারাপ লাগছে না। সালেহ ইমরান পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বললেন, তোমাকে কেন ডেকেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

মতিন বলল, বুঝতে পারছি না।

সালেহ ইমরান সিগারেট ধরাবেন কি ধরাবেন না বুঝতে পারছেন না। এটা হবে তার দিনের প্রথম সিগারেট। তিনি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছেন। চেষ্টার অংশ হিসেবে দিনের প্রথম সিগারেট ধরানোর সময় প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়াতে হবে। তিনি যে রুটিনে চলছেন সেই রুটিনে আজকের প্রথম সিগারেট

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

একটায় ধরানোর কথা। এখন বাজছে বারোটা।

তিনি সিগারেট ধরালেন। মতিন নামের লোকটিকে স্যাক করা হবে। অস্বস্তিকর কাজ। যে-কোনো অস্বস্তিকর কর্মকাণ্ডে সিগারেটের ধোঁয়া একধরনের আব্রু তৈরি করে।

সালেহ ইমরান সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোমাকে আমরা যে। পারপাসে রেখেছিলাম সেই পারপাস ফুলফিলড হচ্ছে না।

মতিন বলল, ও আচ্ছা।

সালেহ ইমরান বললেন, You are not the right person.

মতিন বলল, বুঝতে পারছি।

তোমার সময় নষ্ট হলো, আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট।

স্যার, কোনো অসুবিধা নেই। আমি কি এখনই চলে যাব?

ইউ টেক ইউর টাইম। তুমি সাতদিন ছিলে, তোমাকে আমি পুরো মাসের বেতন দিতে বলেছি।

স্যার থ্যাংক য়্যু। যেহেতু আমি এখন আর আপনার কর্মচারী না, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি? আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে লোভ লাগছে।

সালেহ ইমরান বললেন, অবশ্যই! তিনি তাঁর সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। লাইটার এগিয়ে দিলেন। সালেহ ইমরানকে দেখে মনে হচ্ছে। চাকরিচ্যুতি জাতীয় কঠিন কর্মকাণ্ড খুব সহজেই হয়ে যাওয়াতে তিনি আনন্দিত।

সালেহ ইমরান বললেন, চা দিতে বলি। চা খাও।

মতিন বলল, চা খাব না স্যার।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি শুনেছি পুরো সাতদিন তুমি নিজের ঘরে বসেছিলে। আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লেগেছে। কারণটা কী বলো তো।

মতিন বলল, কারণ এখন বলা অর্থহীন।

সালেহ ইমরান বললেন, অর্থহীন হলেও বললা। অবশ্যি তোমার যদি তেমন আপত্তি না থাকে।

মতিন বলল, আপত্তি আছে। কিন্তু আপনি শুনতে চাচ্ছেন, কাজেই শুনুন। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে একধরনের গেম খেলার চেষ্টা করেছি। Autistic শিশুরা নিজেকে নিয়ে গুটিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তারা কারো সঙ্গে মিশে না। নিজের ঘর থেকে বের হতে চায় না। আমি ঠিক এই কাজটি করেছি। আপনার ছেলে ব্যাপারটি লক্ষ করেছে। সে আমাকে তার মতোই একজন ভাবছে। আমি ডাকলেই সে আসবে, এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

তুমি তাকে ডাক নি কেন?

আমি নিজে তাকে ডেকে আনতে চাই নি। আমি চেয়েছিলাম সে নিজে এসে আমার কপাল ফাটিয়ে দেয়ার জন্যে লজ্জিত হবে এবং সরি বলবে।

সালেহ ইমরান দ্বিতীয় সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তোমার ধারণা তুমি ডাকলেই সে আসবে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? এটা কী করে বুঝলে?

সে আমাকে একটা নোট পাঠিয়েছিল। নোটটা দেখতে চান? আমার সঙ্গেই আছে। নোটটা সে নিজেই দরজার নিচ দিয়ে দিয়েছে।

সালেহ ইমরান আগ্রহের সঙ্গে বললেন, দেখি!

মতিন মানিব্যাগ থেকে কাগজের টুকরাটা বের করল। সেখানে লেখা

yoser orrsy srroy orrys rroys ryrso ysror soyrr rryos ryors rsroy yorsr osrry osyrr sryor syon orsry osryr rrsoy royrs srryo soryr yorrs ysor sroyr rrosy ysrro oysro rysor rsoyr srory sryro yrsro ryosr rsory rosry rosyr oysrr yrors ryros rsyro rrsyo rorys oyrsr yrros oryrs rsyor yrosr oyrrs oryst isryo yrsor syror syrro orsyr oyrrs rorsy yrrso roysr

সালেহ ইমরান বললেন, এর মানে কী?

সূচিপত্র

মতিন বলল, সে লিখেছে Sorry. সরি লিখতে যে অক্ষরগুলি লাগে এগুলিই সে নানানভাবে সাজিয়েছে। শুধু মূল শব্দটা লেখে নি। আবার এমনও হতে পারে যে, প্রতিবারই সে Sorry লিখেছে, কিন্তু Dyslexiaর কারণে মূল বানানটা তার মাথায় ঠিকমতো আসছে না। Autistic শিশুরা Dyslexiaতে ভুগে, এই তথ্য আপনি অবশ্যই জানেন। আপনিই আমাকে বইপত্র দিয়েছেন।

মতিন!

জি স্যার।

এসো চা খাই। চা খেতে খেতে আরো কিছু কথা বলি।

চা খাব না স্যার। আমি এখন চলে যাব। কে আমাকে টাকা দেবে বলে দিন।

সালেহ ইমরান আরেকটি সিগারেট ধরালেন। সিগারেট পরপর দুটি হয়ে গেছে। এটা খারাপ লক্ষণ। এখন সিগারেটের সংখ্যা দ্রুত বাড়বে। সালেহ ইমরান মতিনের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তোমার কর্মকাণ্ড শুরুতে বুঝতে পারি নি বলে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি এখানেই থাক।

মতিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আমার ইচ্ছা করছে না।

চট করে না বলবে না। যে-কোনো সিদ্ধান্তই ভেবে-চিন্তে নিতে হয়।

অনেকেই ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় না।

ঠিক আছে, তুমি চলে যেতে চাচ্ছ চলে যাবে। আমার সঙ্গে এককাপ চা খেয়ে যেতে তো সমস্যা নেই। বোস। প্লিজ।

মতিন বসল! সালেহ ইমরান সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।

নিশু তার বাবার জন্যে ক্র্যাচ কিনে এনেছে। অ্যালুমিনিয়ামের হালকা ক্র্যাচ। ঝকঝক করছে।

আজিজ আহমেদ বিরক্ত গলায় বললেন, এ-কী! ক্র্যাচ কী জন্যে?

নিশু বলল, ক্র্যাচের ব্যবহার তুমি জানো না বাবা? বগলের নিচে দিয়ে হাঁটবে। হাইট অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যবস্থাও আছে। এসো হাইট ঠিক করে দেই।

আমি ক্র্যাচ বগলে দিয়ে হাঁটব কী জন্যে?

তুমি ক্র্যাচ বগলে দিয়ে হাঁটবে, কারণ তুমি পা মচকে ফেলেছ। পা ফেলতে পারছ না।

পা তো ভাঙে নাই। সামান্য মচকেছে, একদিন রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন আর ক্র্যাচ ব্যবহার করবে না। ঠিক না হওয়া পর্যন্ত করবে। উঠে দাঁড়াও, আমি হাইট ঠিক করব।

আজিজ আহমেদ কঠিন গলায় বললেন, না।

নিশু বলল, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন বাবা?

সব বিষয়ে তুই জোর খাটাস, এটা আমার পছন্দ না।

মেয়ে তার বাবার উপর জোর খাটাতে পারবে না?

না।

বাবা কি মেয়ের উপর জোর খাটাতে পারবে?

মেয়ের জ্ঞানবুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পারবে।

নিশু শান্ত গলায় বলল, আমার জ্ঞানবুদ্ধি কি হয়েছে?

আজিজ আহমেদ বললেন, তোর জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি। তারপরেও আমি কিন্তু তোর উপর জোর খাটাই না।

আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি?

না। এমএতে ফার্স্ট ক্লাস পেলেই জ্ঞানবুদ্ধি হয় না।

আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি এটা কেন বলছ?

ব্যাখ্যা করতে হবে?

অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে হবে। মনে কর পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে–নিশুর জ্ঞানবুদ্ধি নেই বিষয়টি উদাহরণসহ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা কর!

শুনলাম তুই ইংল্যান্ডে যাবার আগে বিয়ে করবি। তারপর শুনলাম নিজেই পাত্র খোজায় বের হয়েছিস। একজন না করেছে, এখন অন্য দুইজনের সঙ্গে দেন-দরবার করছিস। তারপর শুনলাম দুইজনের একজন রাজি হয়েছে, এখন আবার তুই রাজি না। কারণ যে রাজি হয়েছে সে তোর সঙ্গে ইংল্যান্ডে যেতে চায়। এতে আবার তোর আপত্তি। আরো ব্যাখ্যা লাগবে?

না।

নিশু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বাবা, আমি বেরুচ্ছি। দুপুরের আগেই ফিরব। তুমি আবার রান্না করতে বসবে না। আমি দুপুরের খাবার নিয়ে আসব।

ক্র্যাচ জোড়া নিয়ে যা, আমার দেখতে ভালো লাগছে না।

নিয়ে যাচ্ছি।

মতিনের কোনো খবর পাওয়া গেছে? তার সঙ্গে আমার জরুরি আলাপ ছিল।

এক সপ্তাহ ধরে তার কোনো খোজ নেই। সে কোথায় গেছে জানি না। তার মেসে গিয়েছিলাম, সেখানে নেই। মোবাইলে অনেকবার টেলিফোন করেছি। রিং হয় কিন্তু ধরে না।

ও আচ্ছা।

এখন বলো, মতিনের জ্ঞান-বুদ্ধি কি ঠিক আছে? না-কি সেও জ্ঞান-বুদ্ধি শূন্য।

আজিজ আহমেদ জবাব দিলেন না।

নিশু চলে গেল। সঙ্গে ক্র্যাচ নিয়ে গেল না। আজিজ আহমেদ রাগী চোখে ক্র্যাচের দিকে তাকিয়ে সময় পার করতে লাগলেন। ডান পায়ে তিনি ভালোই ব্যথা পেয়েছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সমস্যাটা হয়েছে। যে ধাপে পা ফেলতে চেয়েছেন সেই ধাপে না ফেলে তার পরের ধাপে ফেলেছেন। মস্তিষ্ক কো-অর্ডিনেটে সমস্যা করেছে। মস্তিষ্কের বয়স হয়েছে। সে ক্লান্ত। এ ধরনের ভুল সে আরো করবে। তিনি রাস্তা পার হচ্ছেন, দৈত্যের মতো ট্রাক আসছে। হন বাজাচ্ছে। মস্তিষ্ক তাকে সাবধান করতে ভুলে যাবে। লোকজন আহা আহা করে ছুটে আসবে। একজন ছুটবে ট্রাক ড্রাইভার এবং হেল্পারের পেছনে। ট্রাক ড্রাইভার ধরা পড়বে না, কিন্তু অল্পবয়স্ক হেল্পারটা ধরা পড়ে যাবে। তাকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হবে। যারা তাকে মেরে ফেলবে তারা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক মানুষ। অফিস শেষে বাসায় ফিরে মেয়েকে অঙ্ক শেখায়। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেইলি রোডে নাটক দেখতে যায়।

চাচাজি!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আজিজ আহমেদ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। এত চমকানোর মতো কিছু হয় নি। তার সামনে মতিন দাঁড়িয়ে আছে। মতিনের হাতে বাজারের ব্যাগ। ব্যাগভর্তি বাজার। দুই কেজি খাসির মাংস, খাসির কলিজা। বিশাল সাইজের একটা ইলিশ। তিনটা গলদা চিংড়ি।

মতিন বলল, চাচাজি, আপনি কি ধ্যান করছেন? কতক্ষণ ধরে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি দেখেও দেখছেন না। কী চিন্তা করছিলেন?

কিছু না।

আপনার পায়ে কী হয়েছে?

পায়ে কিছু হয় নাই। সামান্য মচকেছে।

ক্র্যাচ-ফাচ দেখতে পাচ্ছি।

নিশুর কাণ্ড। তুমি অবশ্যই আজ যাবার সময় ক্র্যাচ দুটি নিয়ে যাবে। It is an order.

মতিন বলল, চাচাজি, আপনি কি কোনো কারণে রেগে আছেন?

আমি রেগে আছি। যতবার ক্র্যাচ দুটি চোখে পড়ছে ততবারই রাগ বাড়ছে।

চাচাজি, আপনি মাথা থেকে ক্র্যাচের ব্যাপারটা দূর করে দিন। আমি যাবার সময় এই দুই বস্তু নিয়ে যাব। কিছুদিন ক্র্যাচ বগলে দিয়ে হাঁটব।

আজিজ আহমেদ ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন?

পঙ্গু জীবন যাপন করে দেখি কেমন লাগে। মানুষদের সহানুভূতি নিয়ে জীবন যাপন। পঙ্গুদের প্রতি সমাজের সহানুভূতি আছে। চাচাজি, আপনি কি জানেন, পঙ্গুদের পৃথিবীর কোনো দেশেই ক্যাপিটেল পানিশমেন্ট দেয়ার বিধান নেই?

জানি না তো!

বাংলাদেশেও নেই।

তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

ডুব দিয়ে ছিলাম চাচাজি। এখন ভেসে উঠেছি।

আবার কবে ডুব দেবে?

জানি না। চাচাজি, চলুন রান্নাবান্নায় নেমে পড়ি। হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে গলাম, বাজার নিয়ে এসেছি। একটা ইলিশ মাছ এনেছি ফাটাফাটি। সে ইলিশ সাম্রাজ্যের রানী। খাঁটি পদ্মার ইলিশ। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছাকাছি ধরা পড়েছে। ইলিশের নাক পর্যন্ত বোঁচা। মনে হয় ব্রিজের স্প্যানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে।

আজিজ আহমেদ বিরক্ত মুখে বললেন, আজ রান্নাবান্না হবে না। নিশু না করে দিয়েছে। সে না-কি খাবার নিয়ে আসবে। আমি নিশুকে রাগাতে চাচ্ছি না।

বাজার কি ফ্রিজে রেখে দেব?

ফ্রিজ নষ্ট।

আমি কি চলে যাব?

চলে যাও। ক্র্যাচ সঙ্গে নিয়ে যাও। বাজার যা এনেছ তাও নিয়ে যাও।

আপনার মেজাজ কি বেশি খারাপ?

হুঁ।

মেজাজ কখন ঠিক হবে কিছু বুঝতে পারছেন? ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মেজাজ ঠিক হলে বসতাম।

তুমি চলে যাও। বাজার যা এনেছ নিয়ে যাও।

আপনি রাগ করেছেন নিশুর উপর, সেই রাগ দেখাচ্ছেন আমাকে। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

আজিজ আহমেদ জবাব দিলেন না।

সিগারেট খাবেন চাচাজি? একটা সিগারেট দেই। প্রচণ্ড রাগের সময় সিগারেট ধরালে রাগটা কমে। এটা পরীক্ষিত।

আজিজ আহমেদ টেবিলে রাখা খবরের কাগজ হাত বাড়িয়ে নিলেন। এই কাজটি করার জন্যে তাঁকে সামান্য ঝুঁকতে হলো। সেই সামান্য ঝুঁকিতেই পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা বোধ হলো। গরম পানিতে পা ডুবিয়ে রাখলে আরাম হতো। মতিনকে বললেই সে গরম পানি করে দিবে। তার কাউকেই কিছু বলতে ইচ্ছা। করছে না। তার ইচ্ছা করছে বাড়িঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে।

মতিন ক্র্যাচে ভর দিয়ে ঢাকা শহরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। লোকজন তার দিকে তাকাচ্ছে, তবে মতিন যে-রকম ভেবেছিল সেরকম হচ্ছে না। কেউ তাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না। গাঢ় সহানুভূতির তেমন কোনো দৃষ্টি তার প্রতি নেই। হাতে বাজারের ব্যাগটাও সমস্যা করছে। ক্র্যাচে হুকের মতো কিছু থাকলে ভালো হতো। সেই হুকে বাজারের থলি ঝুলানো যেত। যারা ক্র্যাচ নিয়ে ঘোরাফেরা করে তাদের মাথায় এই বুদ্ধিটা আসে না কেন!

এক পা দুলিয়ে ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটার প্রক্রিয়া মতিন রপ্ত করে ফেলেছে। তার ভালো লাগছে। দুটি ক্র্যাচে ভর দিলে শরীর দোলনার মতো সামান্য দোলে–তখন ভালো লাগে। মতিন ঠিক করে ফেলল সে হেঁটে হেঁটেই বোনের বাসায় যাবে। সময় লাগবে? লাগুক। তার হাতে অফুরন্ত সময়।

দরজা খুলল তৌহিদা। মতিন বলল, মিস তৌ, বাজারের ব্যাগটা ধর তো।

তৌহিদা বাজারের ব্যাগ ধরল না। হতভম্ব গলায় বলল, আপনার পায়ে কী হয়েছে?

লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে।

লিগামেন্টটা কী?

নিজেও পরিষ্কার জানি না। ডাক্তাররা জানে।

সারতে কতদিন লাগবে?

মতিন হতাশ ভঙ্গি করে বলল, এই জীবনে সারবে বলে মনে হচ্ছে না। বাকি জীবন ক্র্যাচে ভর দিয়েই চলতে হবে। এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ।

কী ভেবে দেখব?

পঙ্গু স্বামী নিয়ে সংসার করতে পারবে কি-না।

তৌহিদার কান্না পাচ্ছে। সে চেষ্টা করছে চোখের পানি আটকাতে। বেশিক্ষণ পারবে এরকম মনে হচ্ছে না। তার ইচ্ছা করছে এক্ষুনি ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাঁদে। মানুষটাকে দরজার কাছে ফেলে যেতেও ইচ্ছা করছে না। বেচারা হাঁটতে পারছে না, তার উচিত সাহায্য করা। সে যদি এখন বলে, আপনি আমার শরীরে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকুন, তাহলে কি অন্যায় হবে?

অন্যায় হলে হবে। লোকে তাকে খারাপ ভাবলে ভাববে। সে কিচ্ছু কেয়ার করে না।

মতিন হঠাৎ বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, তৌহিদা অন্যদিকে ফিরে কাঁদছে। তার প্রধান চেষ্টা কান্না আটকানোর। সে তা পারছে না। কান্না থামানোর প্রক্রিয়ায় সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

মতিন বলল, কাঁদছ কেন? সমস্যা কী?

তৌহিদা ছুটে পালিয়ে গেল।

সালেহা ছোট ভাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হলো খুশি হয়েছেন। তাঁর চোখে মখে আনন্দ আনন্দ ভাব। তিনি বললেন, তোর যে এই অবস্থা হবে আমি জানতাম। তোর দুলাভাইকে বলেছি। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

মতিন বলল, দুলাভাইকে কী বলেছ?

বলেছি যে তোর একটা বিপদ হবে।

বুঝলে কীভাবে? টেলিপ্যাথি?

স্বপ্নে দেখেছি। শেষরাতের স্বপ্ন। দেখলাম সাদা রঙের একটা সাপ আমার বাঁ পায়ে ছোবল দিয়েছে।

সাপ তোমার পায়ে ছোবল দিয়েছে, স্বপ্নের হিসাবে তোমার পায়ের লিগামেন্ট ছেড়ার কথা। আমারটা ছিঁড়ল কেন?

তৌহিদা এই কথায় খুব মজা পেল। একটু আগেই সে কেঁদে এসেছে। অশ্রুপাতের চিহ্ন এখন আর তার চেহারায় নেই।

সালেহা বললেন, নিজের উপর স্বপ্ন দেখলে অন্যের উপর ফলে। আমি যদি স্বপ্নে দেখি আমি মারা যাচ্ছি, তাহলে আমি ঠিকই বেঁচে থাকব। আমার নিকট আত্মীয়ের মধ্যে কেউ মারা যাবে।

মতিন বলল, আমার পায়ের লিগামেন্ট ফিগামেন্ট ছিঁড়ে একাকার, আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুশি। মুখভর্তি হাসি।

সালেহা বললেন, অবশ্যই আমি খুশি। এই অবস্থায় তোকে আমি ছাড়ব না। এখানে রেখে দেব। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারবি না।

সর্বনাশ! তোমার এই দুই রুমের বাড়িতে আমি ঘুমাব কোথায়?

তুই ঘুমাবি তৌহিদার ঘরে।

বিয়ের আগেই তার সঙ্গে ঘুমানো কি ঠিক হবে?

তৌহিদা এই কথায় এতই আনন্দ পেল যে, হাসির দমকে তার শরীর ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। সালেহা ভাইকে ধমক দিলেন ফাজলামি কথা আমার সঙ্গে বলবি না। আমি তোর দুলাভাই না। তুই তৌহিদার ঘরে ঘুমাবি, তৌহিদা থাকবে আমার সাথে। আর তোর দুলাভাই ড্রয়িংরুমের সোফায় ঘুমাবে। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুমাতে পারে।

মতিন বলল, তাহলে তো সব সমস্যারই সমাধান। আমার ক্ষিধে লেগেছে। রান্নাবান্নার আয়োজন কর।

সালেহা বললেন, দুনিয়ার বাজার এনেছিস। রাঁধতে সময় লাগবে। আচ্ছা, তুই তিনটা গলদা চিংড়ি কোন হিসাবে কিনলি?

তোমাদের হিসাবে কিনেছি। দুলাভাইয়ের জন্যে একটা, তোমার জন্যে একটা, আর তৌ-এর জন্যে একটা। আমি গলদা চিংড়ি খাই না। হাই কলেস্টরেল।

তৌ ফৌ ডাকবি না। শুনতে জঘন্য লাগে। তৌহিদা, তুমি জোগাড়যন্ত্র করে দাও। আজ আমি রাঁধব।

মাতিন বলল, আপা, তুমি তো বাঁধতে পার না। সব নষ্ট করবে। তৌ রাঁধুক।

কথা বাড়াবি না। গোসলে যা। তোর গা দিয়ে ঘামের গন্ধ বের হচ্ছে।

মতিন বলল, মগভর্তি করে এককাপ চা দাও তো আপা। চা খেতে খেতে গোসল করব। শরীরের ভেতর ঢুকবে গরম চা, বাইরে ঠাণ্ডা পানি। ঠাণ্ডা গরমে মিলে সিরিয়াস রি-অ্যাকশন।

মতিন মগভর্তি চা নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। রান্নাঘরে তৌহিদা এবং সালেহা। সালেহা সকালবেলাতেই দাঁতের ব্যথা এবং পেটের ব্যথায় কুঁ কুঁ করছিলেন। এখন মহানন্দে

রান্নাবান্না করছেন। তৌহিদার সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু একটাই– মতিন।

আমার ভাইটার কীরকম পাগলা স্বভাব দেখেছিস? চা খেতে খেতে গোসল করবে। বিয়ের পর কী যে যন্ত্রণায় তুই পড়বি! তোর কলিজা ভাজা ভাজা করে দেবে। ঠিক বলছি না?

হুঁ।

ছোটবেলায় সে কিন্তু খুব শান্ত ছিল। যতই তার বয়স হচ্ছে ততই সে দুষ্ট প্রকৃতির হচ্ছে। তবে যত দুষ্টই হোক তার অন্তর দিঘির পানির মতো।

পরিষ্কার পানি, না ময়লা পানি?

তুইও দেখি মতিনের মতো কথা বলা শুরু করেছিস। ময়লা পানি কী জন্যে হবে? দিঘির টলটলা পানি।

তৌহিদা সালেহার কথায় বাধা দিয়ে হঠাৎ নিচু গলায় বলল, আপা, আমাদের বিয়েটা কবে হবে? বলেই লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল।

সালেহা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তৌহিদা মরমে মরে যাচ্ছে। এরকম একটা লজ্জার কথা সে কীভাবে বলে ফেলল? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? মনে হয় মাথা খারাপই হচ্ছে। মাথা খারাপ মানুষ দিনেদুপুরে চোখের সামনে অদ্ভুত জিনিস দেখে। সেও দেখে। কয়েকদিন আগে সে তার নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছিল। ঘুমাচ্ছিল না, জেগেই

ছিল। হঠাৎ শুনল মতিনের গলা। মতিন বিছানার পাশ থেকে বলছে মিস তৌ, অসময়ে ঘুমাচ্ছ কেন? সে চমকে পেছনে ফিরে দেখে মতিন চেয়ারে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। তৌহিদা ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে কিছু নেই। তৌহিদার ধারণা, সে কিছুদিনের মধ্যেই পুরোপুরি পাগল হয়ে যাব। পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াবে, কিংবা হাতে একটা লাঠি নিয়ে রিকশা কন্ট্রোল করবে। রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে ফুটপাতে শুয়ে থাকবে।

সালেহা বললেন, তৌহিদা, কী চিন্তা কর?

তৌহিদা নিচু গলায় বলল, কিছু চিন্তা করি না।

সালেহা বললেন, তোমার বিয়ের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। যথাসময়ে বিয়ে দেব। বিয়েতে খরচপাতিও করব। তোমার তিনকুলে কেউ নাই বলেই হাতে সুতা বেঁধে বিয়ে হবে তা না। একসেট গয়নাও দিব। তবে একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত!

তোমাদের একটা সন্তান আমাকে দিয়ে দিবে। আমি পালব। সে আমাকে মা ডাকবে। তোমাকে না।

তৌহিদা গাঢ় স্বরে বলল, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

মতিন নিজের গায়ে পানি ঢালার আগে ক্র্যাচ দুটা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিল। একটা ক্রাচে দাগ পড়ে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ চেষ্টা করল দাগ উঠানোর।

সামান্য কিছু সময় ক্র্যাচের সঙ্গে কাটানোর জন্যেই কি মতিনের ক্র্যাচ দুটির প্রতি এত মায়া জন্মেছে? মানুষের মায়া শুধু যে মানুষের এবং জীবজন্তুর দিকেই প্রবাহিত হয় তা-না, জড়বস্তুর দিকে প্রবাহিত হয়। মতিন ঠিক করে ফেলেছে

ক্র্যাচের আত্মকাহিনী নামের একটা লেখা লিখবে। স্যাটায়ার টাইপ লেখা–

আমি কে? কী আমার পরিচয়? আমি একটা ক্র্যাচ। মানুষের বগলে ঘামের দুর্গন্ধে আমার দিন কাটে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন–আমার এই দেহখানি তুলে ধর। তখন কি তার মনের কোথাও ক্র্যাচ নামক বস্তুটি ছিল? তিনি কাকে দেহখানি তুলে ধরার গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন–ক্র্যাচকে?

বাথরুমের দরজায় টুকটুক করে টোকা পড়ছে। মতিন বলল, কে?

আমি তৌহিদা।

কী চাও মিস তৌ?

আপনার কি আরো চা লাগবে?

তুমি চা নিয়ে এসেছ?

হুঁ।

ভেরি গুড। তুমি একজন পঙ্গু মানুষের দোয়া পেয়ে গেলে। তুমি বড়ই ভাগ্যবতী মেয়ে।

তৌহিদার চোখে আবারো পানি এসে যাচ্ছে। সে অবশ্যই ভাগ্যবতী। শুধু ভাগ্যবতী না, অসীম ভাগ্যবতী। অসীম ভাগ্যের কারণেই এমন একজনের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে।

অনেকক্ষণ হলো তৌহিদা বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার উচিত সালেহা আপাকে রান্নায় সাহায্য করা। কিন্তু সে এখান থেকে নড়তে পারছে না।

এত পদ রান্না হয়েছে, মতিন কিছুই খেল না। তার না-কি ক্ষুধা মরে গেছে। সালেহা বিরক্ত হয়ে বললেন, ক্ষুধা কেন মরে যাবে? মতিন বলল, ক্ষুধা হচ্ছে। একটা প্রাণীর মতো। তার জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে। ক্ষুধা শৈশব থেকে যখন যৌবনে আসে তখন তার বিয়ে হয়, বাচ্চাকাচ্চাও হয়। তখনই ক্ষুধা প্রচণ্ড হয়। এখন বুঝেছ?

সালেহা বললেন, না।

না বুঝলে কিছু করার নাই। আমি উঠলাম এবং চললাম।

মতিন ক্র্যাচ ফেলে হেঁটে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তৌহিদা এবং সালেহা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। যে মানুষটা ক্র্যাচে ভর না দিয়ে এক পা ফেলতে পারছিল না সে কেমন গটগট করে দরজা খুলে চলে গেল।

বিকাল পাঁচটা। আজিজ সাহেব ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছেন। কথা ছিল নিশু তার জন্যে খাবার নিয়ে আসবে। নিশু আসে নি। হয়তো ভুলে গেছে। আজিজ আহমেদের পায়ের ব্যথা বেড়েছে। পা ফুলে উঠেছে।

৫. কমল তার বাবার পাশে বসে আছে

কমল তার বাবার পাশে বসে আছে। কাছাকাছি বসেছে। সালেহ ইমরান ইচ্ছা। করলেই ছেলের গায়ে হাত রাখতে পারেন। তবে এই কাজ তিনি কখনো করবেন না। Autistic শিশুরা গায়ে হাত রাখা খুব অপছন্দ করে। তারা নিজেরা অন্যদের গায়ে হাত রাখে না। অন্যদেরও তাদের গায়ে হাত দিতে দেয় না। শরীরে হাত দেয়াকে তারা মনে করে তাদের নিজস্ব ভুবনে আক্রমণ।

কমলের দৃষ্টি স্থির এবং কিছুটা বিষণ্ণ। সে তাকিয়ে আছে টিভি স্ক্রিনের দিকে। আজ মুভি নাইট। সব ঠিক করা আছে। এখনই ছবি শুরু হবে। রিমোট কন্ট্রোল সালেহ ইমরানের হাতে। ছবির নাম The Ninth Gate. রোমান পলনস্কির ছবি। সালেহ ইমরান ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। ভূত প্রেতের ছবি হলে কমলের সমস্যা হবে। সে লজিক দিয়ে যখন কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না তখনই অস্থির বোধ করে। সালেহ ইমরান ছবি শুরু করার আগে সবসময় কিছুক্ষণ ছেলের সঙ্গে কথা বলেন। কথা বলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

হ্যালো কমল!

হ্যালো।

আমি কি অল্প কিছু সময়ের জন্যে তোমার পিঠে হাত রাখতে পারি?

No.

সন্তানের পিঠে হাত রেখে কথা বলা একজন পিতার জন্যে খুবই আনন্দের ব্যাপার।

আনন্দের ব্যাপার কেন?

পৃথিবীর সব বাবাই সন্তানের প্রতি তার স্নেহ দেখাতে চান। সন্তানকে স্পর্শ করা স্নেহ প্রদর্শনের অংশ।

তুমি আমার পিঠে হাত রেখে স্নেহ দেখাবে। কাকে দেখাবে? এখানে। আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। কে দেখবে?

আমরা দেখব।

আমরা দুজন তো স্নেহের ব্যাপারটা জানি। আমাদের আবার জানানোর দরকার কী?

তুমি যখন কাউকে ভালোবাস তখন শুধু একবার I love you বলো না। বারবার বলো। একবার বললেই তো হয়। বারবার বলো কেন?

কমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, LOVE শব্দটা চব্বিশভাবে বলা। যায়।

সালেহ ইমরান বললেন, চব্বিশভাবে মানে? বুঝতে পারছি না।

কাগজে লিখলে বুঝতে পারবে।

কাগজে লিখে আমাকে দেখাও।

সালেহ ইমরান কাগজ এনে দিলেন। কমল অতি দ্রুত লিখতে লাগল। LOVE LVOE LEOV OLVE OVLE OVEL...

সালেহ ইমরান বললেন, আর লিখতে হবে না, বুঝতে পারছি।

কমল বলল, SORRY শব্দটা ষাটভাবে লেখা যায়। তবে আমি একজনকে উনষাটভাবে বলেছি।

ষাটভাবে বলো নি কেন?

আমার ইচ্ছা।

সেই একজনের নাম কি মতিন?

হ্যাঁ। সে মনে হয় আমার SORRY বুঝতে পারে নি।

বুঝতে পেরেছে। আমাকে বলে গেছে।

সে আর আসবে না?

না।

কমল চুপ করে গেল। সে এতক্ষণ বাবার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল, এখন তাকালো টিভি স্ক্রিনের দিকে। সালেহ ইমরান স্বস্তি বোধ করলেন। ছেলের মাথা থেকে মতিনের অংশ দূর হয়েছে। এখন ছবির দিকে মন দেয়া যায়। পুত্রের সঙ্গে ছবি দেখার এই অংশটি তার জন্যে অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তারপরেও প্রতি সপ্তাহে এই কাজটা তাঁকে করতে হয়।

সালেহ ইমরান বললেন, ছবি কি শুরু করব?

কমল বলল, মা দেখবে না?

না। সে একটা কাজে গিয়েছে।

মা কাজে যায় নি। মা ঘরে আছে। তুমি মিথ্যা কথা বলেছ।

আমি বলতে চেয়েছি সে কোনো একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত।

মা কোনো জরুরি কাজে ব্যস্ত না। মা ম্যাগাজিন পড়ছে। ম্যাগাজিনের নাম–News Week..

News Week পড়াটাই হয়তো তার জন্যে এই মুহূর্তে ছবি দেখার চেয়ে জরুরী।

কমল বাবার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, মা ছবি দেখতে পছন্দ করে না, এই জন্যে ছবি দেখে না।

সালেহ ইমরান বললেন, হতে পারে।

কমল বলল, তুমিও ছবি দেখতে পছন্দ কর না।

সালেহ ইমরান বললেন, পুরোপুরি ঠিক না হলেও কথাটা আংশিক সত্য।

আংশিক সত্য কথাটার মানে কী?

আংশিক সত্য মানে কিছুটা সত্য।

সেটা কীভাবে হবে? একটা সংখ্যার কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা হবে না। পাঁচ একটা সংখ্যা। পাঁচের কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা হবে? পাঁচের চার পর্যন্ত সত্য এক মিথ্যা তা হবে না।

মানুষের কথা এবং অংকের সংখ্যা এক না।

কমল কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেল। শীতল গলায় বলল, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কার সঙ্গে কথা বলতে চাও?

মতিন।

কমল শোন, তুমি চাইলেই সবকিছু হবে না। এখন তুমি যদি আকাশের চাঁদ হাতে নিয়ে দেখতে চাও তুমি কি পারবে? তোমাকে দেখতে হবে খালি চোখে। কিংবা দূরবিন দিয়ে।

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মতিন চলে গেছে। সে কোথায় গেছে আমি জানি না।

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

তুমি চাইলেই তো সবকিছু হবে না। তাকেও চাইতে হবে।

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সালেহ ইমরান শান্ত গলায় বললেন, কমল, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমার মাথায় লজিক আছে। লজিক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর যে, চাইলেই সবকিছু হয় না।

কমল চাপা গলায় বলতেই থাকল, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কমল, ডিয়ার সান প্লিজ। প্লিজ স্টপ। আই বেগ ইউ।

কমল চুপ করে গেল। সালেহ ইমরান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আর দেরি না করে ছবিটা শুরু করা দরকার। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা, ছবি শুরু করি?

কমল বলল, বাবা, আমি একটা ভুল করেছি।

সালেহ ইমরান বিস্মিত হয়ে বললেন, কী ভুল?

বড় ভুল।

বলো শুনি কী ভুল?

আমি বলেছিলাম একটা সংখ্যার কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা হয় না। আসলে হয়।

সালেহ ইমরান বললেন, কমল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

কমল বলল, ৮ একটা সংখ্যা। আটের কিছুটা সত্য, কিছুটা মিথ্যা হতে পারে।

এখনো বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলো।

কমল কাগজে লিখল–

৮ = ২ X (২ √-১) X (২ √-১)

লেখা শেষ করে বাবার দিকে কাগজ উঁচু করে ধরে বলল, এখানে ২ সত্য কিন্তু (২ √-১) মিথ্যা। আট সত্য, কিন্তু আটের তিনটা অংশের মধ্যে দুটা অংশ মিথ্যা।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি না। অঙ্ক আমার বিষয় না।

এটা সহজ অঙ্ক।

তোমার কাছে হয়তো সহজ, আমার কাছে না।

কমল বলল, আমি যে ভুল কথা বলেছিলাম এটা কি বুঝতে পারছ?

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি যখন বলছ ভুল তখন নিশ্চয়ই ভুল, তবে আমি এখনো বুঝতে পারছি না। এইসব জটিল বিষয় থাকুক, এসো ছবি দেখি।

কমল বলল, আমি উনার সঙ্গে ছবি দেখব।

কার সঙ্গে?

উনার নাম মতিন।

কমল, বাবা শোন, তোমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছি এটা সম্ভব না। তুমি অঙ্ক বুঝতে পার, যুক্তি বুঝবে না কেন?

আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। সঙ্গে কথা বলতে চাই। কথা বলতে চাই। বলতে চাই। চাই।

কমল কমল। প্লিজ বেবি, প্লিজ।

কমলের মুখ লাল, চোখ রক্তবর্ণ। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অতি দ্রুত। শরীর ঘামছে। সে তার হাতের মুঠি বন্ধ করছে খুলছে। এক্ষুনি তার অ্যাপিলেপটিক সিজারের মতো হবে। তখন তার জিভে কামড় পড়তে পারে। সালেহ ইমরানের উচিত এই মুহূর্তে কমলের দুই দাঁতের ফাঁকে কঠিন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া।

কমল কথা উল্টো করে বলা শুরু করল। তার গলার স্বর হয়েছে তীব্র সাপের শিসের মতো। উল্টো করে বলায় মনে হচ্ছে সে ভিনগ্রহের কোনো প্রাণীদের অচেনা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছে–

ইচা তেলব থাক ঙ্গেস রতা মিআ। ইচা তেলব থাক ঙ্গেস রতা মিআ। ইচা তেলব থাক ঙ্গেস রতা মিআ...

সালেহ ইমরান ছেলের পিঠে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যাপিলেপটিক সিজার হলো। তিনি চাপা গলায় বলতে থাকলেন, Oh god! Oh god! Oh god!

মতিন শোবার আয়োজন করছে। আয়োজন ব্যাপক। সে প্রথমে বিছানায় একটা শীতলপাটি বিছায়। ভেজা গামছায় শীতলপাটি মোছা হয়। জানালা খুলে সিলিং ফ্যান ছাড়ে। ফ্যানের বাতাসে শীতলপাটি ঠাণ্ডা হবার পর সে খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দিনের শেষ সিগারেটটা খায়। সিগারেট শেষ হবার পর হাই উঠার জন্য অপেক্ষা করে। সে হাই না উঠা পর্যন্ত বিছানায় যায় না।

আজ সে তার দিনের শেষ সিগারেটটা ধরিয়েছে। সিগারেট শেষ হবার আগেই হাই উঠে গেছে। সে ইচ্ছা করলেই আধখাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে বিছানায় চলে যেতে পারে। এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। সাবধানী ভদ্র টোকা। নিশ্চয়ই বাইরের কেউ। মেসের লোকজন দরজায় টোকা দেয় না। ধাক্কা দেয়।

মতিন দরজা খুলল। দরজার ওপাশে বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা বললেন, আপনি কি আমাকে চিনেছেন?

মতিন বলল, চিনেছি। আপনার নাম আহমেদ ফারুক। আপনি ব্যারিস্টার সালেহ ইমরান সাহেবের জুনিয়র। আপনি আমাকে একটা মার্লবরো লাইট সিগারেট দিয়েছিলেন এবং পল্লবীতে আমার বোনের বাসায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। সেদিনও আপনার গায়ে হাফ হাওয়াই সার্ট ছিল। সার্টের রঙ ছিল হালকা নীল। তবে সেদিন আপনার হাতে সোনালি বেল্টের ঘড়ি ছিল। আজকের ঘড়ির বেল্ট চামড়ার। আপনার কি অনেকগুলি রিস্টওয়াচ?

আহমেদ ফারুক বললেন, আপনার স্মৃতিশক্তি অসম্ভব ভালো। আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

মতিন বলল, না। আমি ঘুমাবার জন্যে তৈরি। এখন বিছানায় যাব। আপনার যা বলার দরজা থেকে বলুন এবং সংক্ষেপে বলুন।

কমলের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে এসেছিলাম। সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে।

মতিন বলল, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে বলেই রাত এগারোটায় তার কাছে ছুটে যাব এরকম মনে করছেন কেন? সে কৃষ্ণ না যে কৃষ্ণের বাঁশি বেজেছে আমি শ্রী রাধিকা ছুটে যাচ্ছি।

ছেলেটা অসুস্থ।

তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। আমি ডাক্তার না।

তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। অ্যাপিলেপটিক সিজার হয়েছিল। সেই সময় জিভ কেটে যায়। জিভ সেলাই করা হয়েছে।

তাহলে চিকিৎসা তো হয়েছেই। এখন ডাক্তারদের বলুন কড়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

তাকে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। সে ঘুমাচ্ছে না। আপনাকে চাচ্ছে। এই ধরনের শিশুদের মাথায় কিছু ঢুকে গেলে সহজে দূর হয় না। প্লিজ, আপনি একটু আসুন।

মতিন বলল, দরবার করে লাভ হবে না ভাই, আমি যাব না। কেন যাব না। তার পেছনেও আমার শক্ত যুক্তি আছে। যুক্তিটা শুনবেন?

বলুন শুনি।

আজ যদি তার কাছে যাই তাহলে কয়েকদিন পর আবার সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইবে। আবার তার কাছে ছুটে যেতে হবে। তারপর আবার। তারপর আবার। আমাকে থাকতে হবে ধারাবাহিক আসা-যাওয়ার মধ্যে। যুক্তি কি মানছেন?

মানছি।

তাইলে বিদায়। গুড নাইট। শুভ রাত্রি।

আহমেদ ফারুক হতাশ গলায় বললেন, আপনি কি দুই মিনিটের জন্যে রাস্তায় আসবেন?

মতিন বিস্মিত গলায় বলল, কেন?

আহমেদ ফারুক বলেন, গাড়িতে ম্যাডাম বসে আছেন, উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

ম্যাডাম মানে কি কমলের মা? মিসেস মুনা?

জি।

শুরুতে এই কথাটা না বলে এতক্ষণ ভ্যাজর ভ্যাজর করলেন কেন?

সরি।

মতিন বিরক্ত মুখে পাঞ্জাবি গায়ে দিল। তার পরনে লুঙ্গি। তার উচিত লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরা। সে তা করল না। প্যান্ট পরা থাকলে এই মহিলা বলে বসতে পারেন–গাড়িতে উঠুন। সেই সুযোগ মতিন এই মহিলাকে দিতে রাজি না। ক্ষমতাধররা সবসময় অন্যদের তুচ্ছ করবে তা হয় না।

গাড়ির কাচ উঠানো। ভেতরে এসি চলছে। মুনা পেছনের সিটে গা এলিয়ে পড়ে ছিলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মতিন এসে জানালার পাশে দাঁড়াতেই চোখ খুললেন। গাড়ির দরজা খুলে বললেন, উঠে আসুন।

মতিন বলল, গাড়িতে উঠব?

মুনা বললেন, জি। আমি আমার ছেলেকে কথা দিয়েছি আপনাকে নিয়ে যাব। আমি কাউকে কথা দিলে কথা রাখি।

মতিন বলল, আমি কিন্তু কাউকে কোনো কথা দেই নি।

মুনা বললেন, প্লিজ। প্লিজ।

মতিন বলল, লুঙ্গি বদলে আসি।

মুনা বললেন, লুঙ্গি বদলাতে হবে না। আপনাকে লুঙ্গিতে মানিয়েছে!

ঢাকা শহরের অনেক উন্নতি হয়েছে! সুন্দর সুন্দর দালান। রাস্তার দুপাশে শোভাবর্ধক গাছপালা, ফুলের বাগান। বিদেশী ছবির মতো হাইওয়ে পেট্রল কার। কালো কুকুর হাতে কালো পোশাকের র‍্যাব। শত শত ফাস্ট ফুডের দোকান। ঢাকা শহরবাসী এখন আর নতুন কিছু দেখলে ভড়কায় না। কিন্তু মতিন গুলশান এলাকার এই ক্লিনিক দেখে ভড়কাচ্ছে। ফাইভ স্টার হোটেলের ভাবভঙ্গি। রিসিপশনে পানির ফোয়ারা। ফোয়ারায় লাল-নীল মাছ। দুজন রিসিপশনিস্ট সেজেগুজে বসা। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে। দুজনের মুখেই ফাইভ স্টার হোটেলের রিসিপশনিস্টদের মতো ঝকঝকে নকল হাসি।

মতিনকে দেখে রিসিপশনিস্ট দুজনই ভুরু কুঁচকে ফেলল। মতিনের ধারণা হলো, তার আগে কেউ লুঙ্গি পরে রিসিপশন রুমের মার্বেল পাথরের মেঝেতে দাঁড়ায় নি। তবে

রিসিপশনিস্টরা কিছু বলল না। আহমেদ ফারুক তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। মিসেস মুনা বললেন, আসুন আগে এককাপ কফি খাই।

মতিন বলল, আমি কফি কম খাই।

মুনা বললেন, আপনি কমলের বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তারপর কমলকে দেখতে যাবেন। কফি খাওয়ার কথা এইজন্যেই বলেছি। কফিশপ দোতলায়, আসুন হেঁটে উঠি। আমার লিফট ফোবিয়া আছে।

মতিন বলল, লুঙ্গি পরে এইসব জায়গায় হাঁটাহাঁটি করা খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার।

মুনা বললেন, নেংটি পরে মহাত্মা গান্ধী যদি ইউরোপ ঘুরে আসতে পারেন তাহলে আপনার সমস্যা কী?

মতিন বলল, আমি মহাত্মা গান্ধী না। এটাই আমার সমস্যা। দেখুন সবাই তাকাচ্ছে।

মুনা বললেন, আপনার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। তাকাচ্ছে আমার দিকে। রূপবতী কোনো মেয়ে যদি কোনো ছেলের সঙ্গে হাঁটে তখন লোকজন মেয়েটিকেই দেখে। ছেলের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে না।

কফিশপটা খালি। এক কোনায় সালেহ ইমরান সাহেব বসে আছেন। তার হাতে টাইম পত্রিকা। তিনি বেশ মনোযোগ দিয়েই পত্রিকা পড়ছিলেন। মতিনকে দেখে পত্রিকা বন্ধ করলেন। মুনা বললেন, আমার দায়িত্ব শেষ, আমি এখন চলে যাব।

সূচিপত্র

সালেহ ইমরান বললেন, কোথায় যাবে?

বাড়িতে যাব। ঘুমাবার চেষ্টা করব। আমার মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়েছে।

কমলের পাশের কেবিনে ইচ্ছা করলে থাকতে পার।

মুনা বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি ভালো করেই জানো আমি হাসপাতালে থাকি না।

বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে থাকতে হয়।

তেমন বিশেষ প্রয়োজন এখন তৈরি হয় নি।

ঠিক আছে যাও।

মুনা চলে যাচ্ছেন। সালেহ ইমরান সিগারেট ধরিয়েছেন। মতিন বেশ আগ্রহ নিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ভদ্রলোক তার স্ত্রীর উপর খুব বিরক্ত হয়েছেন। বিরক্ত মানুষের মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। এই ভদ্রলোকের তাই হয়েছে। তিনি সিগারেট টেনে টেনে মুখের চামড়া নরম করার চেষ্টা করছেন। কাজটা তেমন সহজ হচ্ছে না। কফিশপে বেশ বড় বড় করে লেখা No Smoking. তারপরেও কফিশপের কর্মচারীরা কিছু বলছে না। এটাও মতিনকে বিস্মিত করছে।

সালেহ ইমরান মতিনের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, Have a smoke. তোমাকে কমলের কেবিনে নিয়ে যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা দরকার।

মতিন বলল, স্যার, জায়গাটা নো স্মোকিং।

সালেহ ইমরান বললেন, কফিশপে নো স্মোকিং সাইন থাকা ঠিক না। স্মোকাররা চা-কফির সঙ্গে সিগারেট খেতে পছন্দ করে। এদের উচিত ছিল আলাদা একটা স্মোকিং কর্নার করা। যাই হোক, তুমি সিগারেট ধরাও, কেউ কিছু বলবে না।

মতিন বলল, কেন কেউ কিছু বলবে না?

সালেহ ইমরান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কেউ কিছু বলবে না, কারণ এই ক্লিনিকটার মালিক মুনা।

মতিন সিগারেট ধরাল। সে লক্ষ করল, সালেহ ইমরান সাহেবের মুখের চামড়া আগের মতো হয়েছে। দৃষ্টির সেই কাঠিন্যও নেই। তিনি মতিনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এলেন।

মতিন।

জি স্যার।

তুমি এসেছ আমি খুবই খুশি হয়েছি। থ্যাংকস। এখন তুমি কমল বিষয়ে দুএকটা কথা শুনে নাও। আগেও হয়তো বলেছি, আবারো বলি।

বলুন।

অ্যাপিলেপটিক সিজার কী তুমি নিশ্চয়ই জানো? জানো না?

জি-না।

মৃগী রোগী কখনো দেখ নি?

আমার পরিচিত কারোর মৃগী রোগ নেই, তবে রাস্তায় মৃগী রোগী পড়ে থাকতে দেখেছি। তারা ছটফট করছে, লোকজন চেষ্টা করছে জুতো শোঁকানোর। পুরনো জুতোর গন্ধে নাকি রোগের আরাম হয়।

মৃগী রোগের অনেক লোকজ চিকিৎসা প্রচলিত আছে। কোনোটাই অবশ্য কাজ করে না। যা হবার তাই হয়। তখন মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক কারেন্টের একটা ঝড় বয়ে যায়। এই ঝড় অতি অল্প সময়ের জন্যেই হয়, কিন্তু রোগীকে চরম অবসন্নতায় ফেলে দিয়ে যায়। কমল এখন আছে এই অবস্থায়। এখন তাকে কিছুতেই উত্তেজিত করা যাবে না।

আমাকে কী করতে হবে সেটা বলে দিন।

আমি তো তাও জানি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। সে তোমার জন্যে অতি ব্যস্ত হয়ে আছে। সে কী করবে বা করবে না সেটা সে জানে। তুমি শুধু একটা জিনিস করবে না– তার গায়ে হাত দেবে না। এই ধরনের শিশুরা নিজ ভুবনে থাকে। গায়ে হাত দেয়াটাকে তারা মনে করে তাদের ভুবনে অনুপ্রবেশ। বুঝতে পারছ?

পারছি।

কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করছি। ভুবন, অনুপ্রবেশ। আমি নিজেও ক্লান্ত। ঠিক আছে, তুমি যাও দেখা করে এসো। তোমার জন্য গাড়ি রাখা আছে। তোমাকে তোমার মেসে নামিয়ে দেবে।

কমলের ঘরে আমি একা যাব?

হ্যাঁ একা যাবে। কেবিন নম্বর ১০১ and thank you again for coming. ভালো কথা বলতে ভুলে গেছি–তুমি ওর বিছানায় খবরদার বসবে না। তুমি বসবে চেয়ারে।

কমল দেয়ালের দিকে মুখ দিয়ে শুয়ে আছে। স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে। তাকে স্যালাইন দেয়া হয়েছে। তার ঠোঁটে সেলাই করা হয়েছে। তার জিভও কেটেছে, জিভেও সেলাই করেছে। হাসপাতালের কেবিনে প্রচুর আলো থাকে। এই কেবিনে আলো কম। ঘরটা সাজানো হয়েছে হোটেলের কায়দায়। দেয়ালে পেইন্টিং আছে। বটগাছের ছায়ায় একদল গরু ঘাস খাচ্ছে। আকাশে কাক উড়ছে। পেইন্টিং তেমন সুন্দর না। মনে হয় আনাড়ি হাতের কাজ।

কমলের গায়ে হাসপাতালের পোশাক। অ্যাশ কালারের পায়জামা-পাঞ্জাবি। বিছানার চাদরটা ছাই রঙের। দরজায় পা দিয়ে মতিনের মনে হলো, ছাই রঙ পানির একটি দিঘিতে শুভ্র পদ্ম ফুটে আছে। এত সুন্দর হয় শিশুদের মুখ!

মতিন বলল, হ্যালো!

কমল পাশ ফিরে হাসল। ঠোঁটে সেলাই নিয়ে হাসা কষ্টকর, তবুও সে হাসছে।

শুনলাম তুমি আমাকে কিছু বলার জন্যে ডেকেছ। সেটা কী?

রিস তেলব ইচা।

আমার সঙ্গে উল্টো করে কথা না বললে হয় না? আমি তোমার মতো বুদ্ধিমান না। উল্টো কথা সোজা করতে আমার কষ্ট হয়। ঠিক আছে চেষ্টা করি। রিস হলে সরি, তেলব হলো বলতে, ইচা হলো চাই। তার মানে হলো সরি বলতে চাই। ঠিক আছে?

কমল বলল, রিস।

মতিন বলল, সরি বলা তো হয়েছে। এখন কি চলে যাব?

কমল বলল, না।

মতিন বলল, না-টা উল্টো করে বলছ না কেন? নার উল্টো হয় না?

কমল বলল, হয়। না হলো–আ-না।

মতিন বলল, রমাকান্তকামার-এর উল্টো কী?

কমল বলল, রমাকান্তকামার উল্টো করলে রমাকান্তকামার হয়। এটা কি কোনো ট্রিক?

হ্যাঁ ট্রিক।

আমি ট্রিক পছন্দ করি না। যারা ট্রিক করে তাদেরকেও আমি পছন্দ করি

মতিন বলল, আমি ট্রিক পছন্দ করি। যারা ট্রিক করে তাদের পছন্দ করি। তুমি ট্রিক পছন্দ কর না, কাজেই আমি তোমাকে পছন্দ করি না।

কমল বলল, তুমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন? কাছে আস।

মতিন বলল, না। তুমি আমাকে পছন্দ কর না, এইজন্যে কাছে আসতে চাও না?

মতিন বলল, এইজন্যে না। আমি অনেককেই পছন্দ করি না, তারপরও তাদের কাছে যাই। তোমার কাছে যাচ্ছি না, কারণ তোমার কাছে গেলে আমার বসতে ইচ্ছা করবে। বিছানায় বসতে ইচ্ছা করবে। আমি সেটা করতে পারব না। কারণ তুমি তোমার বিছানায় কাউকে বসতে দাও না।

চেয়ারে বসবে।

প্লাস্টিকের শক্ত চেয়ারে আমি বসতে পারি না।

ঠিক আছে এসো। বিছানায় বসো।

শুধু বিছানায় বসলেই আমার চলবে না। যার সঙ্গে আমি কথা বলব তাকে মাঝে মধ্যে আমাকে ছুঁয়ে দেখতে হবে।

কমল বলল, কেন?

এটা আমার অভ্যাস। একেকজন মানুষের একেক রকম অভ্যাস থাকে।

কমল বলল, তুমি কি ট্রিক করছ? ট্রিক করে আমার বিছানায় বসেছ? এখন ট্রিক করে গায়ে হাত দেবে। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

আমি ট্রিক পছন্দ করি না। তুমি দুষ্টু লোক।

মতিন বলল, আমি ট্রিক করি, কিন্তু আমি দুষ্টু লোক না।

কমল বলল, তুমি কি অঙ্ক জানো?

মতিন বলল, না।

কমল বলল, যারা অঙ্ক জানে না তাদেরকে আমি পছন্দ করি না।

মতিন বলল, আমি তো তোমাকে বলি নি আমাকে পছন্দ কর। তুমি আমাকে পছন্দ করবে না, আমি তোমাকে পছন্দ করব না। মামলা ডিসমিস।

মামলা ডিসমিস মানে কী?

মতিন বলল, মামলা ডিসমিস মানে–এই বিষয়ে কথা শেষ।

কমল বলল, তুমি অঙ্ক পছন্দ কর না কেন?

মতিন বলল, অঙ্ক পছন্দ করি না, কারণ অংকে রস-কস বলে কিছু নেই। শুকনা কঠিন একটা বিষয়।

কমল বলল, অংকে অনেক মজা আছে।

কী মজা?

কমল আগ্রহের সঙ্গে বলল, আমার কেবিনের নাম্বার ১০১। এটা মজা না?

মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, কী মজা?

এটা একটা প্রাইম নাম্বার। এটার মাঝখানে আছে একটা শূন্য। এটার স্কয়ার করলে হয় ১০২০১, এটার মাঝখানে আছে দুটা শূন্য। এটাও প্রাইম নাম্বার। ১০১-কে কিউব করলে হয় ১০৩০৩০১। এখন মাঝখানে আছে তিনটা শূন্য। ১০১-এর ফোর পাওয়ার করলে হয় ১০৪০৬০৪০১। এখন মাঝখানে এসেছে। চারটা শূন্য। মজা না?

মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, মজাটা কী?

যতটা পাওয়ার হচ্ছে মাঝখানে ততটা শূন্য আসছে। মজা না?

এর মধ্যে আমি মজার কিছুই পেলাম না। বকবকানি বন্ধ কর।

কমল কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, এরকম করে কথা বলছ কেন?

মতিন বলল, আমার ইচ্ছা। আমি আমার ইচ্ছামতো কাজ করি। এখন আমি তোমার হাত ধরে বসে থাকব। তুমি পছন্দ কর বা না কর কিছু আসে যায় না। তুমি চিৎকার করলে চিৎকার করবে। তোমার যদি অ্যাপিলেপটিক সিজার হয় হবে।

কমলের ঠোঁট কাঁপছে। মুখ ফ্যাকাশে। সে শুয়েছিল, এখন উঠে বসল। মতিন খপ করে কমলের হাত ধরে ফেলল। কমলের হাত থরথর করে কাঁপছে। তার চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সে যখন চিৎকার দিয়ে উঠতে যাবে তখন মতিন তার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কমল চাপা গলায় বলল, আপনি আর কখনো আসবেন না।

মতিন বলল, K.O., K.O., K.O.. [ok-এর উল্টো]

কমল বলল, I hate you.

মতিন বলল, Ko, Ko, Ko.

কমল বলল, আপনার গায়ে ঘামের গন্ধ।

মতিন বলল, তোমার গায়ে ওষুধের গন্ধ। ওষুধের গন্ধ ঘামের গন্ধের চেয়েও খারাপ।

মতিন ঘর থেকে বের হয়ে এলো! ক্লিনিকের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির পাশে আহমেদ ফারুক চিন্তিত মুখে হাঁটাহাঁটি করছেন। মতিনকে দেখে তিনি গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, কাজটা ভালো করেন নি।

মতিন বলল, কোন কাজটা ভালো করি নি?

আহমেদ ফারুক বললেন, স্যারের ছেলের সঙ্গে যে কাজটা করলেন।

মতিন বলল, আপনি জানলেন কীভাবে?

আহমেদ ফারুক বললেন, কমলের ঘরে CCTV লাগানো। সেখানে কী হয় হয় সবই টিভি ক্যামেরায় মনিটর করা হয়। আপনি যখন কথা বলছিলেন তখন টিভি মনিটরের সামনে স্যারের সঙ্গে আমিও ছিলাম।

মতিন বলল, Ko, Ko, Ko.

আহমেদ ফারুক বললেন, এর মানে কী?

মতিন বলল, মানে জানার দরকার নেই। সিগারেট থাকলে সিগারেট দিন। থাকলে কোনো একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে গাড়ি থামান। আমি সিগারেট কিনব। সিগারেটের জন্যে ফুসফুস ছটফট করছে। ভালো কথা, আমার সঙ্গে কিন্তু মানিব্যাগ নেই। সিগারেট কেনার টাকা আপনাকেই দিতে হবে।

আহমেদ ফারুক সিগারেটের প্যাকেট মতিনের দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে বললেন, প্যাকেটটা রেখে দিন। ইউ আর এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান।

মতিন বলল, আপনিও স্ট্রেঞ্জ ম্যান।

কোন অর্থে?

জল স্পর্শ না করার অর্থে।

পরিষ্কার করে বলুন, বুঝতে পারছি না।

মতিন বলল, গাড়ির দরজা খুলুন গাড়িতে উঠব। সিটে আরাম করে বসে আপনাকে বুঝিয়ে দেব জল স্পর্শ না করার মানে কী?

আহমেদ ফারুক গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, সিগারেট ফেলে গাড়িতে উঠুন।

মতিন সিগারেট ফেলে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ড্রাইভার চালাচ্ছে না, আহমেদ ফারুক চালাচ্ছেন। মতিনের উচিত ছিল ড্রাইভারের পাশের সিটে বসা। সে বসেছে পেছনে। নরম সিটে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকতে তার বেশ আরাম লাগছে। সে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। আহমেদ ফারুক সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি রাস্তার পাশে দাড় করিয়ে ফেলে কঠিন গলায় বললেন, আপনাকে আগেও বলেছি সিগারেট ফেলে গাড়িতে উঠুন। সিগারেট ফেলুন।

মতিন বলল, সিগারেট ফেলব না।

তাহলে গাড়ি থেকে নামুন।

মতিন বলল, আমি গাড়ি থেকে নামবও না।

আহমেদ ফারুক বললেন, অবশ্যই নামবেন।

মতিন বলল, অবশ্যই না। আপনি একা টানাটানি করে আমাকে গাড়ি থেকে নামাতেও পারবেন না। বেশি ঝামেলা করলে আমি কিন্তু গাড়িতে পেচ্ছাব করে দেব।

কী বললেন?

পিপি করে দেব। পিপি। গাড়ি গান্ধা করে দেব। আপনি সুবোধ বালকের মতো গাড়ি চালিয়ে আমাকে আমার মেসে নামিয়ে দেবেন। আমি এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে গাড়ি স্টার্ট দিতে হবে। এক, দুই, তিন, চার...

আহমেদ ফারুক গাড়ি স্টার্ট দিলেন।

৬. উজবেক মরমী কবি নদ্দিউ নতিম

আপনার নামই মতিন উদ্দিন?

জি।

উজবেক মরমী কবি নদ্দিউ নতিমের বিষয়ে প্রবন্ধগুলো আপনার লেখা?

জি।

আরো নতুন কিছু এনেছেন?

উনার মৃত্যুচিন্তা নিয়ে ছোট একটা প্রবন্ধ এনেছি। চার-পাঁচ স্লিপের মতো হবে।

একটু বসুন, হাতের কাজ সারি।

মতিনের সামনে ভোরের স্বদেশ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক আজহার উল্লাহ সাহেব বসে আছেন। তার পেছনে দেয়ালে কম্পিউটার কম্পোজ করে নোটিশ টানানো আছে। নোটিশে বড় বড় অক্ষরে লেখা–

অকারণে বসে থেকে
আমাকে বিরক্ত করবেন না।

সময়ের মূল্য আছে।

আজহার উল্লাহ সাহেবের বয়স ষাটের উপর। তার মাথার চুল আইনস্টাইনের মতো ঝাকড়া ও ধবধবে সাদা। তার হাত কাঁপা রোগ আছে। কলম হাতে নিলে তার হাত কাঁপে। কলম রেখে দিলে হাত কাঁপা বন্ধ হয়ে যায়। উনি কিছুক্ষণ পরপর কলম হাতে নিচ্ছেন এবং কলম টেবিলের উপর রেখে কাকলাসের মতো চেহারার একজনের সঙ্গে ঝগড়া করছেন। মতিন অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেও এই দুজনের কথাবার্তা আগ্রহ নিয়ে শুনছে। কাকলাসের মতো চেহারার লোকটির নাম মঞ্জু। আজহার উল্লাহ সাহেব তাকে ডাকছেন। মনঝু নামে এবং ঝুর উপর যথেষ্ট জোর দিচ্ছেন।

আজহার উল্লাহ বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে এই কবিতা তুমি স্ত্রী মনে করে মেকাপ করতে দিলে? সাহিত্য পাতাটা কে দেখে? আমি দেখি?–কি তুমি দেখ?

আপনি দেখেন। বড় সাহেব নোট লিখে দিয়েছেন, এই কবিতা যেন ছাপা হয়।

সবকিছুতে বড় সাহেব নাক গলালে তো চলবে না।

সেটা বড় সাহেবকে বলেন। আমাকে বলে লাভ কী?

মনঝু, তুমি গলা নামিয়ে কথা বলো। আমার সঙ্গে চিৎকার করবে না।

আমাকে দেখলেই তো আপনার রাগ উঠে। আমি চলে যাই। কবিতাটা অফ করে দেই।

যাও অফ করে দাও। আলতু-ফালতু জিনিস লিখে পাঠালেই ছাপতে হবে? কবিতার নাম কি–শ্রীকৃষ্ণ ডট কম। এর অর্থ কী?

আধুনিক কবিতার আধুনিক নাম।

নামের অর্থ তো থাকতে হবে। কবিতাটা পড়।

আপনি তো কবিতাই অফ করে দিচ্ছেন। পড়ার দরকার কী?

তোমাকে পড়তে বলছি পড়।

যত দোষ নন্দ ঘোষ শ্রীকৃষ্ণ পিতা
দুধ পড়ে ভিজে গেছে ভগবত গীতা।

আর পড়তে হবে না। স্টপ। কবিতা অফ। আমি যতদিন এই পত্রিকায় আছি ততদিন দুধ পড়ে ভিজে গেছে ভগবত গীতা ছাপা হবে না।

বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নেবেন? একটা টেলিফোন করেন। শেষে উনি হৈচৈ করবেন। আমাকে দুষবেন।

আর কথা নাই। কবিতা অফ করতে বলেছি অফ। ঐ জায়গায় অন্য কোনো ম্যাটার দিয়ে দাও। তুমি নিজেও আমার সামনে থেকে অফ হও। দরজা চাপিয়ে দিয়ে যাও, আমি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলব।

মতিন অন্যদিকে ফিরে ছিল, এখন আজহার উল্লাহর দিকে তাকাল। মানুষটাকে যথেষ্টই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। ভদ্রলোক দুপা তুলে উঁচু হয়ে চেয়ারে বসে আছেন। মতিন এর

আগে কাউকে এভাবে বসতে দেখে নি। এই গরমেও তিনি হলুদ রঙের মোটা চাদর গায়ে দিয়ে আছেন। গায়ের চাঁদরের অর্ধেকটা মাটিতে ঝুলছে। তিনি মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, চা খাবেন?

মতিন বলল, জি-না।

লেখাটা দিন।

মতিন লেখা দিল। তিনি লেখার উপর কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে লেখাটা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে ক্লান্ত গলায় বললেন, নদ্দিউ নতিম নামে কোনো উজবেক কবি নাই। আপনিই সেই উজবেক কিংবা উজবুক কবি। ঠিক না?

মতিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে শান্ত গলায় বলল, ঠিক।

আজহার উল্লাহ ক্লান্ত গলায় বললেন, লেখকরা সম্পাদকদের ধোঁকা দিতে পছন্দ করে। আপনি ধোঁকা দিয়েছে। থব ভালো না। লেখাটা যখন আমি ছাপালাম তখন কিন্তু আপনি পাঠকদের ধোঁকা দিলেন। কাজটা ঠিক হয়েছে?

ঠিক হয় নাই।

আমি বৃদ্ধ মানুষ, বাইরের সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান নাই। পড়াশোনার সুযোগ নাই, সময়ও নাই। যে কারণে আপনার ফাজলামি ধরতে পারি নাই। আপনার যুবা বয়স। আপনার

প্রবন্ধ পড়লে বোঝা যায় প্রচুর পড়াশোনাও আছে। আপনার মতো মানুষ এমন কাজ কেন করবে? লেখালেখি আপনার কাছে একটা। খেলা, তাই না?

জি।

আপনি কি পোলাপান যে আপনি খেলা খেলবেন? লেখালেখি নিয়ে খেলা?

মতিন চুপ করে রইল। আজহার উল্লাহ চেয়ার থেকে পা নামিয়ে হতাশ এবং বিষণ্ণ গলায় বললেন, (এইবার তুমি তুমি করে) আমি আমার মেয়ের কাছে তোমার লেখার প্রশংসা করেছি। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ফিজিক্স। সাহিত্য-টাহিত্য পছন্দ করে না। তাকে জোর করে পড়িয়েছি। তাকে বলেছি, দেখো মা, কী রকম পড়াশোনা জানা লোক।

আপনি কখন জানলেন যে, নদ্দিউ নতিম বলে কেউ নেই?

সেটা তোমার জানার প্রয়োজন নাই। তোমার আগের দুটি লেখার সম্মানির টাকাটা নিয়ে যাও।

টাকা লাগবে না।

অবশ্যই লাগবে। টাকার প্রয়োজন আছে। আমরা একটা প্রবন্ধের জন্যে মেক্সিমাম এক হাজার টাকা দেই। বিশেষ বিবেচনায় তোমার জন্যে পনেরশ টাকা করে বিল করেছিলাম। বিল পাশ হয়েছে, টাকা নিয়ে যাও।

নদ্দিউ নতিমের মৃত্যুচিন্তা লেখাটা কি ফেরত নিয়ে যাব?

আজহার উল্লাহ হাই তুলতে তুলতে বললেন, না। আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়। আবর্জনা পকেটে নিয়ে ঘুরতে হয় না।

আপনার টেবিলের ড্রয়ার তো ডাস্টবিন না।

যাবতীয় লেখা নামক আবর্জনা এই ড্রয়ারে রাখি, কাজেই ড্রয়ারটা ডাস্টবিন।

মতিনের পাঞ্জাবির পকেটে তিন হাজার টাকা। সবই একশ টাকার নোট। অনেকগুলি নোট। পকেট ভারি হয়ে আছে। টাকাগুলির জন্য মতিন এক ধরনের অস্বস্তিতে ভুগছে। তার মন বলছে, দ্রুত টাকাগুলির একটা ব্যবস্থা করে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এতে মন খানিকটা শান্ত হবে। মতিন ট্যাক্সি নিয়ে নিল। ঘণ্টা চুক্তিতে ট্যাক্সি। চারশ টাকা ঘণ্টা। তিন হাজার টাকায় সাত ঘণ্টা ট্যাক্সি তার সাথে থাকবে। খারাপ কী? সে রওনা হলো তার দুলাভাইয়ের ফার্মেসির দিকে। নিউ সালেহা ফার্মেসি।

নিউ সালেহা ফার্মেসির মালিক হাবিবুর রহমান ক্যাশিয়ারের চেয়ারে বসে আছেন। তার শরীর খারাপ। হঠাৎ করে প্রেসার বেড়েছে। নিচেরটা হয়েছে একশ পাঁচ। উপরেরটা দুশ। প্রেসারের ওষুধ কিছুক্ষণ আগে খেয়েছেন। ওষুধের অ্যাকশান এখনো শুরু হয় নি। ঘাড় ব্যথা করছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। তার উচিত চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা। শশায়ার ব্যবস্থা এখানে আছে। ফার্মেসির পেছনে সিঙ্গেল খাট পাতা। খাটে শীতলপাটি বিছানো। মাথার উপর সিলিং ফ্যানও আছে। হাবিবুর রহমানের দিনে শোয়ার অভ্যাস নেই

বলে শুতে যাচ্ছেন না। মনে মনে আল্লাহু শাফি এই বলে দোয়া পড়ছেন। জিগিরের মতো এই দোয়া পড়লে শরীরের রোগবালাইয়ের দ্রুত আরাম হয়।

মতিন বলল, দুলাভাই, কেমন আছেন?

হাবিবুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, ভালো না।

শরীর খারাপ না-কি?

হুঁ।

প্রেসার?

হুঁ।

আপনার ব্যবসার অবস্থা কী?

ভালো।

ব্যবসার অবস্থা ভালো হলে প্রেসার উঠল কেন?

রাতে ঘুম হয় না। তোমার বোন সারা রাত কোঁ কোঁ করে! একটু পর পর বাথরুমে যায়। মাথায় পানি ঢালে। বিছানায় যে স্থির হয়ে থাকবে তা-না, সারাক্ষণ নড়াচড়া।

অন্য ঘরে ঘুমালেই পারেন।

হাবিবুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, এটা কেমন কথা? বউ ফেলে অন্য ঘরে ঘুমাব কেন?

সারাদিন কাজে কর্মে থাকেন, রাতের ঘুমটা তো আপনার দরকার।

যত দরকারই হোক, বউ এক ঘরে আমি অন্য ঘরে, এটা কেমন কথা?

হাবিবুর রহমান হাত বাড়িয়ে চোখে এক কর্মচারীকে ইশারা করলেন। সে ব্লাড প্রেসারের যন্ত্রপাতি ফিট করতে লাগল। হাবিবুর রহমান বললেন, কোনো। কাজে এসেছ?

মতিন বলল, জি-না। বকবক করতে এসেছি।

চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছ?

না।

ব্যবসা-বাণিজ্য করবে? ব্যবসা-বাণিজ্য করলে ক্যাশ দিয়ে সাহায্য করতে পারি।

না। আপনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকুন তো দুলাভাই। আপনার প্রেসার মাপা হচ্ছে।

হাবিবুর রহমান চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবারে তাঁর প্রেসার নরমাল পাওয়া গেল। তিনি আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি এসে ভালোই করেছ। তোমার সঙ্গে অতি জরুরি কথা আছে।

বলুন শুনি।

ভেতরে চল। সবার সামনে এইসব কথা বলা ঠিক না। তৌহিদার বিবাহ নিয়ে কথা বলব। তার জন্য একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। ছেলে ব্যাংকে চাকরি করে। ম্যানেজার, ঝালকাঠিতে পোস্টিং।

মতিন বলল, তার বিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেন কেন? আমি তো তৌহিদার গার্জিয়ান না।

হাবিবুর রহমান জবাব না দিয়ে ফার্মেসির পেছনে রওনা হলেন। মতিন। গেল তার পেছনে পেছনে।

হাবিবুর রহমান খাটে পা তুলে বসেছেন। মতিন বসেছে তার সামনে। তবে মুখোমুখি বসা না। তাকে হাবিবুর রহমানের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে হচ্ছে।

মতিন, তুমি দুপুরের খাওয়া খেয়ে এসেছ?

না।

এখানে খাবে?

বললে খাব।

এখানে খাওয়ার দরকার নাই। বাসায় চলে যাও। আজ আমি নিজে বাজার করে দিয়ে এসেছি। ফ্রেশ মাছ আছে।

কী মাছ?

খইলশা মাছ, টাকি মাছ আর ছোট চিংড়ি। কচুর লতি দিয়ে চিংড়ি মাছ রাঁধতে বলেছি, টাকির ভর্তা করতে বলেছি। খইলশা মাছের বিষয়ে কিছু বলে আসি নাই। জানি না কীভাবে রাঁধবে।

খইলশা মাছের বিষয়ে ডিরেকশান দিতে ভুলে গেছেন কী জন্যে?

মনে ছিল না। এখন মনে হলো। একটা ভুলই হয়েছে। খইলশা মাছ পাতলা ঝোল দিয়ে রাঁধতে হয়, তাতে ধনিয়া পাতা দিতে হয়। যদি পোড়াপোড়া করে তাহলে আর মুখে দেয়া যাবে না।

টেলিফোন করে দেখেন বেঁধে ফেলেছে কি-না।

বাদ দাও।

মতিন বলল, বাদ দেবেন কেন? এটা তো একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শখ করে একটা মাছ কিনেছেন। রান্নার ত্রুটির জন্যে সেই মাছ যদি মুখে দিতে না পারেন সেটা খারাপ না?

হাবিবুর রহমান টেলিফোন করলেন। জানা গেল খইলশা মাছ ঝোল দিয়ে রান্না করা হয়েছে। ঝোলে ধনিয়া পাতাও দেয়া হয়েছে। হাবিবুর রহমান শঙ্কামুক্ত মানুষের তৃপ্তির হাসি হাসলেন।

মতিন বলল, এখন আপনার জরুরি কথাটা বলুন। তৌহিদার বিয়ে হচ্ছে ঝালকাঠির এক ছেলের সঙ্গে?

হাবিবুর রহমান বললেন, ঝালকাঠির ছেলে না। ছেলের বাড়ি নরসিংদী। পোস্টিং ঝালকাঠিতে। ছেলের এক খালু জিয়ার আমলে মন্ত্রী ছিলেন।

বিয়েটা কবে?

ভাদ্র মাসে বিয়ে হয় না, বিয়েটা হতে হবে শ্রাবণ মাসে। অর্থাৎ এই মাসে। জুলাই মাসে। আমরা একটা তারিখ ঠিক করেছি। ২৮ জুলাই। শুক্রবার। বাদ জুমা বিয়ে পড়ানো হবে।

ভালো তো। আমি উপস্থিত থাকব, কোনো সমস্যা নেই।

হাবিবুর রহমান বিরক্ত গলায় বললেন, সমস্যা নেই এটা কীভাবে বললে? তোমার আপা ঠিক করেছে তৌহিদার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিবে। তৌহিদার কানে সে কী মন্ত্র দিয়েছে

আল্লাপাক জানেন। আমি যদি এখন তৌহিদার গলায় পাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি তবু সে ঝালকাঠির ছেলেকে কবুল বলবে না।

এখন উপায়?

উপায় একটাই। বিয়ে ২৮ তারিখেই হবে। এবং তুমি বিয়ে করবে। আপত্তি আছে?

না, আপত্তি কী জন্যে!

হাবিবুর রহমান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার আপা এবং ঐ গাধি মেয়ে কী ভুল যে করতে যাচ্ছে তা তারা জানে না। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে। আমার দায়িত্ব বিয়ে করিয়ে দেয়া। আমি দিলাম। কাজি ডেকে আনব, পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহরে বিয়ে হবে। ঠিক আছে?

জি ঠিক আছে।

তোমার আপাকে জানিয়ে দেই যে ২৮ তারিখেই বিবাহ?

জানিয়ে দেন। আর ঐ ঝালকাঠির ছেলেকে পুরোপুরি No করে দেয়াও ঠিক হবে না। ও Standby থাকুক। কোনো কারণে যদি আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়...।

হাবিবুর রহমান তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, হবে না কেন? এই বিষয়ে তোমার কি কোনো Second thought আছে?

মতিন বলল, আমার কোনো Second thought নেই, তৌহিদার তো থাকতে পারে। শেষ মুহূর্তে সে যদি মনে করে, বেকার ছেলে বিয়ে না করে ব্যাংকার বিয়ে করা ভালো, তখন যেন হাতে Option থাকে।

এটা খারাপ বলো নাই।

মতিন বলল, দুলাভাই, আপনি কিছু মনে না করলে খাট থেকে নামুন। চক্ষণ ঘুমাব। শীতলপাটি দেখে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে। আমি আপনার এই ঘরটার একটা নাম দিলাম! ঘুম-ঘর।

ঘর অন্ধকার। মাথার উপর সিলিং ফ্যান। বাইরে মেঘলা দিন। বাতাস আর্দ্র ও শীতল। ঘুমুবার জন্যে আদর্শ ব্যবস্থা। মতিনের ঘুম আসছে না। সে এপাশ এপাশ করছে। সে অনেকবার লক্ষ করেছে, আয়োজন করে ঘুমাতে গেলেই তার ঘুম আসে না। তখন নদ্দিউ নতিম সাহেব ভর করেন। মাথার ভেতর এলোমেলো শব্দ নাচানাচি করে। এখন যেমন ঘুম-ঘর মাথায় ঘুরছে–

ঘুম-ঘরে শুয়ে আছি
ঘুম ঘুম চোখে–ডিঙ্গি বাই।
সিলিং-এ সিলিং ফ্যান ঘুম গান গায়–
শীতলপাটিটি ছিল ঘুমের নদীতে
আমার হৃদয়ে তবু কোনো নিদ্রা নাই–।।

অর্থহীন লাইন। এর হাত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়, কারো সঙ্গে কথা বলা। মুখোমুখি কথা না, টেলিফোনে কথা। মুখোমুখি কথা বলা পরিশ্রমের কাজ। তখন যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তার মুখের ভাব, চোখের ভাবের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। তার বডি ল্যাংগুয়েজ পরীক্ষা করতে হয়। সামনা সামনি কথা বলা মানে জটিল ভাইবা পরীক্ষা দেয়া। এরচে টেলিফোন নিরাপদ। কোনো এক পর্যায়ে কথাবার্তা যদি আর চালাতে ইচ্ছা না করে তাহলে লাইন কেটে দিলেই হলো। পরে দেখা হলে বলা, ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে চার্জার ছিল না। মোবাইল টেলিফোন আমাদের দ্রুত মিথ্যাবাদী বানাচ্ছে।

হ্যালো নিশু।

হুঁ।

কী করছ?

আমি কী করছি সেটা ইম্পোর্টেন্ট না। তুমি কী করছ?

আমি ঘুম-ঘরে শুয়ে আছি।

কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো। ঘুম-ঘর মানে কী?

আমার দুলাভাই তার ফার্মেসির পেছনে একটা ঘুম-ঘর বানিয়েছেন। অত্যন্ত আরামদায়ক ব্যবস্থা। ঘরে পা দিলেই ঘুম এসে যায় বলে আমি ঘরের নাম দিয়েছি ঘুম-ঘর।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

খুব ভালো। ঘুম-ঘরে শুয়ে ঘুমাও। যদি কখনো ঘুম ভাঙে বাবার সঙ্গে দেখা করো। বাবা কোনো একটা জরুরি বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

জরুরি বিষয়টা কী তুমি জানো?

জানি, কিন্তু বাবার কাছ থেকেই শোন।

ভালো কথা, তোমার বিয়ের পাত্র কি পাওয়া গেছে?

পাওয়া গেছে। যে-কোনো একদিন বিয়ে করে ফেলব। বাবা ধুমধাম করতে চাচ্ছেন। আমি বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি–ধুমধামে টাকা নষ্ট করা। অর্থহীন।

মানব সভ্যতা বিকাশের প্রধান কারণ কিন্তু অর্থহীন কর্মকাণ্ডের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ।

জ্ঞানের কোনো কথা তোমার কাছে শুনতে আমি রাজি না। তুমি জ্ঞানী না। তুমি মূর্খদের একজন।

মানলাম। ঘুম-ঘর নিয়ে কয়েক লাইন কবিতা লিখেছি–শুনবে?

না। আমি তোমার জন্যে কিছু কাগজপত্র জোগাড় করেছি। বাবার কাছে রাখা আছে। উনার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

কী কাগজপত্র?

তুমি Autistic children সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলে, সেই বিষয়ের কাগজপত্র।

আমি তোমার কাছে কোনো কাগজপত্র চাই নি। তারপরেও তোমাকে ধন্যবাদ।

আমি পেপারগুলি পড়েছি। Autistic children-দের কিছু বিষয় আমার কাছে দারুণ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। যেমন ধর, ওরা হাসে না।

তাই না-কি?

হ্যাঁ, ওরা হাসে না। একটা সেকেন্ড টেলিফোনটা ধরে রাখ, ওদের বিষয়ে সবচে ইন্টারেস্টিং জিনিসটা তোমাকে পড়ে শুনাই।

দরকার নেই। অবশ্যই দরকার আছে। শোন, আমি পড়ছি–

Autistic child might be obsessed with learning all about, train schedules, light houses, cars, vaccum cleaners. Often they show great interest in numbers, symbols, science, advanced math...

অ্যাই, তুমি কি আমার কথা শুনছ?

শুনছি, তবে মন দিয়ে শুনছি না।

Autistic বেবিরাও কিন্তু কখনো কোনো কথা মন দিয়ে শুনে না। তুমি কি জানো Mozart Autistic ছিল?

মতিন লাইন কেটে দিল। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ শুরু হলো স্বপ্ন দেখা। যেন সে ক্লাসে বসে আছে। বিরাট বড় ক্লাস। নানান বয়সের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। যিনি ক্লাস নিচ্ছেন তার চেহারা দৈত্যের মতো। তিনি। পাঞ্জাবি পরে আছেন, তারপরেও কোনো এক অদ্ভুত কারণে তাঁর খালি গা দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বুকভর্তি সাদা লোম। গালে চাপদাড়ি। তবে গালের দাড়ি বুকের ললামের মতো সাদা না। মেহেদি দিয়ে রাঙানো। দৈত্যাকৃতির এই লোকটির কণ্ঠস্বরও দৈত্যের মতো। ক্লাসরুম গমগম করছে। দৈত্যের হাতে বেত। সে বাতাসে কয়েকবার বেত নাচাল। শাঁ শাঁ শব্দ হলো। তারপর ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে প্রমাণ করতে পারে God বা ঈশ্বর বলে কিছু নেই? এই পৃথিবী, এই সৌরজগৎ, এই গ্যালাক্সি আপনাআপনি সৃষ্টি হয়েছে। আছে কেউ? যদি কেউ থাকে সে যেন এগিয়ে আসে। আমার কাছে চক আছে, ডাস্টার আছে, সে যেন প্রমাণ করে। একটাই শর্ত। প্রমাণ করতে না পারলে আমি তাকে শাস্তি দেব। আছে কেউ? আছে? সাহস দেখাও। উঠে আস।

কে যেন যাচ্ছে বোর্ডের দিকে। কে সে? আরে কমল না! করছে কী এই ছেলে? মতিন ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল–স্টপ। স্টপ। কমল ফিরে এসো। এই দৈত্য তোমাকে মারবে।

কমল ফিরছে না। তাকে উল্টো করে ফিরে এসো বলা দরকার। তখন হয়তো বুঝবে। মতিন প্রাণপণে চেঁচালো, সোএ রেফি! সোএ রেফি! লমক সোএ রেফি। কমল ফিরে এসো।

মতিনের ঘুম ভেঙে গেল।

তার বুক ধড়ফড় করছে। ঘামে সারা শরীর ভেজা। তৃষ্ণায় ফুসফুস ছোট হয়ে গেছে এমন অবস্থা। মতিন ভীত গলায় বলল, পানি খাব। কেউ তার কথা শুনল না। চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। ফার্মেসির কর্মচারীদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। এমন কি হতে পারে তার স্বপ্ন এখনো ভাভে নি? এখনো সে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে দৈত্যটা আবার ঢুকবে।

তার স্বপ্নে মাঝে মাঝে এই ব্যাপারটা ঘটে। স্বপ্নের মধ্যেই মনে হয় স্বপ্ন শেষ হয়েছে। সে জেগে উঠেছে, অথচ স্বপ্ন তখনো চলছে।

সে যে সত্যি জেগেছে তার প্রমাণ কী? গায়ে চিমটি কেটে দেখবে? পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাবে? জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে গায়ে ছ্যাকা দেবে?

মতিন পকেটে হাত দিল। পকেট থেকে বের হলো হলুদ রঙের খাম। যামের মুখ বন্ধ। খাম এখনো খোলা হয় নি। উপরে লেখা করিয়ার সার্ভিস। প্রেরক আশরাফ। আশরাফ তাকে চিঠি পাঠিয়েছে, সে না পড়ে পকেটে নিয়ে ঘুরছে, তা হয় না। অবশ্যই এটা স্বপ্ন। তবে খামের উপর কুরিয়ার সার্ভিস লেখা এবং একটা নাম্বার লেখা। স্বপ্নে এত ডিটেল থাকার কথা না।

মতিন, ঘুম ভেঙেছে?

হাবিবুর রহমান ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে চায়ের কাপ। তিনি চায়ের কাপ। বিছানার পাশে রাখতে রাখতে বললেন, চা খাও।

মতিন বলল, কয়টা বাজে?

সন্ধ্যা ছয়টা। তুমি তো ম্যারাথন ঘুম দিয়ে দিলে। ঘুম আরামের হয়েছে?

ঘুম আরামেরই হয়েছে, তবে আরো কিছুক্ষণ ঘুমাব। আপনার ফার্মেসি নয়টার সময় বন্ধ হয় না? আপনি আপনার কর্মচারীদের বলে দিয়ে যান তারা যেন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তারপর দোকান বন্ধ করে।

তুমি সত্যি সত্যি আবার ঘুমাবে?

হ্যাঁ। একটা মোমবাতি দিতে পারবেন?

মোমবাতি দিয়ে কী করবে?

আমার বন্ধুর একটা চিঠি এসেছে। তার চিঠি মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তে হয়। ইলেকট্রিকের আলোয় পড়া যাবে না।

হাবিবুর রহমান বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

ও থাকে নাইক্ষ্যংছড়ি নামের একটা জায়গায়। গহীন বন। তার ওখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। সে মোমবাতির আলোয় চিঠি লেখে।

সে মোমবাতির আলোয় চিঠি লেখে বলে তোমাকেও মোমবাতির আলোতে চিঠি পড়তে হবে?

মতিন হাই তুলতে তুলতে বলল, হ্যাঁ। কবি নদ্দিউ নতিমের একটি কাব্যগ্রন্থ আছে নাম দুপুরের শিশির। এর কবিতাগুলি তিনি মশাল জ্বেলে মশালের আগুনে লিখেছিলেন। সেই কারণে তার কবিতা পড়তে হয় মশাল জ্বেলে।

ঢাকা শহরে তুমি মশাল পাবে কোথায়?

মতিন বলল, এইখানেই তো সমস্যা। মশালের অভাবে উনার দুপুরের শিশির কাব্যগ্রন্থটা পড়া হয় নি।

তোমার কাজকর্ম এবং কথাবার্তার বেশির ভাগই আমি বুঝি না। তোমার যে বন্ধু জঙ্গলে থাকে সে-ই কি প্রতিমাসে তোমাকে টাকা পাঠায়?

হ্যাঁ। মোমবাতি এনে দিন তো দুলাভাই, চিঠিটা পড়ি। দুদিন ধরে এই চিঠি পকেটে নিয়ে ঘুরছি। মোমবাতির অভাবে পড়তে পারছি না। চিঠির কথা ভুলেও গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস দৈত্যকে দেখে ভয় পেয়ে পকেটে হাত দিয়ে চিঠির সন্ধান পেয়েছি। দৈত্য না দেখলে চিঠি পড়তে আরো দেরি হতো।

হাবিবুর রহমান দৈত্যের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলেন না। জিজ্ঞেস করলেই আরো কিছু উদ্ভট কথা শুনতে হবে। দরকার কী!

চিঠিতে আশরাফ লিখেছে–

হ্যালো মতিন,

তোর চিঠি পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়া হয় নি। ট্রি হাউস বানানোয় ব্যস্ত ছিলাম। প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে দেখার মতো একটা ট্রি হাউস বানিয়েছি। রেইনট্রি গাছের উপর বাসা। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। টু বেডরুম ফ্ল্যাট বলতে পারিস। বারান্দাও আছে। বারান্দাটা বেশ বড়। ওয়াল্ট ডিজনীর সুইস ফ্যামিলি রবিনসনে যে ট্রি হাউস আছে আমারটা তার কাছাকাছি। তুই দেখলে খুবই মজা পাবি।

তোকে বলেছিলাম না একটা পাহাড়ে কলার চাষ করেছি। এই প্রজেক্ট কাজ করে নি। কলা ভালো হয় নি। কলার কারণে দুনিয়ার বাঁদর এসে উপস্থিত হয়েছে। বদররা আমার কলাবাগান তছনছ করে বিদায় হয়েছে, তবে দুটা রয়ে গেছে। তারা আমার লগ হাউসের আশেপাশে থাকে। দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করে। আমি যখন নদীতে গোসল করতে যাই এরা আমার পেছনে পেছনে আসে। আমি বাঁদর দুটির নাম দিয়েছি। একটার নাম মাসি, আরেকটার নাম পিসি।

দুটিই মেয়ে বাঁদর বলে এই নামকরণ। দুটি মেয়ে বদর একসঙ্গে জোট বাঁধল কেন বুঝতে পারছি না। বাদর দুটি টের পেয়েছে যে তাদের নাম আছে। তারা ডাকলে সাড়া দেয়, তবে আমার খুব কাছে আসে না।

তুই শুনলে খুশি হবি যে, আমি শঙ্খ নদীর পাড় ঘেষে আরো সত্তর একরের মতো জমি নব্বই বৃছরে জন্যে লিজ নিয়েছি। এখানে আমি কফি বাগান করব। আমাকে যা করতে হবে তা হলো ভালো জাতের কফি গাছের চারা। জোগাড় করা।

আমি ভালোই আছি। সুখে আছি। বিশাল জায়গায় মহারাজার মতো ঘুরে বেড়ানোয় আনন্দ আছে। পাহাড়ি লোকজন আমাকে তেমন অপছন্দ করে বলে মনে হয় না। এক মুরং হেডম্যানের সঙ্গে আমার ভালো সখ্য হয়েছে। তাকে আমি জানিয়েছি যে, আমার ইচ্ছা একটা পাহাড়ি মেয়ে। বিয়ে করা। সে যেন পাত্রী খুঁজে দেয়।

মতিন, আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না। ঢাকা শহরের চটপটি খাওয়া এবং পিৎজা খাওয়া কোনো মেয়ে জঙ্গলে এসে থাকতে পারবে না। আমার প্রয়োজন পাহাড়ি মেয়ে। যে আমার মতোই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করবে।

তুই আমার সঙ্গে কবে জয়েন করবি? চলে আয় ব্যাক টু দ্য নেচার। ট্রি হাউসটা তোকে ছেড়ে দেব। গাছের উপর থাকা। গাছের উপর ঘুমানো। এখানে এলে নদ্দিউ নতিমের কিছু বৃক্ষ-কবিতা লিখে ফেলতে পারবি।

ভালো কথা, আমার টাকা নিয়মিত পাচ্ছিস তো? তুই আমার বেতনভুক্ত কর্মচারী, এটা মনে রাখবি।

আমার কিছু বই দরকার। Medicinal Plants-এর উপর বই এবং ক্যাকটাসের উপর বই। Medicinal Plants-এর উপর বাংলায় লেখা বইগুলি অখাদ্য। একটা বইয়ের নাম লিখে দিচ্ছি, কাউকে দিয়ে বাইরে থেকে আনাতে পারিস কি-না দেখ–

A Study on Medicinal Plants
M. S. Hindra Junior

বিষাক্ত গাছের উপর কোনো বইপত্র চোখে পড়লেও পাঠাবি।

ঐদিন কী হয়েছে শোন, আমি ছোট্ট একটা টিলায় উঠে দেখি টিলা ভর্তি বেগুনি রঙের ফুল। ফুলে গন্ধ আছে কি-না। দেখার জন্যে একটা ফুল ছিড়তেই হাতে জ্বলুনি শুরু হলো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাত ফুলে ঢোল। মানুষের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, আমার হাত ফুলে কলাগাছ।

আচ্ছা শোন, তুই কমল নামের একটি বাচ্চাকে নিয়ে অনেক কথা লিখেছিস। তুই কি এখনো তার হাউস টিউটর? তুই তোর ছাত্রকে নিয়ে চলে আয় না। আমিও দেখি ছেলেটার বিশেষত্ব কী?

আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকিস।

ইতি–
তোর কঠিন গাধা

আশরাফ তার নামের ইংরেজি বানান লেখে Ass Rough. যার বাংলা পাড়ায় কঠিন গাধা।

মতিন চিঠি খামে ভরল। বালিশের নিচে রেখে ঘুমোবার আয়োজন করল। তার মন বলছে এখন ঘুমালেই সে গহীন জঙ্গলের স্বপ্ন দেখবে।

৭. কমল মেঝেতে বসে আছে

কমল মেঝেতে বসে আছে। তার সামনে কাগজের বড় একটা বাক্স। বাক্সভর্তি খেলনা। সে বাক্স থেকে খেলনা বের করছে। মেঝেতে সাজাচ্ছে। সাজানোর ভঙ্গিও অদ্ভুত। একটির পেছনে একটি খেলনা রেখে সে সাপের মতো বানাচ্ছে।

কমলের কাছ থেকে একটু দূরে সালেহ ইমরান। তিনি চেয়ারে বসে। আছেন। প্রায় আধঘণ্টা হলো তিনি এখানে আছেন। এখন পর্যন্ত কমল তাঁর দিকে তাকায় নি। সে খেলনা দিয়ে লম্বা একটি সাপ তৈরিতে ব্যস্ত। সালেহ ইমরান জানেন Autistic শিশুদের এটা একটা বিশেষ ধরনের খেলা। কোন খেলনার পর কোনটি বসাবে এটা সে ঠিক করে রাখে। এর মধ্যে কোনো হেরফের হবে না। কেউ যদি কোনো একটা খেলনা গোপনে এখান থেকে সরিয়ে। ফেলে সে সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে ফেলবে, তখন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ডের সূচনা হবে।

As children, they might spend hours lining up their cars and trains in a certain way, rather than using them for pretent play, if some one accidentally moves one of these toys, the child

may be tremendously upset. কমল তার খেলনা গোছানো শেষ করে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল। সালেহ ইমরান সামান্য চমকালেন। Autistic শিশুরা কখনো হাসে না। কমল হঠাৎ হঠাৎ হাসে। কী সুন্দর সেই হাসি! সালেহ ইমরান যতবার এই হাসি দেখেন ততবারই চমকান। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যালো।

কমল বলল, হ্যালো।

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি তোমার খেলনা সবসময় একইভাবে সাজাও?

কমল বলল, হ্যাঁ।

কেন?

এটাই নিয়ম।

কার নিয়ম?

God-এর নিয়ম!

খেলনা কিন্তু তুমি সাজাচ্ছ। উনি সাজাচ্ছেন না।

কমল বলল, সব নিয়ম God ঠিক করেন। আমি একটা বইয়ে পড়েছি।

বইটার নাম কী?

God and New Physics.

বইয়ের সব কথা কিন্তু সত্য না।

কমল বলল, বইয়ের কথা সত্য। মানুষ মিথ্যা বলে, বই মিথ্যা বলতে পারে না। Book don’t have mind.

যে মানুষরা মিথ্যা বলে তারাই বই লেখে। বইয়ে তাদের মিথ্যা চলে আসে।

কমল চোখ-মুখ কঠিন করে বলল, No, বইয়ে সত্য কথা থাকবে। এটাই নিয়ম। God-এর নিয়ম।

তুমি কি God নিয়ে ভাবো?

হ্যাঁ।

God নিয়ে ভাবার সময় তোমার হয় নি। যখন হবে তখন ভাববে।

এখন আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প কর। আমার দিকে তাকিয়ে গল্প কর। অন্যদিকে তাকিয়ে না। তুমি যখন কারো সঙ্গে কথা বলবে, তখন তার দিকে তাকিয়ে কথা বলবে। এটা ভদ্রতা, এটাই নিয়ম।

কমল বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কী নিয়ে গল্প করব?

তোমার যা নিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে তা নিয়েই গল্প কর।

ম্যাথ?

যদি ম্যাথমেটিকস নিয়ে গল্প করতে ভালো লাগে তাহলে কর। শুধু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমি ম্যাথ জানি না। আমার অঙ্কের দৌড় হলো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।

কমল বলল, ম্যাথ হলো শুধু যোগ-বিয়োগ। গুণ-ভাগ যোগ-বিয়োগ থেকে এসেছে।

ও আচ্ছা।

কমল উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তুমি বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাক। আমি বোর্ডে একটা অঙ্ক করব।

সালেহ ইমরান ঘাড় ঘুরিয়ে বোর্ডের দিকে তাকালেন। তিনদিন আগে তার ঘরে এই বোর্ড লাগানো হয়েছে। কমল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই বোর্ডে কী সব সংখ্যা লেখে। লেখা শেষ হওয়া মাত্র ডাটার দিয়ে মুছে ফেলে অন্য একটা সংখ্যা লিখে ফেলে।

কমল বোর্ডের কাছে গেল। লিখল–

০ X ৫ = ০

বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা, ঠিক আছে? যে-কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য হয়। অংকের সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম God ঠিক করে দিয়েছেন।

সালেহ ইমরান বললেন, সবকিছুতেই God আনবে না। তবে তোমার অঙ্ক ঠিক আছে। পাঁচকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ফল শূন্য হবে, এইটুকু অঙ্ক আমি জানি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

কমল বলল, এইটুকু অঙ্ক যদি জানো তাহলে এটাও জানো যে–

০ X ১ = ০

সালেহ ইমরান বললেন, হ্যাঁ।

কমল বোর্ডে লিখল–

০ X ৫ = ০ X ১

সে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ৫-কে শূন্য দিয়ে গুণ করলে হয় শূন্য, আবার ১-কে শূন্য দিয়ে গুণ করলেও হয় শূন্য। কাজেই ০ X ৫ যা, ০ x১ ও তা। ঠিক আছে বাবা?

সালেহ ইমরান বললেন, ঠিক আছে।

কমল বলল, এখন এসো ডানদিক এবং বাকি দুই দিককে শূন্য দিয়ে ভাগ করে দেখি কী হয়। কমল বোর্ডে লিখল।

(০ X ৫)/০ = (০ X ১)/০

(Ø X ৫)/ Ø = (Ø X ১)/ Ø

৫ = ১

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সালেহ ইমরান অবাক হয়ে বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন। কমল বলল, বাবা, দেখলে আমি প্রমাণ করলাম পাঁচ সমান এক।

সালেহ ইমরান বললেন, তাই তো দেখছি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল আছে।

ভুল নেই।

তাহলে তো সব সংখ্যাই সমান।

কমল বলল, হ্যাঁ সমান।

তোমার কি মনে হয় না তুমি উদ্ভট কথা বলছ?

মনে হয় না। পৃথিবীতে দুটা মাত্র সংখ্যা। একটা হলো শূন্য, আরেকটা এক। আর কোনো সংখ্যা নেই।

এটা কি তোমার নিজের কথা? না-কি তুমি কোনো বইয়ে পড়েছ?

বইয়ে পড়েছি।

সালেহ ইমরান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোমার একজন ভালো গাইড দরকার, যে ঠিক করে দেবে তুমি কোন বই পড়বে, কোনটা পড়বে না। কোন বই বিশ্বাস করবে, কোনটা করবে না। আমি তোমার গাইড হতে পারলে ভালো হতো। আমার সেই যোগ্যতা নেই।

কমল আগ্রহ নিয়ে বলল, অঙ্কের আরেকটা মজা দেখবে?

সালেহ ইমরান বললেন, না। আমি তোমাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি। কথা শেষ করে চলে যাব।

অঙ্ক খুবই জরুরি।

তোমার কাছে নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু আমার কাছে জরুরি না।

কমল কঠিন গলায় বলল, তোমার কাছেও জরুরি। সবার কাছেই জরুরি। God-এর কাছেও জরুরি। God অঙ্ক করে করে Galaxy তৈরি করেছেন। অঙ্ক যদি God-এর কাছে জরুরি হয় তাহলে তোমার কাছেও জরুরি।

কমলের চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেছে। ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে।

সালেহ ইমরান ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমার জন্যেও জরুরি। শুরুতে বুঝতে ভুল করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি।

কমল বলল, Sknaht.

বাবা, সোজা করে বলো। উল্টো কথা আমি বুঝতে পারি না। উল্টো কথা। শুনলে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

কমল বলল, আমি বলেছি Thanks.

তোমাকেও থ্যাংকস। এখন কি আমি আমার কম জরুরি কথাটা বলতে পারি?

পার।

আমি অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করছিলাম বিদেশে কোনো একটা Special School-এ তোমাকে ভর্তি করতে। কানাডার একটা স্কুল আমার পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু সেখানে অটিজম বিষয়ে আলাদা কার্যক্রম নেই। এখন একটা স্কুল পাওয়া গেছে। স্কুলটা জুরিখে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অটিস্টিক শিশুরা সেখানে পড়াশোনা করে। তোমাকে সেই স্কুলে অ্যানরোল করা হয়েছে।

কমল বলল, Doog.

সালেহ ইমরান বললেন, ঠিক করে কথা বলো। Doog মানে কী?

কমল বলল, Doog মানে Good.

সেখানে তুমি অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে। প্রপার গাইড পাবে। তোমার পছন্দের ম্যাথমেটিকসের বই পাবে। তাদের বিশাল লাইব্রেরি। স্কুলটাও একটা পাহাড়ের উপর। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলনাবিহীন।

কমল বলল, Doog.

সূচিপত্র

শুরুতে তোমার মা তোমার সঙ্গে থাকবেন। তোমাকে সেটল করে দিয়ে। ফিরে আসবেন।

No.

নো বলছ কেন?

আমি মাকে সঙ্গে নেব না।

কেন নেবে না?

আমি তাকে পছন্দ করি না।

কেন পছন্দ কর না?

আমি মাকে পছন্দ করি না, কারণ মা তোমাকে পছন্দ করে না।

তোমার মা আমাকে পছন্দ করে না এটাই বা তুমি বুঝলে কীভাবে?

আমি বুঝতে পারি। মা অন্য একজনকে পছন্দ করে, তোমাকে না। আমি কি সেই অন্য একজনের নাম বলব?

না। যে বিষয়ে আমরা কথা বলছিলাম এসো সেই বিষয়ে কথা বলি।

কমল বলল, আমি সেই অন্য একজনের নাম বলব।

তোমার কাছ থেকে সেই নাম আমি শুনতে চাচ্ছি না।

আমি বলব। কমল বলবে। কমল বলবে। কমল বলবে।

আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বলবে। আমাদের আলোচনা শেষ হোক, তারপর দলবে। ঠিক আছে?

হুঁ।

তোমাদের স্কুলের সেশন শুরু হবে জানুয়ারি থেকে। কাজেই তুমি তোমার মাকে নিয়ে ডিসেম্বরের শেষের দিকে চলে যাবে।

কমল বলল, আমি মাকে সঙ্গে নেব না। আমি নতিমকে নেব। নতিম আমার সঙ্গে যাবে।

নতিমটা কে?

নদ্দিউ নতিম।

ও আচ্ছা মতিন। তাকে নেয়া যাবে না। তার প্রসঙ্গে আলোচনা বন্ধ। ঠিক আছে?

হুঁ।

সালেহ ইমরান উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে পা বাড়ালেন। কমল চাপা গলায় বলল, তুমি বলেছিলে আলোচনা শেষ হলে আমি লোকটার নাম বলতে পারব। কিন্তু তুমি তার আগেই চলে যাচ্ছ। Why?

আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

তুমি ভুলে যাও নি। তুমি ভাব করেছ যে ভুলে গেছ। কিন্তু তুমি ভুলে যাও নি।

হতে পারে।

সালেহ ইমরান আবার এসে চেয়ারে বসলেন। হতাশ গলায় বললেন, এখন নাম বলো।

কমল বলল, তার নাম করুফা দমেহআ।

উল্টো কথা আমি বুঝতে পারি না। ঠিক করে বলো।

তার নাম আহমেদ ফারুক।

সালেহ ইমরান বললেন, এখন কি আমি যেতে পারি?

কমল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বাবা ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র খেলনা নিয়ে বসল। এখন সে খেলনাগুলি দিয়ে দুটা সমান্তরাল রেখা তৈরি করছে। তার যখন বেশি মন খারাপ হয় তখন সে খেলনা দিয়ে সমান্তরাল রেখা তৈরি করে একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সে বইয়ে পড়েছে দুটা সমান্তরাল রেখা ইনফিনিটিতে মিশবে। ইনফিনিটি হলো সেই

রহস্যময় জায়গা যেখানে God থাকেন। এবং God সমস্ত নিয়ম দিয়ে দেল। যিনি নিয়ম দেন তিনিই শুধু নিয়ম ভাঙতে পারেন। তিনের সঙ্গে চার যোগ করলে সাত হবে, এই নিয়ম কেউ। ভাঙতে পারবে না। কিন্তু God পারবেন।

মুনা অনেকক্ষণ হলো আয়নার সামনে। সে তার গায়ের রঙ নিয়ে একটা অ্যাক্সপেরিমেন্ট করেছে। অ্যাক্সপেরিমেন্টের ফল ঠিক বুঝতে পারছে না। সে ডার্ক শেডের মেকাপ নিয়েছে। তার মুখ এখন হয়ে গেছে শ্যামলা মেয়ের মুখের মতো। শ্যামলা মেয়েদের চোখে কাজল খুব মানায়। সে কাজল দিয়েছে, কিন্তু কাজলটা মানাচ্ছে না। এরকম তো হওয়ার কথা না। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সালেহ ইমরান ঘরে ঢুকতেই মুনা তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দিকে ভালো করে তাকাও তো।

সালেহ ইমরান তাকালেন।

মুনা বলল, কী দেখছ?

সালেহ ইমরান বললেন, তোমাকে দেখছি।

আমাকে কী দেখছ?

তোমার মুখ কালো, কিন্তু হাত ধবধবে ফর্সা।

আমার হাতের রঙ আপাতত ভুলে যাও। শুধু মুখের দিকে তাকাও। কালো রঙটায় কি আমাকে মানাচ্ছে?

হ্যাঁ মানাচ্ছে।

কোনো ত্রুটি ধরা পড়ছে না?

একটা ত্রুটি ধরা পড়ছে। চেহারায় মায়া ভাব চলে এসেছে। এত মায়া তো তোমার নেই।

মায়াবেশি মেয়েরা ছিচকাঁদুনে হয়। আমি সেরকম না।

সালেহ ইমরান খাটে বসতে বসতে বললেন, কোথাও যাচ্ছ?

মুনা বলল, পার্লারে যাব। কালো রঙ পুরো শরীরে বসাব। তার আগে নিজে একটা অ্যাক্সপেরিমেন্ট করলাম।

সালেহ ইমরান বললেন, Doog.

মুনা বিস্মিত হয়ে বলল, Doog মানে?

সালেহ ইমরান বললেন, Doog মানে হলো Good. তোমার ছেলের কাছে শিখেছি।

মুনা বলল, ওর সঙ্গে তার সুইজারল্যান্ডের স্কুলার বিষয়ে কথা বলেছ?

বলেছি। স্কুলের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই, বরং তার মধ্যে আগ্রহই দেখলাম। আগ্রহের মূল কারণ সম্ভবত সে স্কুল লাইব্রেরিতে তার মনের মতো বই পাবে।

মুনা বলল, সে যে নিজ থেকে যেতে রাজি হয়েছে এটাই মূল বিষয়। ভালো কথা, তুমি কিন্তু তোমার জুনিয়র ফারুক সাহেবকে ছেড়ে দেবে। সুইজারল্যান্ডে যাবার সময় আমি তাকে সঙ্গে নেব। তাকে ভিসা করতে বলে দিয়েছি। ফারুক সাহেবকে ছাড়া তোমার কয়েকটা দিন চলবে না?

অবশ্যই চলবে। তাকে নিতে হবে কেন?

তাকে নিতে হবে, কারণ তোমার ছেলে তাকে পছন্দ করে। আমরা দুজন সঙ্গে গেলে কমলের ট্রানজিশনটা সহজ হবে।

সালেহ ইমরান বললেন, ফারুককে আমার ছেলে পছন্দ করে, তুমি কর না?

মুনা বলল, অবশ্যই করি। ভেরি গুড কোম্প্যানি। সেন্স অব হিউমার আছে। তার ক্লোজআপ ম্যাজিক কখনো দেখেছ?

না। সে আবার ম্যাজিকও দেখায়?

তার ক্লোজআপ ম্যাজিক দেখলে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে। সে কী করে শোন, এক টুকরা কাগজ নেয়। ফুঁ দেয়। মুহূর্তের মধ্যে কাগজটা হয়ে যায় পাঁচশ টাকার একটা নোট। আবার ফুঁ দেয়–নোটটা আবার হয়ে গেল কাগজ।

ওকে একদিন ডাক। আমরা সবাই ম্যাজিক দেখি।

ঠিক আছে আমিই ব্যবস্থা করব। ফ্যামিলি ম্যাজিক শো। বৃহস্পতিবার রাতে ব্যবস্থা করি। ঐদিন কি তোমার কোনো কাজ আছে? ফ্রি আছ না?

হ্যাঁ ফ্রি আছি।

দরজায় টোকা পড়ছে। টোকার ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছে রহমত। বড় ধরনের কোনো সমস্যা না হলে রহমত সালেহ ইমরানের শোবার ঘরের দরজায়। টোকা দেবে না। সালেহ ইমরান বললেন, কী ব্যাপার রহমত?

রহমত ভীত গলায় বলল, ছোট বাবু খানা বন্ধ করে দিয়েছে।

কেন?

ছোট বাবু বলেছে, নতিম সাহেবের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সে কিছু খাবে না।

সালেহ ইমরান হতাশ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুনা বলল, তুমি চিন্তা। করবে না। ঐ ছাগলটাকে আমার ব্যবস্থা আমি করছি।

সালেহ ইমরান বললেন, ওকে ছাগল বলছ কেন?

মুনা হালকা গলায় বলল, যে ছাগল তাকে আমি ছাগল বলি। যে পাঁঠা তাকে আমি পাঁঠা বলি। পাঁঠাকে কখনো সিংহ বলি না।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার হিসেবে আমি কী? ছাগল না পাঁঠা?

মুনা বলল, তুমি কী সেই বিষয়ে আমি এখনো নিশ্চিত না। তবে তুমি সিংহ। না।

তোমার পরিচিত কেউ কি আছে যে সিংহ?

মুনা জবাব দিল না। স্থির চোখে তাকিয়ে রইল।

সালেহ ইমরান চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, মানুষ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, কিন্তু তুলনা দেয়ার সময় পশুদের সঙ্গে তুলনা দেয়।

মুনা বলল, তার মানে?

সালেহ ইমরান বললেন, সিংহের মতো সাহসী, শৃগালের মতো ধূর্ত। ট্যাংক সেনাপতি রোমেলকে বলা হতো Desert Fox, মরু শিয়াল।

মুনা বলল, জ্ঞানীর মতো কথা বলার চেষ্টা করছ বলে মনে হচ্ছে।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি মূর্খ, এই কারণেই জ্ঞানীর মতো কথা বলার চেষ্টা করি। জ্ঞানীরা কখনো জ্ঞানীর মতো কথা বলে না। মূর্খরা মাঝে মাঝে বলে।

তুমি মূর্খ না।

শুনে খুশি হলাম। স্বামী বিষয়ে স্ত্রীর সার্টিফিকেট হচ্ছে দ্য আলটিমেট থিং। স্ত্রীর সার্টিফিকেটই শেষ কথা।

মুনা বলল, স্ত্রীর বিষয়ে স্বামীর সার্টিফিকেটের কী অবস্থা?

সালেহ ইমরান বললেন, খারাপ অবস্থা। স্বামীরা কখনো স্ত্রীদের বিষয়ে কোনো সার্টিফিকেট দিতে পারেন না।

কেন পারেন না?

কারণ কোনো স্বামীই তার স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি।

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামী ছিল। পাঁচ স্বামী মিলেও দ্রৌপদীকে চিনতে পারে নি। কেউ বুঝতেও পারে নি দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীর মধ্যে সবচে পছন্দ করত অর্জুনকে। বেচারা অর্জুন নিজেও বুঝতে পারে নি।

মুনা বলল, তুমি কি আমাকে বুঝতে পার?

সালেহ ইমরান বললেন, চেষ্টা করলে হয়তো বুঝতে পারতাম। চেষ্টা করি না।

কেন চেষ্টা কর না? ইচ্ছা করে না। তাছাড়া চেষ্টা করার নিয়মও নেই।

নিয়ম নেই মানে? কার নিয়ম?

God-এর নিয়ম। যাবতীয় নিয়ম তিনি অঙ্ক কষে কষে ঠিক করে দেন।

মুনা তীক্ষ্ণ-গলায় বললেন, তুমি এইসব কী উল্টাপাল্টা কথা বলছ? এইসব কে ঢুকাচ্ছে তোমার মাথায়?

সালেহ ইমরান বললেন, কমল ঢুকাচ্ছে। He is smart. সে যদি কোনোদিন বিয়ে করে তাহলে তার স্ত্রীকে বুঝতে পারবে। I am quite certain about that.

৮. মতিন তার মেসের ঘরে শুয়ে আছে

মতিন তার মেসের ঘরে শুয়ে আছে। ঘরটাকে সে তার দুলাভাইয়ের ঘুমঘরের মতো করার চেষ্টা করেছে। শীতলপাটি আগেই ছিল, ঘর অন্ধকার করার জন্যে একমাত্র জানালাটা স্থায়ীভাবে পেরেক মেরে বন্ধ করে দিয়েছে। বাইরের দৃশ্য এমন কিছু নয়নাভিরাম না যে, জানালা খুলে রাখতে হবে। জানালা খুললেই বস্তির দৃশ্য চোখে পড়ে। সেই দৃশ্যে সবসময় মারামারি কিংবা ঝগড়া আছে। এইসব দৃশ্য এক দুদিন দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে। দিনের পর দিন দেখতে ভালো লাগে না।

দুপুর বারোটা। আকাশ মেঘলা। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। মতিনের মেসের কিছু অংশে টিনের ছাদ। বৃষ্টির শব্দ সে দরজা জানালা বন্ধ করেও শুনতে পাচ্ছে। সারা সকাল সে বৃষ্টি শব্দটা নিয়ে চিন্তা করছিল। যেমন, বৃষ্টি শব্দটা কোত্থেকে এলো? এই শব্দটা কে প্রথম বলল? এরকম কি হতে পারে যে, প্রথম একজন আকাশ থেকে পানি পড়ার নাম দিল বৃষ্টি? সবার সেই শব্দটা পছন্দ হলো বলে সবাই বৃষ্টি বলা শুরু করল। সমস্যা হচ্ছে একসঙ্গে এই শব্দটা তো সবার কাছে পৌঁছানো অতি জটিল ব্যাপার। আচ্ছা এমন কি হতে পারে, বাংলা ভাষাভাষি সমস্ত মানুষ হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে পানি পড়ার নাম দিল বৃষ্টি?।

এমন ঘটনা ঘটলে আমাদের স্বীকার করতে হবে, শব্দ আমাদের মাথায় বাইরে থেকে কেউ একজন ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই কেউ একজনটা কে?

মতিন বিষয়টা নিয়ে আরো চিন্তা করত, এখন চিন্তা করতে পারছে না, কারণ তার খাটের পাশের চেয়ারে আহমেদ ফারুক নামের মানুষটি বসে আছে। অনেক চেষ্টা করেও মতিন তাকে বিদায় করতে পারছে না।

।ফারুক বললেন, আপনি কি সমস্যা বুঝতে পেরেছেন? Autistic শিশু নিয়মের বাইরে কখনো যায় না। নিয়মকে তারা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। সেখানে কমল নিয়মভঙ্গ করেছে। সে আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে।

মতিন বলল, তার দুই গালে কষে দুটা চড় দিন, দেখবেন সোনামুখ করে খাচ্ছে। চড়টা মালদার হতে হবে। ধরি মাছ না ছুঁই পানি মার্কা প্যাকেজ নাটকের চড় না।

ভাই, আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন না।

আপনিও আমার বিষয়টা বুঝতে পারছেন না। দুদিন পর আমার বিয়ে। আজ মেয়ের গায়েহলুদ হচ্ছে। কাল আমার গায়েহলুদ হবে। এই অবস্থায় আমি আমার ঘর থেকে বের হতে পারি না।

কেন পারেন না?

নিয়ম নাই। বাইরে বের হলাম, একটা অ্যাকসিডেন্ট হলো। মরে গেলাম। বিয়ের দুই দিন আগে মৃত্যু, এটা ঠিক হবে না। নিয়ম হচ্ছে, গায়েহলুদের পর বর কনে কেউ ঘর থেকে

বের হতে পারে না। প্রাচীন ভারতে গায়েহলুদের পর বর কনে দুজনকেই তালাবন্ধ করে রাখা হতো।

ভাই আপনি প্রাচীন ভারতবর্ষে বাস করছেন না। আপনি আধুনিক বাংলাদেশে বাস করছেন।

কি প্রাচীন ভারতে যে নিয়ম আধুনিক বাংলাদেশেও একই নিয়ম।

আহমেদ ফারুক একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা মতিনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মতিন সিগারেট নিল। ফারুক বললেন, ম্যাডামের সঙ্গে আপনার ঐ বাড়িতে যাওয়া নিয়ে কথা হয়েছে। ম্যাডাম বলেছেন যেহেতু আপনার উপর হঠাৎ করে আমরা একটা বিষয় Impose করি সেহেতু আপনাকে Compensate করা হবে।

মতিন সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, কীরকম Compensation? টাকা দেবেন?

জি। টাকার অ্যামাউন্ট নিয়ে ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয় নি। আপনি বললে কথা বলতে পারি।

মতিন আগ্রহের সঙ্গে বলল, আপনার ধারণা কী? একেকবার ঐ বাড়িতে যাওয়া বাবদ কত পেতে পারি?

তাদের একটা মাত্র ছেলে এবং ছেলেটা তাদের চোখের মণি। তারা অর্থ বিত্তের শীর্ষে বসে আছেন। ছেলের জন্যে টাকা খরচ করতে তাঁদের কোনো দ্বিধা আছে বলে আমি মনে করি না।

আপনি তো মূল প্রসঙ্গে আসছেন না। মূল কথাটা বলুন, ওরা কত দিতে পারে?

ধরুন দশ হাজার। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। ফেরার সময় দশ হাজার টাকা নগদ আপনার হাতে দেয়ার দায়িত্ব আমার। দুদিন পর বিয়ে করছেন। বাড়তি টাকাটা আপনার কাজে আসবে।

মতিন বলল, আপনার সিগারেট শেষ না?

ফারুক বললেন, প্রায় শেষ।

তাড়াহুড়া করবেন না। আরাম করে সিগারেট শেষ করে বিদায় হয়ে যান।

আপনি যাবেন না?

না। আমাকে হাতি দিয়ে টেনেও নিতে পারবেন না।

একটা কোনো Solution-এ তো আসতে হবে।

ছেলেটাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। এই দেখাটা যে-কোনো জায়গায় হতে পারে। আগামীকাল তাকে নিয়ে আসুন। আগামীকাল আমার গায়েহলুদ। সে কিছু হলুদ আমার গায়ে মাখিয়ে দিল।

ফারুক হতাশ গলায় বললেন, এইসব কী বলছেন?

মতিন বলল, আকাশ থেকে পড়লেন কেন? রাজপুত্র এদিকে আসতে পারে? রাজপুত্রের সম্মানের হানি হবে?

আচ্ছা আমি যাই।

চলে যান। যাবার আগে একটা সিগারেট আমার দিকে ছুড়ে মেরে যেতে পারেন।

আহমেদ ফারুক সিগারেটের পুরো প্যাকেটটাই মতিনের বিছানার পাশে রেখে দিলেন। মতিন বলল, দান্যধ!

ফারুক বললেন, কী বললেন?

মতিন বলল, কমলের ভাষায় কথা বলেছি। দন্যধ মানে ধন্যবাদ।

বৃষ্টি জোরেসোরেই নেমেছে। মতিন তার পুরনো চিন্তায় ফিরে গেল। বৃষ্টি শব্দটা নিয়ে গবেষণা।

বৃষ্টি একটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় যে সব শব্দ এসেছে। সেগুলি খানিকটা কোমল হয়ে এসেছে। যেমন রাত্র হয়েছে রাত। বৃষ্টির বেলায় তেমন কিছু হয় নি। বৃষ্টি, বৃষ্টিই রয়ে গেছে। বিষটি হয় নি। কিছু শব্দ কঠিন থাকবে কিছু আবার কোমলই থাকবে, এটা কেমন কথা?

বালিশের নিচে রাখা মোবাইল টেলিফোন শব্দ করছে। মতিন মোবাইল সেট হাতে নিল। নিশুর নাম্বার। ধরবে কি ধরবে না এই সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে হবে। বেশ কয়েক দিন হলো কী জানি হয়েছে, নিশুর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে না।

হ্যালো মতিন?

হুঁ। রিং বেজেই যাচ্ছে বেজেই যাচ্ছে, তুমি ধরছ না কেন? শোন, তোমার না-কি বিয়ে?

হুঁ

কবে?

এ মাসের ২৮ তারিখ।

তার মানে তো পরশু।

হুঁ।

আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি আমাদের কিছুই জানাবে না!

গরিবের বিয়ে। কার্ড নেই, বৌ ভাত নেই, শুধু কবুল কবুল।

তারপরেও আমাদের কিছু বলবে না? তুমি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছ?

না।

তোমার বিয়েতে আমি যদি বাবাকে নিয়ে উপস্থিত হই তোমার কি আপত্তি আছে?

না।

আমরা বরযাত্রী যাব। বর রওনা হবে কোত্থেকে?

আমার দুলাভাইয়ের ঘুমঘর থেকে। হেঁটে চলে যাওয়া যাবে।

তোমার বিয়ে কি সত্যি হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে পুরোটাই ঠাট্টা। An elaborate fun game.

আমাদের পুরো জীবনটাই তো একটা elaborate fun game. নিশু, রাখি, আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমাব।

না, রাখবে না। আমি তোমার সঙ্গে জরুরি কথা বলব।

বলো শুনছি।

আমি একটা বিষয় নিয়ে শুরু থেকেই সন্দেহ করছিলাম, এখন আমি ৯৮ পারসেন্ট নিশ্চিত। বিষয়টা হচ্ছে You are in love with me.

তাই না-কি?

হ্যাঁ তাই। তুমি Timid প্রকৃতির পুরুষ বলে আমাকে জানাতে সাহস কর নি। তুমি যে হুট করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে তার কারণ আমি বিয়ে করছি। আমার বিয়েটা তুমি নিতে পারছ না। আরো লজিক দেব?

দাও।

তুমি বিয়েতে আমাকে আসতে বলে নি। তুমি কি আমার লজিক মানছ?

বুঝতে পারছি না।

মতিন শোন, বিয়ে অনেক বড় ব্যাপার। আমার উপর অভিমান করে কিছু করা ঠিক না।

বিয়ে বাতিল করে দিতে বলছ?

ভালো মতো চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে বলছি। Be rational, তুমি বাসায় চলে আস, তোমার সঙ্গে কথা বলি।

কখন আসব?

এখনই আসবে। আমি এখনো লাঞ্চ করি নি। তুমি এলে দুজনে একসঙ্গে খাব।

রান্না কী?

আজ বাসায় রান্না হয় নি। ভেবেছিলাম রেস্টুরেন্ট থেকে তেহারি এনে খাব। তুমি তো আবার রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে পার না। আচ্ছা এসো, আমি রান্না করব।

তুমি রাঁধতে পার না-কি?

ভাত ডাল অবশ্যই রাঁধতে পারি। কথা বলে সময় নষ্ট করো না। রওনা হও।

একটু দেরি হবে। গোসল এখনো করা হয় নি। গোসল সেরে আসি?

না, তুমি এক্ষুনি আসবে।

নিশু বলল, খেতে পারছ?

মতিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

নিশু বলল, ভাতটা ড্যালডালা হয়ে গেছে। ডালে লবণ হয়েছে বেশি। বেগুনভাজা ঠিক আছে না?

মতিন বলল, বেগুনভাজা Do0g হয়েছে। ডাল Dab হয়েছে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে–তুমি একজন Secnirp.

সেকনিরপটা কী?

মতিন বলল, সেকনিরপ মানে প্রিন্সেস। তবে কপালে যে টিপটা দিয়েছ সেই টিপ মাঝামাঝি হয় নি।

নিত বলল, টিপ দিয়ে অভ্যাস নেই তো, হঠাৎ দিলাম।

হঠাৎ দিলে কেন?

সাজতে ইচ্ছা করল।

হঠাৎ সাজতে ইচ্ছা করল কেন? শকা ড়েঝে।

শকা ড়েঝে মানে?

মতিন বলল, শকা ড়েঝে মানে ঝেড়ে কাশ। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ তোমার সাজতে ইচ্ছা করল। তুমি ইস্ত্রি করা শাড়ি পরলে, কপালে টিপ দিলে, আয়োজন করে একজনের জন্যে রাঁধলে। মানে কী?

নিশু থমথমে গলায় বলল, তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

মতিন বলল, আমি দুই-এ দুই-এ চার মেলাবার চেষ্টা করছি, তোমার কর্মকাণ্ডের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি।

ব্যাখ্যা পেয়েছ?

ছিয়েপে।

ফাজলামি বন্ধ করে ঠিকমতো কথা বলো। ব্যাখ্যা পেয়েছ?

পেয়েছি।

বলো, আমিও শুনি।

আমি বিয়ে করছি, এই বিষয়টা তুমি নিতে পারছ না। তোমার মধ্যে ঈর্ষা জেগে উঠেছে।

নিশু থমথমে গলায় বলল, তোমার ধারণা আমি কখনো সাজগোজ করি না? কখনো ইস্ত্রি করা শাড়ি পরি না? কখনো কপালে টিপ দেই না?

অবশ্যই দাও। তবে আজকেরটা অন্যরকম।

অন্যরকম কেন? তোমার মতো মহাপুরুষের পদধূলি পড়েছে এইজন্যে?

মতিন বলল, আজকের বিষয়টা অন্যরকম। কারণ আজ চাচাজির শরীর প্রচণ্ড খারাপ। তার জ্বর এসেছে। বেশ ভালো জ্বর। তিনি তার ঘরে শুয়ে কাতরাচ্ছেন! চাচাজিকে এই অবস্থায় রেখেও তুমি সাজসজ্জার কর্মকাণ্ড চালিয়েছ।

নিশু বলল, তুমি কী প্রমাণ করতে চাচ্ছ? তুমি কি প্রমাণ করতে চাচ্ছ, তোমার মতো রাজপুত্র আমি আমার জীবনে দেখি নি? এবং রাজপুত্রের জন্যে আমি যে-কোনো মুহূর্তে জীবন বিসর্জন দিতে রাজি আছি?

আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাচ্ছি না।

তোমাকে আমি কোন চোখে দেখি শুনতে চাও?

শুনতে চাই না।

শোন। অবশ্যই শুনতে হবে। তুমি এমন এক নিম্নবুদ্ধিবৃত্তির মানুষ যাকে সহজেই manipulate করা যায়। আমি সবসময় তাই করেছি। তোমাকে manipulate করে নানান কাজকর্ম করিয়ে নিয়েছি। আমার বাজার দরকার, বাবাকে ডেনটিস্টের কাছে নেয়া দরকার, ডাক পড়বে তোমার। তোমাকে যে আমি মোবাইল কিনে দিয়েছি কী জন্যে দিয়েছি? সময়ে অসময়ে তোমার অমৃতবাণী শোনার জন্যে না। তোমাকে যেন সময়ে অসময়ে কাজকর্মের জন্যে ডাকতে পারি সেজন্যে।

আজ দুপুরে কী জন্যে ডেকেছ?

বাবার পাশে বসার জন্যে। আমাকে ঘণ্টা তিনেকের জন্যে বের হতে হবে। এই ঘণ্টা তিনেক তুমি বাবার সঙ্গে থাকবে। আমি কেন সাজগোজ করেছি সেই রহস্য কি পরিষ্কার হয়েছে?

মতিন কিছু বলল না। নিশু বলল, নিজেকে স্মার্ট ভেব না। তুমি স্মার্ট না। তুমি অ্যাভারেজ IQ-এর একজন অ্যাভারেজ মানুষ। I am not.

নিশু খাবার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, দয়া করে থালাবাসন ধুয়ে দিয়ে যাও। বাবার কাছে একটু বসো। আমার দেরি হয়ে গেছে। এক্ষুনি বের হবো।

কোথায় যাচ্ছ?

That's none of your business.

মতিন আজিজ সাহেবের ঘরে বসে আছে। একটু আগে তাঁর জ্বর মাপা হয়েছে। জ্বর একশ তিন পয়েন্ট ফাইভ। তিনি ঝিম ধরে আছেন। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন। শ্বাস নেবার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে তার সামান্য হলেও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তিনি মতিনের দিকে ফিরে চাপা গলায় বললেন, নিশু কোথায় গেছে তুমি জানো?

মতিন না-সূচক মাথা নাড়ল।

তার কাজ কারবার কিছুই বুঝি না। সে কোথায় যায় কী করে তাও বুঝি। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি মেয়েটার মাথায় বোঝার মতো চেপে আছি।

মতিন বলল, নিজেকে সিন্দাবাদের দৈত্য মনে হয়?

ঠিক বলেছ, সিন্দাবাদের দৈত্য। ঘাড়ে চেপে বসেছি, আর নামব না। বুঝেছ। মতিন, আমরা সবাই কোনো-না-কোনো অর্থে সিন্দাবাদের দৈত্য। এর তার ঘাড়ে চেপে আছি।

চাচাজি, আপনি কথা না বলে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি আপনার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করছি।

পানি ঢালার ব্যবস্থা করতে হবে না। তুমি যেখানে বসে আছ সেখানে বসে থাক। তোমার সঙ্গে গল্প করি। আমার গল্প করার লোক নেই। আমার মেয়ে আমার সঙ্গে গল্প করে না। সে আছে তার জগৎ নিয়ে। ভালো কথা, শুনলাম তুমি বিয়ে করছ?

জি।

বেকার ছেলেদের বিয়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহ থাকে। বিয়ের কথা শুনলেই তারা এক পায়ে খাড়া। বিয়ের পর সে বউকে কী খাওয়াবে এই নিয়ে মাথাব্যথা নেই। তুমি আবার আমার কথায় কিছু মনে করো না।

আমি কিছু মনে করছি না।

মেয়ের নাম কী?

তার নাম তৌ।

তৌ আবার কেমন নাম!

আসল নাম তৌহিদা। আমি শর্ট করে তৌ ডাকি।

শর্ট করে ডাকার দরকার কী?

সামান্য ঢং করছি।

বুঝতে পারছি। বেকার ছেলেরা ঢং ঠাট্টা তামাশায় একনম্বর। আসল কাজে লবডঙ্কা। লবডঙ্কা শব্দের মানে জানো?

জানি।

বলো, মানে বলো।

লব শব্দের মানে ছিদ্র। ছেদন। লবডঙ্কা মানে ছিদ্র হওয়া ঢোল। ছিদ্র করা ঢেলে কোনো শব্দ হয় না।

তুমি তো বাংলা ভালো জানো। বেকার ছেলেরা অপ্রয়োজনীয় বিষয় ভালো জানে। কাজ চলবার মতো বাংলা জানলেই তোমার চলত। চলত কি-না?

জি চলত।

মতিন, আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি। জানালা খুলে দেই।

না। জানালা বন্ধ থাকুক। নিজেকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করছে। তোমার কাছে। সিগারেট আছে? সিগারেট থাকলে ধরিয়ে আমার হাতে দাও। শ্বাসকষ্টের মধ্যে সিগারেট, এতে কষ্টটা আরো বাড়বে। নিজেকে কষ্ট দেয়ার মধ্যেও আনন্দ। আছে। বুঝেছ? নিজেকে কষ্ট দিতে চাচ্ছি।

চাচাজি, আমার কাছে সিগারেট নেই। আপনি চাইলে এনে দিতে পারি।

দরকার নেই, তুমি এখানে বসে থাক। তুমি বেকার মানুষ। তোমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকায় তো কোনো সমস্যা নেই।

জি-না, সমস্যা নেই।

এক থেকে দশের ভেতর একটা সংখ্যা বলো।

পাঁচ।

আজিজ সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বোকা ধরনের মানুষদের যদি এক থেকে দশের ভেতর কোনো সংখ্যা ধরতে বলা হয় সে মাঝখানেরটা ধরে। সে কখনো এক ধরে না বা

দশ ধরে না। তুমি একজন বোকা মানুষ। বোকা এবং বেকার, সংক্ষেপে হলো বোবে। ইংরেজিতে হবে BB.

মতিন থার্মোমিটার হাতে নিল। মানুষটা ভুল বকতে শুরু করেছে। তার জ্বর আবার দেখা দরকার।

মতিন।

জি চাচাজি।

জানালা দরজা সব খুলে দাও। নিঃশ্বাসের কষ্টটা বাড়ছে।

মতিন জানালা খুলল! বৃষ্টি খুব বেড়েছে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ঢুকছে। আজিজ সাহেব হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তার বুক হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। চোখ রক্তবর্ণ।

তৌহিদা নিজের ঘরে বসে আছে। তার গায়েহলুদ হয়ে গেছে। হলুদের মান ও সম্পন্ন। হলুদ স্নান মনে হয় ভালো হয় নি। গা থেকে কাঁচা হলুদের গন্ধ আসছে। গন্ধটা তৌহিদার ভালো লাগছে। গন্ধটার মধ্যেই যেন একধরনের রহস্য।

গায়েহলুদের বাড়িতে লোকজন থাকবে, হৈচৈ হবে। গান বাজনা হবে। সরকম কিছুই হচ্ছে না। তৌহিদা তার কলেজের কোনো বান্ধবীকে কিছু বলে নি। তার লজ্জা লাগছিল, বান্ধবীরা এসে দেখবে ফকির ফকির গায়েহলুদ। তারা হাসাহাসি করবে। দরকার কী? তার নিরিবিলি

গায়েহলুদই ভালো। নিরিবিলি গায়েহলুদ নিরিবিলি বিয়ে। তার মন বলছে একদিন তার অনেক টাকা-পয়সা হবে। নিজের ফ্ল্যাট বাড়ি থাকবে। লাল রঙের একটা গাড়ি থাকবে। তার ছেলেমেয়েরা গাড়িতে করে স্কুলে যাবে। তখন সে বড় বড় অনুষ্ঠান করবে। ছাদে শামিয়ানা খাঁটিয়ে বড় মেয়ের জন্মদিন। কিংবা তাদের ম্যারেজ ডে।

এই যে সে এখন জানালার পাশে বসে বৃষ্টি দেখছে তার তো মোটেও খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। একা আছে বলেই সে সুন্দর সুন্দর চিন্তা করতে পারছে। বিয়ের রাতে সে কী করবে এটা নিয়ে সে অনেকবার ভেবেছে। একেকবার একেকরকম করে ভেবেছে। আজ আবার ভাববে। আজকের ভাবনাটা হবে আরেকরকম। তৌহিদা ভাবতে বসল। সে ঠিক করল বিয়ের রাতে সে জবুথবু হয়ে থাকবে না। লজ্জায় নুয়ে পড়া লবঙ্গ লতিকা না। সে ফুটফট করে। কথা বলবে যেন মানুষটা চমকে যায় এবং ভাবে এই মেয়ে তো মুখ ফুটে একটা কথাও বলত না। আজ এমন ফটফট করছে কেন? ব্যাপার কী?

মানুষটা ঘরে ঢুকছে। সে বসে আছে খাটে। সে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে, কিন্তু লক্ষ রাখছে লোকটা কী করছে। লোকটা দরজা বন্ধ করে তার দিকে তাকাল। সে তখন হাই তুলতে তুলতে এবং সামান্য পা নাচাতে নাচাতে বলল, অ্যাই, কয়টা বাজে একটু দেখ তো!

লোকটা থতমত খেয়ে ঘড়ি দেখে বলল, এগারোটা।

সে তখন বলবে, সর্বনাশ, এত রাত হয়ে গেছে। কাল সারারাত আমার ঘুম হয় নি। আজ না ঘুমালে শরীর খারাপ করবে। ভয় নেই, বেশিক্ষণ ঘুমাব না। দুঘণ্টা ঘুমাব। তুমি ঘড়ি হাতে আমার পাশে বসে থাকবে। দুঘণ্টা পর আমাকে ডেকে দেবে। তখন আমরা গল্প করব। পারবে না?

লোকটা বিস্মিত গলায় বলবে, পারব।

এখন তুমি পাঁচ মিনিট চোখ বন্ধ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাক। সকাল থেকে বেনারসি শাড়ি পরে আছি, গরমে ঘেমে যাচ্ছি। আমি শাড়ি বদলাব। তাকাও অন্যদিকে। চোখ বন্ধ। খবরদার, আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না। Good boy.

লোকটা চোখ বন্ধ করে বসে আছে। সে শাড়ি বদলাচ্ছে। শাড়ি বদলাতে বদলাতে হালকা মেজাজে গল্প করছে, অ্যাই শোন, তোমার এক বান্ধবী আছে না, নিশু না-কি শিশু নাম। ওকে একদিন খবর দিয়ে এনো তো।

লোকটা বলবে, কেন?

সে বলবে, আমি ঐ শাকচুন্নিটার দুই গালে দুটা থাপ্পড় দেব।

এইসব কী ধরনের কথা বলছ?

আমার কথা শুনতে ভালো লাগছে না, ঐ শাকচুন্নির কথা শুনতে ভালো লাগছে? যাও তাহলে আর কথা বলব না। এখন চোখ খোল।

লোকটা চোখ খুলে হয়ে যাবে হতভম্ব। কারণ সে গা থেকে বেনারসি শাড়ি ঠিকই খুলেছে, তবে অন্য শাড়ি পরতে ভুলে গেছে।...

চিন্তাটা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। খারাপ দিকে। তৌহিদার গা ঝিমঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। আচ্ছা সে কি খুব খারাপ মেয়ে? সে এত খারাপ মেয়ে। কীভাবে হয়ে গেল! সে বিছানা থেকে নামল। একগ্লাস পানি খাবে। মাথার তালুতে সামান্য পানি দেবে।

রান্নাঘরের দিকে যাবার আগে সে সালেহার ঘরে উঁকি দিল। সালেহা পা। ছড়িয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসা। তার দৃষ্টি স্থির। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। তৌহিদা বলল, বুবু, আপনার কি শরীর খারাপ?

সালেহা অস্পষ্টভাবে বললেন, হুঁ।

পায়ে তেল মালিশ করে দেব?

না।

পানি খাবেন? একগ্লাস পানি এনে দেই?

না।

সালেহা ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তার ধারণা যে-কোনো সময় তার নিঃশ্বাস আটকে যাবে। তার হাতের মুঠিতে একটা কুঁচকানো কাগজ। মতিনের লেখা চিঠি। মতিন লোক দিয়ে এই চিঠি তার দুলাভাইয়ের ফার্মেসিতে পাঠিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে ফার্মেসির সেলসম্যান এসে চিঠি দিয়ে গেছে। মতিন লিখেছে–

আপা,

আমি বিয়েটা করতে পারব না! আমি বিয়ে করা টাইপ পুরুষ না। পাকেচক্রে রাজি হয়ে বিরাট ঝামেলা করে ফেলেছি। আমি তৌহিদার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

মতিন

মেইন গ্রিডে কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকে ঢাকা শহরে ইলেকট্রিসিটি নেই। অন্ধকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। বৃষ্টি দুপুর থেকেই পড়ছিল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় যুক্ত হয়েছে সন্ধ্যার পর। মতিন মোমবাতি কিনে এনেছে। তার টেবিলে দুটি মোমবাতি। সে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে। নদ্দিউ নতিমকে নিয়ে নতুন প্রবন্ধে হাত দিয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম–

নদ্দিউ নতিমের ব্যক্তিগত জীবন
প্রথম বিবাহ বিষয়ক জটিলতা

এই প্রবন্ধে নদ্দিউ নতিম বিয়ের আসর থেকে হঠাৎ কী কারণে উঠে আসেন এবং সেই রাতেই পর পর তিনটি দীর্ঘ কবিতা লিখেন তার বর্ণনা আছে। নদ্দিউ নতিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি কেন বিয়ের আসর থেকে উঠে এলেন? তিনি জবাব দিলেন, এক স্ত্রী থাকলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ বৈধ না। কবিতা আমার স্ত্রী ও প্রণয়িনী। যেদিন থেকে আমার জীবনে কবিতা থাকবে না শুধু সেদিনই আমি দ্বিতীয় বিবাহ নিয়ে চিন্তা করব।

মতিনকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে। বিয়ে উপলক্ষে সে চুল কাটিয়েছে। চুলে শ্যাম্পু দিয়েছে। তার গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। মোমের আলোতে পাঞ্জাবি চকচক করছে।

প্রবন্ধের শুরুতেই নিশুর টেলিফোন। মতিন টেলিফোন ধরল।

হ্যালো, তোমাদের ওদিকে কি ঝড় হচ্ছে?

মতিন বলল, ঝড় না হলেও বাতাস হচ্ছে। জানালা খটখট করছে।

আজ তো তোমার বিয়ে?

হুঁ।

আমি বলেছিলাম তোমার বিয়েতে থাকব! থাকতে পারছি না।

অসুবিধা নেই।

কেন থাকতে পারছি না জানতে চাইলে না?

থাকতে পারছ না এটাই বড় কথা। কারণ জেনে কী হবে! যুদ্ধে কামান দাগা হয় নি এটাই মুখ্য। কেন দাগ হয় নি এটা গৌণ।

বিয়ে কোনো কামান দাগাদাগি না। মতিন শোন, আমি তোমার বিয়েতে যেতে পারছি না, কারণ বাবাকে ক্লিনিকে ভর্তি করিয়েছি।

কেন?

উনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। শেষে এমন হলো নিঃশ্বাস নিতে পারেন না।

এখন কী অবস্থা?

এখন অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। মতিন শোন, তোমার স্ত্রীর জন্যে আমি একটা উপহার কিনে রেখেছি। গলার এবং কানের একটা সেট।

গলার এবং কানের সেট মানে কী?

গয়না।

সোনার গয়না?

গয়না তো সোনারই হবে।

দাম কত?

উপহারের দাম এবং চাকরির বেতন জিজ্ঞেস করতে হয় না, এটা জানো।?

জানি। কৌতূহল সামলাতে পারছি না।

উনিশ হাজার সাতশ টাকা।

কী সর্বনাশ, এত দাম!

সেটের অনেক দাম হয়, এটা মোটামুটি কম দাম। বাবা টাকাটা আমাকে দিয়েছেন। উনি চাচ্ছিলেন তোমার বিয়েতে যেন দামি কিছু দেয়া হয়। বাবা যে তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করেন, এটা তুমি জানো?

জানি। বরযাত্রী কখন রওনা হবে?

ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে তো, টাইম ঠিক থাকবে বলে মনে হয় না। দেরি হতে পারে।

তোমার পক্ষে কি সম্ভব ক্লিনিকে এসে আমাদের উপহারটা নিয়ে যাওয়া? তোমার স্ত্রী বিয়ের দিন গয়নাটা পরল। আমাদের ক্লিনিকটা কিন্তু তোমার মেস থেকে দূরে না।

ঠিক আছে, চলে আসছি।

তুমি কি তোমার স্ত্রীকে গয়না টয়না কিছু দিচ্ছ?

পাগল! আমি গয়না পাব কোথায়!

তোমাকে একটা ছোট্ট উপদেশ দেই?

দাও।

তোমার স্ত্রীকে আমাদের এই গয়নার সেটটা দিয়ে বলল এটা তুমি দিয়েছ।

তাতে লাভ?

স্বামীর দেয়া উপহার স্ত্রীর কাছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তুমি জানলে কীভাবে? তুমি তো বিয়ে করো নি।

আমি বিয়ে না করলেও আমার মা বিয়ে করেছিলেন। মাকে দেখেছি বাবার দেয়া সামান্য দুগাছি সোনার চুড়ি তিনি কীভাবে সারাজীবন যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছেন।

সেই দুগাছি চুড়ি কোথায়?

ট্রাংকে তোলা আছে। মা বলে দিয়েছেন আমার বিয়ের দিন আমাকে এই দুগাছি চুড়ি পরতে হবে। কথা বলে সময় নষ্ট করছ। তুমি টেলিফোন রেখে চলে এসো। ঠিকানাটা মনে রেখ– চৌধুরী ক্লিনিক। আঠারো বি মালিবাগ। পেট্রোল পাম্পের গলি। মনে থাকবে?

থাকবে।

মতিন টেলিফোন রেখে লিখতে বসল। আজ লেখার মুড এসেছে। সবসময় এরকম আসে না।

নদ্দিউ নতিম বাড়ি ফিরলেন বিষণ্ণ হৃদয়ে। তিনি লেখার টেবিলে বসলেন। দুটা মোমবাতি জ্বালালেন। মনে মনে ভাবলেন, মোমবাতি দুটির একটি পুরুষ অন্যটি রমণী। এরা দুজন

আলো জ্বেলে একে অন্যকে পথ দেখাচ্ছে। হঠাৎ পুরুষ মোমবাতির আলো নিভে গেল। এখন শুধু মেয়েটির আলো জ্বলছে। পুরুষ তাকিয়ে আছে আলোর রমণীর দিকে। নদ্দিউ নতিমের হৃদয়ে কবিতা ভর করল। তিনি লিখলেন তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা কে কথা কয়?

ক্লান্ত দুপুর, মধ্য রজনীতে
প্রথম সকাল প্রথম সন্ধ্যারাতে
কে কথা কয়
ফিসফিসিয়ে আমার কথার সাথে?
তাকে চিনি
সত্যি চিনি না-কি?
তাকে চেনার কতটুকু বাকি?
নাকি সে স্বপ্নসম ফাঁকি?
...

মতিন ফুঁ দিয়ে একটি মোমবাতি নিভিয়ে দিল। নদ্দিউ নতিম একটি মোমবাতি জ্বেলে কবিতা লিখেছেন। সে দুটি জ্বালাতে পারে না। ।

কাজি সাহেব রাত এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে গেলেন। বাড়তি সময় বসিয়ে রাখার জন্য কাজি সাহেবকে আলাদা টাকা দিতে হলো। তাকে বাড়ি ফেরার ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হলো।

হাবিবুর রহমান প্লাস্টিকের বাটিতে কাজি সাহেবের জন্যে খাসির মাংসের তেহারি দিয়ে দিলেন। তৌহিদার বিয়ে উপলক্ষে তিনি বাবুর্চি দিয়ে খাসির মাংসের তেহারি রান্না করিয়েছেন। কাজি সাহেব চলে যাবার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভেবেছেন মতিন তার মত বদলাবে। ট্যাক্সি করে বাসায় চলে এসে মাথা নিচু করে বলবে, সরি। হাবিবুর রহমানের মতে মতিন তার বোনের কাছে চিঠিটি লিখে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। তারপরেও সে চলে এলে তিনি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

তৌহিদা বিয়ের সাজ-পোশাক খুলে সাধারণ ঘরে পরার শাড়ি পরেছে। সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে। চোখের কাজল পুরোপুরি যায় নি। দুটি চোখেই কাজল লেপ্টে তাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

তৌহিদার খুবই ক্ষিধে লেগেছিল। সে হাবিবুর রহমানের সঙ্গে সহজভাবেই খেতে বসল। সালেহা কিছু খাবেন না। তার শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছে। সন্ধ্যাবেলায় দুবার বমি করে তিনি নেতিয়ে পড়েছেন! গলা দিয়ে স্বর বের হচ্ছে না।

হাবিবুর রহমান তৌহিদার প্লেটে তেহারি তুলে দিতে দিতে বললেন, মন। খারাপ করিস না। বিয়েশাদি আল্লাহ পাকের হাতে। তিনি পাঁচটা জিনিস নিজের হাতে রেখেছেন, ধন-দৌলত, রিজিক, হায়াত, মউত এবং বিবাহ। যখন কারো বিয়ে ভেঙে যায় তখন বুঝতে হয় আল্লাহপাক চান না বিয়েটা হোক। বুঝেছিস?

তৌহিদা বলল, বুঝেছি ভাইজান।

হাবিবুর রহমান বললেন, যে সব মেয়ের বিয়ে ভেঙে যায় তাদের পরে খুবই ভালো বিবাহ হয় এটা পরীক্ষিত তোর ইনশাল্লাহ এমন বিয়ে হলে যে, অঞ্চলে সাড়া পড়ে যাবে। বুঝেছিস?

জি।

আর মতিনের জন্যে আমি কী ব্যবস্থা করে রেখেছি শুনে রাখ। তাকে যদি কানে ধরে আমি দশবার উঠবোস না করাই আমার নাম হাবিবুর রহমান না। আমার নাম হাবা রহমান। ভোতা দায়ে ধার উঠলে মারাত্মক ব্যাপার হয়। ভোতা দায়ে ধার উঠে না। একবার উঠে গেলে সর্বনাশ। চারিদিকে কাটাকাটি। আমি হলাম ভোতা দা। মতিনের কী অবস্থা হয় দেখ। দেখ আমি কী করি।

কিছু করতে হবে না ভাইজান।

অবশ্যই করতে হবে। আমি ছাড়ার পাত্র না। তৌহিদা শোন, তুই আজ একা ঘুমাবি না। তোর বুবুর সাথে ঘুমাবি। একা ঘুমাতে গেলে সারারাত ফুস ফুস করে কাঁদবি। এইসব চলবে না।

ভাইজান, কোনো সমস্যা নেই। আমি কাঁদব না।

গুড। ভেরি গুড। তেহারি কেমন হয়েছে বল?

ভালো হয়েছে।

ভালো তো হবেই, এক্সট্রা ঘি দিতে বলেছি।

তৌহিদা তার ঘরে ঘুমুতে গেল। এই ঘরেই বাসর হবার কথা ছিল। ঘর সামান্য সাজানো হয়েছে। তেমন কিছু না। বিছানার চারদিকে বেলিফুলের ঝালর। কিছু লাল-নীল বেলুন। বিছানার উপর গোলাপের পাপড়ি ছিটানো।

একা একা গোলাপের পাপড়ির উপর শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। তৌহিদার খুবই ক্লান্তি লাগছে। এখন আর বিছানা ঝাড়তে ইচ্ছা করছে না। সে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আর তখনই শুনল কলিংবেল বাজছে। হাবিবুর রহমান বললেন, কে?

বাইরে থেকে মতিন বলল, দুলাভাই আমি।

কী চাও?

কী আশ্চর্য কথা দুলাভাই! আজ না আমার বিয়ে!

আমার সঙ্গে ফাজলামি কর? একঘণ্টা আগে কাজি চলে গেছে।

দরজাটা খুলুন দুলাভাই।

দরজা অবশ্যই খুলব। তারপর দশবার তোমাকে কানে ধরে উঠবোস করাব।

তৌহিদা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দরজা খোলার শব্দ শুনল। তারপর শুনল তার ভাইজানের কঠিন গলা।

কোনো কথা নেই। উঠবোস। কানে ধরে উঠবোস। আগে কানে ধরে উঠবোস, তারপর কথা। এক, দুই, তিন...

তৌহিদা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। এটা কোনো কথা? বরকে কেউ কানে ধরে উঠবোস করায়? ভাইজানের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! তৌহিদা দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে চারদিকে সুনসান নীরবতা। পুরো বাড়ি অন্ধকার। সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। কেউ আসে নি।

৯. হ্যালো মতিন

হ্যালো মতিন,

তোর সর্বশেষ চিঠিতে জানলাম তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস। কনের নাম তৌ। এমন অদ্ভুত নামের মেয়ে তুই জোগাড় করলি কোথেকে? নাম শুনেই মেয়েটিকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। আচ্ছা, ওর নাক কি চাপা? উপজাতীয় মেয়েদের এরকম এক অক্ষরের নাম হয়? তোর তৌ কি এরকম কেউ?

চিঠি যখন পাবি তখন আমার হিসেব মতো তোদের বিয়ে হয়ে গেছে। তবে তোর বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। তোকে যতটুকু চিনি তুই বিবাহ করিয়া সুখে ঘর-সংসার করিতে লাগিল টাইপ না। নদ্দিউ নতিম সাহেব কি বিবাহ করেছিলেন? ভালো কথা, নদ্দিউ নতিম সাহেবের। নতুন কিছু কি বের হচ্ছে? এসেছে কোনো আইডিয়া? তুই তৌকে নিয়ে (যদি বিয়ে সত্যি সত্যি হয়ে গিয়ে থাকে) আমার এখানে হানিমুন করতে চলে আয়। দুজনে মিলে Tree house-এ থাকবি। গাছের উপর থেকে পৃথিবী দেখবি। গাছ-ঘরে কাগজ-কলম দেয়া থাকবে। তুই নতুন প্রবন্ধ ফাদবি–নদ্দিউ নতিমের বৃক্ষজীবন। তবে শোন, আমার এখানে এলে কিন্তু ফিরে যেতে পারবি না। One way ticket. এখানেই থেকে যাবি। শুরু হবে আমাদের জঙ্গল জীবন।

এখন বলি আমার খবর। মাসি-পিসি পুরোপুরি পোষ মেনে গেছে। এরা নির্বিকার ভঙ্গিতে আমার ঘরে ঢোকে। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে। ধমক দিলে বিরক্ত হয়ে তাকায়। আমার কিছু কথাবার্তা বুঝতেও পারে। যেমন আমি যখন বলি–Get lost. ওরা ঘর ছেড়ে চলে

যায়। যদি ডাক দেই মাসি। মাসি উঁকি দেয়। পিসি বললে পিসি উঁকি দেয়। একদিন পিসির হাতে একটা ভেজা টাওয়েল দিয়ে বললাম, তারের উপর শুকাতে দিয়ে আস। বলে তারের দিকে ইশারা করলাম। সে ঠিকই ভেজা টাওয়েল শুকাতে দিল। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে। আবার এও হতে পারে যে, এদের যথেষ্ট বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে! একজন ভালো ট্রেইনার পেলে কাজ হতো, ওদের শেখাতে পারত। মাসির শেখার আগ্রহ তেমন নেই, তবে পিসির আছে।

মাসি-পিসি প্রসঙ্গ শেষ। এখন আসি হস্তীশাবক প্রসঙ্গে। আমাদের এখানে মাঝেমধ্যেই বার্মার ঘন জঙ্গল থেকে হাতির পাল আসে। বিষয়টা আনন্দময় না, ভীতিকর। বন্যহাতি ভয়ঙ্কর প্রাণী। এরকম একটা হাতির পাল খাগরাছড়িতে এসেছিল। এরা চলে যাবার পর দেখা গেল একটা হাতির বাচ্চা ফেলে চলে গেছে। হাতির পাল এই কাজ কখনো করবে না। এরা শিশু ফেলে চলে যাবে না। তারা কাজটা করল, কারণ হাতির বাচ্চার পা কী কারণে যেন। ভেঙে গেছে। তার হাঁটার ক্ষমতা নেই।

আমি হাতির বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছি। বান্দরবান থেকে পশুডাক্তার আনিয়ে হাতির পায়ে প্লাস্টার করানো হলো। পশুডাক্তার বললেন, কোনো লাভ হবে না, হাতি-ঘোড়ার পা ভাঙলে সারে না। তারা ভাঙা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায় বলে পা কখনো জোড়া লাগে না। আমি দড়ি দিয়ে হাতির বাচ্চাটাকে এমনভাবে বাঁধার ব্যবস্থা করলাম যেন উঠে দাঁড়াতে না পারে। তার জন্যে দৈনিক বিশ লিটার দুধ বরাদ্দ। করা হলো। এর মধ্যে একরাতে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটল। শো শো শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি হাতির বাচ্চার কাছে পাহাড়ের মতো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে। দুপা এগিয়ে থমকে গেলাম। পর্বত সদৃশ জিনিসটা যে হাতি তা বুঝতে পেরে কলিজা শুকিয়ে গেল। আমার ধারণা এটা বাচ্চা হাতিটার মা।

গন্ধ শুকে শুকে চলে এসেছে। এ কী করবে কে জানে? তার সন্তানকে বেঁধে রেখেছি, এই অপরাধে সে অনায়াসেই চারদিক লণ্ডভণ্ড করে আমাকে পায়ের নিচে ফেলে মেরে ফেলতে পারে। হাতি যত বুদ্ধিমানই হোক তার বোঝার কথা না যে আমি তার সন্তানের মঙ্গলের কারণেই তাকে বেঁধে রেখেছি।

তুই লেখকমানুষ। দৃশ্যটা কল্পনা কর। আমি একটা বন্য হাতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। আকাশে চাঁদ। চাঁদের আলোয় সবকিছু রহস্যময় মনে হচ্ছে। বাচ্চা হাতিটাকে হাতি শুড় দিয়ে আদর করছে। পশুর আদরের এই দৃশ্য। থেকেও চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছি না। অথচ আমার উচিত দ্রুত কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া।

মা-হাতিটা পনেরো বিশ মিনিট থেকে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এখন মা হাতিটা রোজই রাতে একবার করে আসছে। আমি একবার চেষ্টা করলাম কাছে যেতে। মা-হাতি বিকট গর্জন করল, আমি তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে এলাম। হস্তী এবং হস্তীশাবকের এই অদ্ভুত দৃশ্য তুই এসে দেখে যা। তুই লেখকমানুষ, তোর দেখায় কাজ হবে। আমি জংলিমানুষ, আমার দেখা না-দেখা একই।

এখন তোকে কিছু ভালো খবর দেয়া যাক। তিন হাজার কফির চারা লাগিয়েছিলাম। দুইশ নষ্ট হয়েছে। বাকিগুলোর অবস্থা বেশ ভালো। বৃষ্টির পানি পেয়ে তরতর করে উঠছে। দেখলেই মন ভরে যায়। তোকে একবার বলেছিলাম না। আমার এলাকায় লেকের মতো জায়গা আছে। শীতের সময় তেমন পানি থাকে না, বর্ষায় পানি আসে। এই লেক কানায় কানায় পূর্ণ। আমি কোনো মাছ ছাড়ি নি, তারপরেও প্রচুর মাছ। মাছ কোত্থেকে এসেছে কে জানে।

আমি লেকটার নাম দিয়েছি আমজাদ লেক। আমজাদ স্যারকে তোর মনে আছে না? স্কুলের অঙ্ক স্যার। আমাকে খুবই আদর করতেন। ক্লাসে ঢুকে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতেন। একটা কথা এখনো কানে ভাসে। ক্লাসে এসে বললেন–যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের অঙ্ক হলো নকল অঙ্ক। আসল অঙ্ক অন্যখানে। সেই অঙ্ক ঠিকমতো করবি। আমি বললাম, স্যার, আসল অঙ্কটা কী?

স্যার বললেন, তুই একজনের জন্যে ভালো কিছু করলি, কিছু যোগ হলো। মন্দ করলি বিয়োগ হয়ে গেল। আবার খুব ভালো কিছু করলি হয়ে গেল গুণ... মৃত্যুর সময় যদি দেখা যায় ফলাফল শূন্য তাহলে বড়ই আফসোস। শূন্য ফলাফল হবে পশু-পাখির। মানুষকে শূন্য করলে চলবে না। মানুষ তো পশু না।

এসএসসি পরীক্ষার ফিস-এর টাকা জোগাড় হলো না বলে আমি লজ্জায় দুঃখে বাড়ি চলে গেলাম। এক ভোরবেলায় স্যার বাড়িতে এসে উপস্থিত। আমাকে বললেন, তোর ফিস-এর টাকা জোগাড় হয় নাই বলে তুই পালিয়ে বাড়িতে চলে এসেছিস? আমাকে বলবি না? তোর শাস্তি হচ্ছে, আমি তোকে কানে ধরে নিয়ে যাব। স্যার তাই করলেন। গয়নার নৌকায় আমরা যাচ্ছি, স্যার আমার কানে ধরে আছেন। লোকজন জিজ্ঞেস করে, ঘটনা কী? স্যার গম্ভীর গলায় বলেন, শাস্তি দিচ্ছি। আমার ছাত্র। অতি দুষ্ট।

মতিন, তুই নদ্দিউ নতিম সাহেবকে বল না, আমার স্যারকে নিয়ে একটা কবিতা লিখতে। কবিতাটা আমি শ্বেতপাথরে লিখে আমজাদ লেকের একপাশে বাঁধিয়ে দেব।

তুই ভালো থাকিস। আমার শরীরটা ভালো না। ম্যালেরিয়া হয়েছে। পাহাড়ি ম্যালেরিয়া খুব খারাপ জিনিস।

ইতি
কঠিন গাধা

পুনশ্চ : তোর লেখা নদ্দিউ নতিম সাহেবের আত্মজীবনী ইংরেজিতে অনুবাদ করছি। তোর এই লেখা একটি মহৎ সাহিত্যকর্ম হয়েছে সে-জন্যে না। রাতে আমার তেমন কিছু করার থাকে না। তবে অনুবাদ করে আরাম পাচ্ছি। লেখার শিরোনাম দিয়েছি। Autobiography of a Fictitious Poet. নামটার মধ্যে নীরোদ সি চৌধুরী গন্ধ আছে (Autobiography of an unknown Indian, পড়েছিস না?)। গন্ধ থাকুক। শিরোনাম আমার পছন্দ হয়েছে।

১০. কমল তার খেলনা সাজানো শেষ করেছে

বৃহস্পতিবার।

সন্ধ্যা সাতটা।

কমল তার খেলনা সাজানো শেষ করেছে। সে বসে আছে মাথা নিচু করে। তাকে খুবই অসুস্থ মনে হচ্ছে। বুধবার সকাল থেকে সে খাওয়া বন্ধ করেছে। তার ঘরের টেবিলে কয়েক রকমের স্যুপ, ফলের রস সাজানো আছে। যদি সে নিজের ইচ্ছায় কিছু খায়। সে পানি ছাড়া কিছুই খায় নি। তবে স্যুপের বাটির ঢাকনা তুলে দেখেছে তাকে কী দেয়া হয়েছে।

সালেহ ইমরান ছেলের ঘরে আছেন। ত্রিশ মিনিট সময় পার হয়েছে, এখনো দুজনের ভেতর কথাবার্তা শুরু হয় নি। সালেহ ইমরান নিজে কথা শুরু করতে চাচ্ছেন না। তিনি অপেক্ষা করছেন।

কমল প্রথম কথা শুরু করল। ক্লান্ত গলায় বলল, I am hungry.

সালেই ইমরান বললেন, তোমাকে খাবার দেয়া হয়েছে। খাও। এই খাবারগুলি পছন্দ না হলে বলো, অন্য খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

খাব না।

ক্ষিধে লাগলে খেতে হয়, এটা হলো নিয়ম। তুমিই আমাকে বলেছ, নিয়ম গড-এর তৈরি করা। আবার তুমিই নিয়ম ভাঙ্গছ।

সরি।

কার কাছে সরি? আমার কাছে?

কমল শান্তগলায় বলল, না। গড-এর কাছে।

তুমি তাহলে কিছু খাবে না?

না।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি যদি বলি তোমাকে মতিনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব, আমি যদি প্রমিজ করি, তাহলে কি খাবে?

কখন দেখা করাবে?

আগামীকাল সকালবেলা। মতিন জানিয়েছে, সে এ বাড়িতে আসবে না। কাজেই তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

তাহলে খাওয়া শুরু কর। Start with fruit juice.

আমি কাল সকালে খাব।

মতিনের সঙ্গে দেখা হবার পর খাবে, তাই তো?

হুঁ।

এর অর্থ হলো, তুমি আমার প্রমিজ বিশ্বাস করছ না। যে প্রমিজ বিশ্বাস করে, তার সঙ্গে প্রমিজ করা ঠিক না। আমি আমার প্রমিজ উঠিয়ে নিলাম।

তুমি উনার সঙ্গে আমার দেখা করাবে না?

দেখা করাব, কিন্তু প্রমিজ করছি না।

কমল টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। স্যুপের বাটির ঢাকনা তুলে এক চামচ স্যুপ মুখে দিল। সালেহ ইমরান বললেন, তোমার অন্য কিছু খেতে ইচ্ছা করলে বলো, আমি আনিয়ে দিচ্ছি।

কমল জবাব দিল না। সে অতি দ্রুত খাচ্ছে।

সালেহ ইমরান বললেন, স্যুপটা কি ভালো?

হ্যাঁ।

মতিনের সঙ্গে দেখা করা তোমার এত জরুরি কেন?

আমি তাকে একটা secret বলব। I have a secret.

আমাকে বলো।

না, শুধু তাকে বলব।

শুধু তাকে কেন?

সে আমার secret বুঝবে।

তোমার কী করে ধারণা হলো সে তোমার secret বুঝবে?

সে আমার মতো একজন।

তার মানে?

সে আমার মতো একজন।

ব্যাখ্যা কর।

সে আমার মতো একজন।

সালেহ ইমরান উঠে দাঁড়ালেন। কমল কথার পুনরাবৃত্তি শুরু করেছে। একে বলে Autistic childs repeatative mood. সে এখন একই কথা বলে যাবে।

ছেলে খাওয়া শুরু করেছে, এই খবরটা তিনি মুনাকে দিলেন। মুনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম! আমি ঠিক করেছিলাম ডাক্তারকে দিয়ে স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা করব। তুমি অসাধ্য সাধন কীভাবে করলে? তোমার magical words কী ছিল? আমাকে শিখিয়ে দিও।

সালেহ ইমরান জবাব দিলেন না। মুলা বলল, কমল আমার চেয়ে তোমার প্রতি বেশি অ্যাটাচড।

হতে পারে।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সে আমাকে পছন্দ করে না!

অটিজমের শিশুরা কী পছন্দ করে বা করে না এটা বোঝা কঠিন। তারা তাদের পছন্দ অপছন্দ গোপন রাখে।

মুনা বলল, তুমি এক কাজ কর, বসার ঘরে গিয়ে বসো। আমি কমলকে নিয়ে আসছি। ম্যাজিক শো শুরু হবে।

সালেহ ইমরান অবাক হয়ে বললেন, কিসের ম্যাজিক শো?

তুমি ভুলে গেছ? আজ ফারুকের ম্যাজিক দেখাবার কথা না!

সালেহ ইমরান বললেন, আজ বাদ থাক। শরীরটা ভালো লাগছে না।

শরীর ভালো লাগছে না, ম্যাজিক দেখলে ভালো লাগবে। বেচারা কবুতর টবুতর নিয়ে এসেছে।

কবুতর কেন?

ওর একটা খেলা আছে–Dove production. একটা খালি টিনের কৌটা থেকে কবুতর বের করে।

সালেহ ইমরান বললেন, আমার আজ কেন জানি কবুতর দেখতে ইচ্ছা করছে না।

তোমার ছেলে ম্যাজিক পছন্দ করবে। ছেলের জন্যে তুমি এটুকু করবে না?

ম্যাজিক শো শুরু হয়েছে। প্রথমেই টিনের খালি কৌটা থেকে কবুতর বের করার খেলা। টিনের খালি কৌটা সবাইকে দেখানো হলো। কমল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খালি কৌটার ভেতর সিল্কের একটা সাদা রুমাল ঢুকানো হলো। সেই রুমালটা হয়ে গেল ধবধবে সাদা একটা কবুতর।

কমল মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে কবুতরটার দিকে। কী সুন্দর কবুতর! টেবিলের এক কোনায় শান্ত হয়ে বসে আছে। উড়ে চলে যাচ্ছে না। চোখ দুটিও কী সুন্দর! কাচের পুতির মতো জ্বলজ্বল করছে। কমল তার মাকে নিচু গলায় বলল, মা, কবুতরটার নাম কী?

মুনা বলল, কবুতরটার কোনো নাম নেই।

কমল বলল, নাম নেই কেন?

পশু-পাখিদের নাম থাকে না।

কমল বলল, কেন পশু-পাখিদের নাম থাকবে না?

মুনা বলল, বিরক্ত করবে না। ম্যাজিক দেখ।

ম্যাজিশিয়ান ফারুক অনেকগুলি আইটেম দেখালেন। দড়ি কাটার খেলা। যতবার দড়ি কাটা হচ্ছে ততবারই জোড়া লেগে যাচ্ছে। লিংকিং রিং। একটা রিং আরেকটা রিং-এর ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অথচ রিং-এর মধ্যে কোনো ফাঁক ফোকর নেই। পিং পং বলের খেলা। একটি বল হয়ে যাচ্ছে দুটি বল। দুটি হয়ে যাচ্ছে তিনটি। তিনটি থেকে চারটি।

কমল ম্যাজিক দেখছে না। তার স্থির দৃষ্টি কবুতরটার দিকে। কবুতর যেদিকে তাকাচ্ছে সে ঠিক সেদিকেই তাকাচ্ছে। কবুতর তাকাল মাথার উপরের সিলিং ফ্যানের দিকে। কমলও সেদিকে তাকাল। একসময় সে বাবার দিকে ঝুঁকে এসে বলল, বাবা, আমি কি এই কবুতরটার নাম দিতে পারি?

সালেহ ইমরান বললেন, অবশ্যই পার।

কমল বলল, তার আগে আমাকে জানতে হবে এটা ছেলে কবুতর, না মেয়ে কবুতর।

এটা ছেলে না মেয়ে আমি জানি না। তুমি বরং এমন একটা নাম রাখ, যে নাম ছেলের জন্যেও চলে, মেয়ের জন্যেও চলে।

আমি ওর নাম রাখলাম Xodarap.

সুন্দর নাম। মানে কী?

মুনা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা তো কথাই বলে যাচ্ছ। ম্যাজিক দেখছ না। ফর গডস সেক, চুপ করবে?

পিতাপুত্র দুজনই চুপ করে গেল।

এখন শুরু হয়েছে আঙুল কাটার খেলা। একটা ধারালো ছুরি দিয়ে মাজিলিয়ান তার তর্জনী কেটে ফেলবেন। সেই আঙুল আবার জোড়া দেয়া হবে। মুনা বললেন, এই ম্যাজিকটা থাক। আমার কেমন যেন লাগে। মনে হয় রিয়েল। কাটা আঙুল জোড়া লাগবে না ভেবে টেনশন হয়।

ফারুক বললেন, এটাই সবচে ইন্টারেস্টিং আইটেম।

আঙুল কাটা ম্যাজিকের প্রস্তুতি চলছে। কমল এখনো তাকিয়ে আছে কবুতরের দিকে। সে বাবার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, বাবা, দেখ কবুতরটা টেবিলে পুপু করে দিয়েছে। ইন্টারেস্টিং না?

সালেহ ইমরান বললেন, হুঁ।

পুপু করার পর কবুতরটা একটু সামনে এসেছে।

হুঁ।

কেন বাবা?

জানি না কেন।

আমার ধারণা তারা পরিষ্কার জায়গা ছাড়া পুপু করে না।

সালেহ ইমরান চাপা গলায় বললেন, বাবা চুপ কর, তোমার মা আবার রাগ করবেন। ম্যাজিক দেখ।

ম্যাজিসিয়ান ফারুক তার তর্জনী কেটে ফেলেছে। গলগল করে কাটা আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। মুনা ভয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়েছেন। কমল এইসব কিছুই দেখছে না। তার দৃষ্টি কবুতর এবং কবুতরের পুপুতে নিবদ্ধ।

সে ভাবছে কবুতরটা কথা বলতে পারলে ভালো হতো। তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা যেত। যেমন, এই মুহূর্তে তার মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছে। কবুতরের পা আছে কিন্তু হাত নেই। হাতের বদলে ডানা। ডানা কি হাতের চেয়ে ইম্পোর্টেন্ট? মানুষের যদি হাতের বদলে ডানা থাকত তাহলে কেমন হতো? পৃথিবীতে এমন কোনো পাখি বা প্রাণী কি আছে যাদের হাতও আছে আবার ডানাও আছে?

রাতে ঘুমুবার সময় মুনা মুখে ফেসপ্যাক দেয়। সারা মুখে সাদা আস্তরণ, শুধু চোখ আর ঠোঁট বের হয়ে থাকে। তাকে তখন ভয়ঙ্কর দেখায়। রাতের পর রাত এই দৃশ্য দেখে সালেহ ইমরানের অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা। তিনি অভ্যস্ত হতে পারেন নি। বিছানায় যাবার আগ পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেন স্ত্রীর দিকে না তাকাতে। বিছানায় যাবার পর তাকে বাধ্য হয়েই স্ত্রীর দিকে তাকাতে হয়। স্বামী অন্যদিকে ফিরে ঘুমাবে এটা তিনি পছন্দ করেন না।

মুনা বলল, তুমি কি জানো ক্লিওপেট্রা মোটেই রূপবতী মহিলা ছিলেন না?

সালেহ ইমরান বললেন, এই তথ্য জানি না।

মুনা বলল, সারা পৃথিবীতে ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে মাতামাতি, অথচ সে ছিল আগলি।

আগলি?

হ্যাঁ, তার পা ছিল বাঁকা। ধনুকের মতো বাঁকা। সারা গাভর্তি লোম।

কে বলেছে? ফারুক বলেছে। তার পড়াশোনা ভালো। তার প্রিয় বিষয় হলো ইতিহাস।

ও আচ্ছা।

সে খুব মজার মজার ইতিহাসের গল্প জানে।

সালেহ ইমরান বললেন, ম্যাজিক শোর মতো একদিন তার ইতিহাস শোর আয়োজন করো। সে ইতিহাসের গল্প বলবে, আমরা শুনব।

ঠাট্টা করছ?

না, ঠাট্টা করছি না।

তোমার গলার স্বরে ঠাট্টা ভাব আছে।

সালেহ ইমরান সিগারেট ধরালেন। মুনা বলল, শোবার ঘরে সিগারেট ধরালে যে?

সালেহ ইমরান সিগারেট হাতে শোবার ঘরের বারান্দায় চলে এলেন। বারান্দা তার পছন্দের জায়গা। টব দিয়ে বারান্দা ঘেরা। টবভর্তি নানান ধরনের ফুলের গাছ। গাছগুলি যত্নে আছে বোঝা যায়। সতেজ পাতা ঝলমল করছে।

মুনা শোবার ঘর থেকে বলল, তুমি কি চা খাবে?

সালেহ ইমরান বললেন, না।

মুনা বলল, আমার খেতে ইচ্ছা করছে। তুমি যদি খাও তাহলে বারান্দায় বসে এককাপ চা খাওয়া যায়।

দিতে বলো।

চা খেতে খেতে তোমার সঙ্গে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব।

আজই করতে হবে?

হ্যাঁ আজই। জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপের জন্যে নিশ্চয়ই পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করার প্রয়োজন নেই।

না নেই।

সালেহ ইমরান বারান্দার বাতি নিভিয়ে বারান্দা পুরোপুরি অন্ধকার করে দিলেন। যেন বাইরে থেকে কেউ কিছুই দেখতে না পারে। তার ভয় মুনাকে নিয়ে। সে ঘুমুতে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। সে যখন বারান্দায় এসে চেয়ারে বসবে তখন সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ যে তার গায়ে কোনো কাপড় থাকবে না।

মুনা দুকাপ চা নিয়ে ঢুকল। সালেহ ইমরান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনার গায়ে কাপড় আছে। মুনা বলল, তুমি সবসময় লিকার চা খাও। এখন থেকে খাবে দুধ চা।

সালেহ ইমরান চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন, কেন?

দুধ চা লেবু চায়ের চেয়ে হাজার গুণ ভালো।

আমি তো এতদিন উল্টোটা জানতাম।

মুনা বলল, ভুল জানতে। চায়ের ভেতর আছে ট্যানিন। এটা একটা কার্মিনোজেন। যখন চায়ে দুধ দেয়া হবে তখন সেই দুধ ট্যানিনের সঙ্গে রি অ্যাক্ট করে একটা পানিতে দ্রবণীয় কম্পাউন্ড তৈরি করবে। তখন সেই কম্পাউন্ড দ্রুত শরীর থেকে ইউরিনের সঙ্গে বের হয়ে যাবে।

জটিল কেমিস্ট্রি। বলেছে কে? ম্যাজিসিয়ান ফারুক?

হ্যাঁ।

সে কি কেমিস্ট্রিও জানে নাকি?

কিছুটা তো জানেই।

Thats very good.

মুনা বলল, ঠিক করে বলো তো, তুমি কি ওকে হিংসা কর?

সালেহ ইমরান বললেন, ওকে হিংসা করার মতো কোনো কারণ কি তৈরি হয়েছে?

মুনা বলল, প্যাঁচানো জবাব দেবে না। বলো Yes কিংবা No।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার কাছ থেকে জরুরি কিছু কথা শুনব বলে আমরা মাঝরাতে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। এখন তোমার জরুরি কথা শুনি। পরে Yes কিংবা No বলব।

এখন Yes, No বলতে সমস্যা কোথায়?

সালেহ ইমরান বললেন, ম্যাজিশিয়ান ফারুককে নিয়ে কথা বলতে এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে না। তুমি তোমার কথাগুলি বলো, আমি শুনি।

মুনা কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। চায়ের কাপে পর পর দুবার চুমুক দিয়ে হালকা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে জীবন্যাপন করে আমি এখন আর কোনো আনন্দ পাচ্ছি না।

আগে কি পেতে?

মনে হয় আগেও পেতাম না।

এটাই তোমার জরুরি কথা?

হ্যাঁ। কেন, কথাগুলি কি তোমার কাছে তেমন জরুরি মনে হচ্ছে না?

সালেহ ইমরান জবাব দিলেন না। মুনা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আমি ভীষণ বোরড ফিল করি। মনে হয় আমি একজন Extra। আমার কিছু করার নেই। দৈত্য যেমন কলসির ভেতর বন্দি থাকে আমিও সেরকম বন্দি।

কলসির ভেতর থেকে তোমাকে বের করে আনার জেলে কি আছে?

তার মানে?

কথার কথা বললাম। বন্দি দৈত্যকে এক জেলে মুক্ত করেছিল।

আমার সঙ্গে হেঁয়ালিতে কথা বলবে না। দয়া করে আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝার চেষ্টা করবে। মানসিকভাবে আমাকে ঠিক রাখার দায়িত্ব তোমার।

কী করলে তুমি মানসিকভাবে ঠিক হবে?

এখনো বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হয় কিছুদিন আলাদা কোথাও বাস করলে সব ঠিক হবে।

তাই কর।

কমলকে রেখে যাব কীভাবে?

তাকে নিয়ে যাও।

না, তাকে নেব না। তাকে সঙ্গে নেয়ার মানে বাড়তি টেনশন নেয়া। আমি আমার নিজের টেনশনেই অস্থির।

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি যা চাইবে তাই হবে।

মুনা বলল, আমি যা চাইব তাই?

সালেহ ইমরান বললেন, অবশ্যই।

মুনা বলল, আমি যদি বলি গাড়ি বের কর, তোমাকে পাশে নিয়ে লং ড্রাইভে যাব। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলতে থাকবে সিলেটের দিকে। গাড়িতে গান। বাজবে। আমরা কোথাও থামব না, চলতেই থাকব। যখন ভোর হওয়া শুরু হবে তখন ঢাকার দিকে রওনা হবো। ড্রাইভার গাড়ি চালাবে না। আমি চালাব। তুমি পাশে বসে থাকবে। রাজি আছ?

সালেহ ইমরান চুপ করে রইলেন। জবাব দিলেন না। মুনা বলল, আমি যা চাইব তাই হবে এটা হলো তোমার কথার কথা। আমি যা চাইব তা কিন্তু হবে না। আমার যে চাওয়াতে তোমার সায় আছে তাই হবে।

সালেহ ইমরান হাতের সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। মুনা বলল, তোমার ঘুম পেলে ঘুমুতে যাও। আমি আরো কিছুক্ষণ রারান্দায় বসে থাকব। বারান্দায় বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে।
সালেহ ইমরান শান্ত গলায় বললেন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো, আমরা সিলেটের দিকে রওনা হবো।
মুনা অবাক চোখে তাকাল।

সালেহ ইমরান বললেন, আই মিন ইট।

১১. ভোরের স্বদেশ পত্রিকা

ভোরের স্বদেশ পত্রিকার শুক্রবারের সাহিত্য পাতায় নদ্দিউ নতিমের মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধটা ছাপা হয়েছে। মতিনের হাতে পত্রিকা। সকাল দশটা। তার ঘুম এখনো পুরোপুরি ভাঙে নি। সাপ্তাহিক ছুটির দিলে সে ঠিক করেই রাখে ঘুম ভাঙুক কি না-ভাঙুক দুপুর বারোটার আগে সে বিছানা থেকে নামবে না। চায়ের তৃষ্ণা পেলে আধশোয়া হয়ে চা খাবে। মেসের বাবুর্চি চুন্ন মিয়া তাকে চা দিয়ে যায়। চায়ের জন্যে মতিনকে টাকা-পয়সা দিতে হয় না। বিনিময়ে মতিনকে চুন্ন। মিয়ার চিঠিপত্র লিখে দিতে হয়। দেশে টাকা পাঠানোর মানি অর্ডার লিখে দিতে হয়। চুন্ন মিয়া ব্যাংকে একটি ডিপোজিট পেনসন স্কিম খুলেছে। তার কাগজপত্র লেখালেখির ব্যাপারও আছে।

মতিনের দ্বিতীয় দফা চা খাওয়া হয়ে গেছে। চুন্ন মিয়া যে ফ্লাক্স রেখে গেছে। সেখানে আরো এক কাপ চা আছে। শেষ কাপ চা মতিন খেয়ে ফেলবে কি-না এই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। মৃত্যুচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গে ভোরের চা যায় না। মতিন পড়তে শুরু করল। প্রবন্ধের শুরুটা বেশ নাটকীয়।

তখন গ্রীষ্মকাল। রৌদ্রোজ্জ্বল উজবেক আকাশ। মধ্যগগনের কঠিন সূর্য তার উত্তাপ পূর্ণ শক্তিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘশূন্য নীল আকাশ সূর্যের কটাক্ষে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে। গ্রীষ্মের তাপদাহে ধরণী ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত।

সেই প্রবল উত্তাপে ঘর্মাক্ত একটি শিশুকে দেখা যাচ্ছে। জলাশয়ের দিকে যেতে। শিশুর খালি গা। পরনে হলুদ রঙের হাফপ্যান্ট। জলাশয়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে শিশুটি তার

প্রতিবিম্ব দেখতে চায়। সেই শিশুটির নাম তিম। ঘটনার চল্লিশ বছর পর শিশুটি সারা বিশ্বে পরিচিতি পায় নদ্দিউ নতিম নামে। শৈশবে শিশুটির জলাধারে নিজের ছায়া দেখতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অনেক অনেক পরে ভাষা পেয়েছিল তার কবিতায়।

জলে কার ছায়া পড়ে
কার ছায়া জলে
সেই ছায়া ঘুরে ফিরে
কার কথা বলে?
কে ছিল সেই শিশু
কী তাহার নাম?
কেন সে ছায়ারে তার
করিছে প্রণাম।

তিম নামের শিশুটি জলে নিজের ছায়া দেখে কী কারণে জানি চমকালো। সেই চমকে তার পায়ের নিচের মৃত্তিকা এলোমেলো হলো। শিশুটি পড়ে গেল পানিতে। মুহূর্তে বিপুল জলরাশি ঘিরে ধরল তাকে। সে ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে। তলিয়ে যাচ্ছে হিমশীতল গহীনে। তখন কেউ যেন তার নাম ধরে ডাকল। দূরাগত শঙ্খধ্বনির মতো সেই ডাক–তিম, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?

মে আই কাম ইন?

হাত থেকে পত্রিকা নামিয়ে মতিন তাকাল দরজার দিকে। দরজার ওপাশে সালেহ ইমরান দাঁড়িয়ে আছেন। তার সঙ্গে কমল। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। তার হাত-পা নড়ছে

না। সে শক্ত হয়ে আছে। সে যেন কাঠের কোনো মূর্তি। মূর্তির মাথাভর্তি রেশমি চুলি। বাতাসে সেই চুলগুলি শুধু উড়ছে। মতিন বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, আসুন আসুন।

মতিনের খালি গা। সে অতি দ্রুত সার্ট গায়ে দিল। সার্টের বোতাম জায়গামতো বসল না। সার্টের একটা দিক বড়, একটা দিক ছোট হয়ে ঝুলবুল। করতে লাগল।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

মতিন বলল, জি জি।

খবর না দিয়ে চলে এসেছি, সরি। তোমার তো মনে হয় হাত-মুখ ধোয়া হয় নি। আমরা বসছি, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আসো। টেক ইউর টাইম।

মতিন কমলের দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন আছ কমল?

কমল জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে বন্ধ জানালার দিকে জানালার পাল্লায় দুটি টিকটিকি। টিকটিকি দুটি একই সঙ্গে একটু এগুচ্ছে আবার পিছিয়ে আসছে। কমল ওদের কর্মকাণ্ড দেখছে।

সালেহ ইমরান বললেন, কমলের কী না-কি একটা সিক্রেট আছে, সে তোমার সঙ্গে শেয়ার করবে।

মতিন সঙ্গে সঙ্গে বলল, অবশ্যই। অবশ্যই। আমাকে সামান্য কিছু সময় দিন। সময় কিছু বেশিও লাগতে পারে। আমাদের একটা মাত্র টয়লেট। সেটা

একতলায়। ছুটির দিনে টয়লেট খালি পাওয়াই সমস্যা।

ইউ টেক ইউর টাইম।

মতিন চলে গেছে। কমলের দৃষ্টি এখনো টিকটিকির দিকে। সালেহ ইমরান বললেন, আমি আমার প্রমিজ রক্ষা করেছি, আমাকে ধন্যবাদ দেবে না?

কমল বলল, ধন্যবাদ।

সালেহ ইমরান বললেন, কী দেখছ? টিকটিকি?

হুঁ। বাবা, ওদের কি কোনো নাম আছে?

ওদের একটাই নাম–টিকটিকি।

ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, ভাই-বোন সবারই এক নাম? টিকটিকি?

কমল শোন, মাঝে মাঝে তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষদের মতো কথা বলো। কখনো কখনো তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি বয়স্ক জ্ঞানবৃদ্ধ। আবার কখনো মনে হয় তিন-চার বছর বয়েসী শিশু। এই বয়সের শিশুও কিন্তু জানে যে টিকটিকিদের আলাদা নাম হয় না।

সেটা আমিও জানি।

তাহলে জিজ্ঞেস করছ কেন?

ওদের আলাদা নাম নেই এটা অন্যায়, এইজন্যে জিজ্ঞেস করছি। বাবা। শোন, আমি যখন আমার সিক্রেট বলব তুমি তখন আমার সামনে থাকবে না।

ঠিক আছে থাকব না।

মতিন ঘরে ঢুকল চা বিসকিট নিয়ে। সালেহ ইমরান কোনোরকম আপত্তি ছাড়াই চায়ের কাপ হাতে নিলেন। মতিন তার দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল। তিনি সিগারেট নিলেন। কমল মতিনের দিকে একঝলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে অস্পষ্ট গলায় বলল, তোমার ঘরের জানালায় যে দুটি টিকটিকি এদের কি কোনো নাম আছে?

মতিন বলল, অবশ্যই আছে। বড় যেটা দেখছ ওটা মেয়ে। মেয়েটার নাম ঘুতনি। আর রোগাটা ছেলে। ছেলেটার নাম ঘুতনা।

ওদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই?

না।

ছেলেমেয়ে হলে ওদের কী নাম রাখবে?

ছেলে হলে নাম রাখব ছে-ঘুতনা। মেয়ে হলে মে-ঘুতনি। ওদের যখন ছেলেমেয়ে হবে, ছে-ঘুতনার ছেলে হলে তার নাম হবে ছেছে-ঘুতনা। মেয়ে হলে মেমে-ঘুতনি।

তোমার নাম দেয়া ভুল হয়েছে। ঘুতনা-ঘুতনির ছেলে হলে তার নাম দেয়া উচিত ছেঘুতানাঘুতনি।

সালেহ ইমরান চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, এই আলোচনা বন্ধ থাকক। মতিন শোন, আমি ঘণ্টাখানিকের জন্যে কমলকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। একটা গাড়িও থাকল। কমলের কথা শেষ হলে তাকে তুমি একটু কষ্ট করে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। পারবে না?

মতিন বলল, পারব, তবে আপনি সময় বেঁধে দেবেন না। সে যতক্ষণ থাকতে চায় থাকুক। যখন সে চলে যেতে চাইবে আমি তাকে দিয়ে আসব। আমি যতদূর জানি সেভাবে করে আপনারা তাকে কখনো বাইরে নেন না। সে বাইরের লোকজন দেখুক। হৈচৈ শুনুক। এটা তার জন্যে ভালো হবে।

সালেহ ইমরান বললেন, কমলের মতো বাচ্চাদের নিয়ে Experiment করার যোগ্যতা কি তোমার আছে?

মতিন বলল, আমি Experiment করছি না। আমি তাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি।

সালেহ ইমরান বললেন, এই পরিচয় সে নিতে পারবে না।

মতিন বলল, আমি যেই মুহূর্তে দেখব সে নিতে পারছে না, আমি তাকে আপনার কাছে ফেরত দেব।

সালেহ ইমরান উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, ও.কে। থ্যাংক ব্যু ফর অ্যাভরিথিং।

মতিন বলল, কমল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

কমল বলল, কে চিৎকার করছে?

আমাদের মেসবাড়ির পেছনেই বস্তি। বস্তির লোকজন চিৎকার করছে।

কেন চিৎকার করছে?

কোনো একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে।

বিষয়টা কী?

বিষয়টা কী আমি জানি না।

চিৎকার শুনতে আমার ভালো লাগে না।

চিৎকার শুনতে কারোই ভালো লাগে না। চল বের হয়ে পড়ি। বের হয়ে পড়লে আর চিৎকার শুনতে হবে না।

না।

না কেন?

আগে আমাকে একটা কাগজ কলম দাও।

কী করবে?

আমি ঘোতনা ঘুতনিদের ছেলেমেয়েদের নাম ঠিক করব। অঙ্ক দিয়ে নাম।

অঙ্ক দিয়ে আমি মানে?

ঘোতনার সিম্বল হলো 1, ঘুতনি ০, 1 হলো male আর 0 Female. ওদের যদি ছেলে হয় তার সিম্বল হবে 1 (10)। 1 হলো male-এর সিম্বল, আর 10 হলো বাবা-মার সিম্বল। বুঝতে পেরেছ?

মতিন বলল, Rice water-এর মতো পরিষ্কার।

কমল বলল, Rice water কী?

মতিন বলল, Rice water হলো পান্তাভাত। খুব সহজ বিষয়কে আমরা বলি পান্তাভাত কিংবা ডালভাতের মতো সোজা।

আমাকে কাগজ-কলম দাও।

মতিন কাগজ-কলম দিল। কমল অতি দ্রুত লিখছে। তার চোখে-মুখে আনন্দ। মতিন একবার উঁকি দিল। তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

ঘোতনা = 1 ঘুতনি = 0

1
1(10)
1{1(10)0(10)}
1[1{1(10)0(10)}0{1(10)0(10)}]
Male = 1 Female = 0

0
0(10)
0{1 (10)0(10)}
0[1{1(10)0(10)}0{1(10)0(10)}]
মতিন বলল, তুমি তো বিরাট অঙ্ক ফেঁদে বসেছ।

কমল বলল, আমার আরো কাগজ লাগবে।

মতিন বলল, কাগজের সমস্যা নেই। ড্রয়ারভর্তি কাগজ। তুমি করছটা কী? 0101 এইসব কী?

নাম। তোমাকে বুঝিয়ে দেব?

কোনো দরকার নাই, অঙ্ক বুঝতে চাই না। স্কুলে যে স্যার আমাদের অঙ্ক পড়াতেন তার নাম গজনবী। তাঁকে সবাই ডাকত নেত্রকোনার যাদব। নেত্রকোনার যাদব স্যার বলতেন, একটা গরু যে অঙ্ক জানে আমি তাও জানি না। তুমি কি যাদব বাবুর নাম শুনেছ? বিরাট অঙ্কবিদ ছিলেন।

নাম শুনি নি।

সে-কী! তুমি এমন অঙ্কওয়ালা ছেলে, তুমি দি গ্রেট যাদববাবুর নাম শোন নি? তিনি এই দেশের মানুষ।

আমি রামানুজনের নাম শুনেছি।

তিনি আবার কে?

তিনি অঙ্ক জানতেন। He was born on 22nd December, 1887.

ও আচ্ছা। পুরনো লোক।

তিনি অনেকগুলি সিরিজ বের করেছিলেন। এর মধ্যে একটার যোগফল $2/\pi$।

বাহ ভালো তো!

সিরিজটা লিখব?

লিখতে পার। তবে কিছু লাভ হবে না। বুঝব না।

সিরিজটা দেখলে তোমার ভালো লাগবে। আলাদা একটা কাগজে লিখি?

লেখ।

কমল দ্রুত লিখল–

1-5(1/2)^3+9(1.3/2.4)^3-13(1.3.5/2.4.6)^3+... =2/π

মতিন বলল, খুবই ভালো লাগল। এইসব কি তোমার মুখস্থ না-কি?

কমল বলল, সিরিজ মুখস্থ করতে হয় না। মনে থাকে।

মতিন বলল, মানসঙ্কের নাম শুনেছ?

না।

আমাদের দেশে একসময় মানসঙ্ক বলে একধরনের অঙ্ক ছিল। মনে মনে করতে হতো। মানসঙ্কের নানান সূত্র ছিল। সূত্র মুখস্থ রাখতে হতো।

কমল আগ্রহ নিয়ে বলল, একটা বলো!

এক এক এগারো মাথে
একশত সাঁইত্রিশ দিয়া তাথে
কি করি পায়ে নাথ
পনেরো বাইশায় শূন্য সাত।

কমল বলল, এর অর্থ কী?

অর্থ ভুলে গেছি। আরেকটা শোন–

মাস মাহিনা যার যত
দিনে তার পড়ে কত?
টাকা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া
দুই ক্রান্তি হয়
আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি
শিবরাম কয়।

কমল বলল, আরেকটা বলো।

মতিন বলল, এটা হলো বাজার সদাই নিয়ে–

তৈল লবণ ঘৃত চিনি যাহা
কিনিতে চাই
মণ দরে সেরে টাকায়

আট গণ্ডা পাই।
পোয়া প্রতি দুই গণ্ডা
সেরে ছটাক জেনো
কহেন শুভঙ্কর
এই কথাটা মেনো।

কমল বলল, শুভঙ্কর কে?

উনিও একজন অঙ্কবিদ। তোমার মতো কেউ।

কমল বলল, আমি অঙ্কবিদ না।

মতিন বলল, এখন না হলেও একদিন হবে। তুমি ঘোতনা-ঘুতনির নাম নিয়ে যে অঙ্ক ফেঁদে বসেছ শুভঙ্কর নিজে এই অঙ্ক পারতেন কি-না কে জানে!

তুমি এখন আর কথা বলবে না। আমি নামের কাজটা শেষ করি।

কতক্ষণ লাগবে?

দুই তিন ঘণ্টা।

এতক্ষণ আমি কী করব?

আমি জানি না।

তুমি তাহলে একটা কাজ কর, দরজা বন্ধ করে গুটিগুটি করে লিখে সব কাগজ শেষ কর। আমি আমার একটা কাজ সেরে আসি।

কী কাজ?

আমার একটা বই বের হয়েছে। নদ্দিউ নতিমের বাজেয়াপ্ত নিষিদ্ধ গল্প। বইটার কপি নিয়ে আসব।

ঠিক আছে।

একা থাকতে সমস্যা আছে?

না।

তোমার গাড়ি থাকল। তোমার ড্রাইভার থাকল। চলবে?

হুঁ চলবে।

কাগজ যা আছে তাতে হবে? না আরো কিনে দিয়ে যাব।

আরো দিয়ে যাও।

তোমার যদি ক্ষিধে লাগে তার জন্যে কি খাবার কিনে দিয়ে যাব?

আমার ক্ষিধে লাগবে না।

এক বোতল পানি আর জুস কিনে দিয়ে যাই?

আচ্ছা।

আইসক্রিম খাবে?

খাব।

দুপুরে কী খাবে? পিৎজা?

হুঁ খাব।

মতিন বলল, তুমি যত অঙ্কই কর, তুমি যে বাচ্চা–বাচ্চাই আছ।

কমল জবাব দিল না। সে মহানন্দে 010101 লিখে কাগজ ভরিয়ে ফেলছে।

প্রকাশকের নাম (মতিনের ভাষায় গা প্রকাশক) সারোয়ার খান। তিনি মতিনকে দেখে বিরক্ত গলায় বললেন, আপনি কেমন লেখক বলেন দেখি! পনেরো দিন আগে বই বের হয়েছে, আপনি খোজ নিতে আসেন না। নতুন বই বের হলে লেখকরা আধাপাগলের মতো হয়ে যায়।

মতিন বলল, আমি তো লেখক না। আমি অনুবাদক। অনুবাদকের বইয়ের প্রতি আগ্রহ কম থাকে। বই কেমন হয়েছে?

লেখা কেমন হয়েছে সেটা আপনি বলবেন। প্রোডাকশন ভালো হয়েছে। বই চলছেও ভালো।

এর মধ্যে চলাও শুরু করেছে?

নাম দেখে লোকজন কিনছে, কভারে নেংটা মেয়ের ছবি।

কভারে নেংটা মেয়ে নাকি?

কথার কথা বললাম। নগ্ন ছবি শালীনভাবেই আছে। মূল লেখক নতিম না কী যেন নাম, তারও অপছন্দ হবে না। আপনি উনার ঠিকানা দিয়ে যান, কুরিয়ারে উনাকে দুই কপি বই পাঠিয়ে দেব।

মতিন বলল, উনাকে বই পাঠিয়ে কোনো লাভ নাই। অথর্ব হয়ে পড়েছেন। চোখেও দেখেন না। অন্ধ।

আহা, বলেন কী!

মতিনের বই পছন্দ হলো। সুন্দর ছাপা। কভারে নগ্ন মেয়ের ছবিটিও শিল্পী তুলির টানে সুন্দর এঁকেছেন। মেয়েটা কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে নিজেকে লুকাতে চাচ্ছে–এমন ছবি। মতিন বলল, বই সুন্দর।

সারোয়ার খান বললেন, আপাতত পাঁচ কপি বই নিয়ে যান। বেশি বই নিয়ে তো লাভ নাই। বন্ধু বান্ধবরা হাত থেকে নিয়ে নিবে।

দিন, পাঁচ কপিই দিন।

রয়্যালটির কিছু টাকাও দিচ্ছি। আমাদের প্রকাশনার নিয়ম রয়্যালটির টাকার একটা অংশ বই প্রকাশের দিন দেয়া হয়। মূল লেখকের জন্যে ১২% রয়্যালটি। অনুবাদ হলে ৮%। ঠিক আছে?

মতিন বলল, কবুল।

কবুল মানে কী?

কবুল মানে আমি ৮% রয়্যালটি কবুল করে নিলাম।

নিন টাকাটা রাখুন। এখানে তিন হাজার আছে। গুনে নিন। ভদ্রতা দেখিয়ে গুনে চলে যাবেন, পরে টেলিফোন করে বলবেন পাঁচশ কম ছিল তা হবে না।

মতিন টাকা গুনল। বইয়ের প্যাকেট হাতে নিল। কমল একা মেসবাড়িতে বসে আছে, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। সে ইয়েলো ক্যাব নিয়ে নিল। ভোরের স্বদেশের সাহিত্য সম্পাদক আজহার উল্লাহ সাহেবকে বইটার একটা কপি আজই দিয়ে দেয়া দরকার। শুধু বই না, বইয়ের সঙ্গে এক কার্টন সিগারেট। এই ভদ্রলোক খুব আগ্রহের সঙ্গে সিগারেট খান। একটা সিগারেট ধরাবার আগে প্যাকেট খুলে কটা সিগারেট আছে গুনে দেখেন।

এক কার্টুন সিগারেটের সঙ্গে একটা দামি লাইটার। তিন হাজার টাকা এইভাবেই খরচ করে ফেলতে হবে। নিজের জন্যে কিছু করা যাবে না। একটা গিফট কিনতে হবে কমলের জন্যে। কী গিফট? অবশ্যই অঙ্কের বই। যত জটিল হয় তত ভালো। জটিল অঙ্ক বইয়ের নামধাম আজিজ সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।

একটা কিছু কিনতে হবে নিশুর জন্যে। মহিলা জ্ঞানীদের জন্যে উপহার কেনা সহজ। গিফটের পেছনে একটা গল্প বানিয়ে বলতে হবে। মহিলা জ্ঞানীরা যাবতীয় গল্পগাথা বিশ্বাস করে। মতিন যদি রেললাইন থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে বলে পাল আমলের পাথর। পালবংশের রাজা দেবপাল-এর পুত্র শূরপাল মন্দির বানানোর জন্যে পাথর সংগ্রহ করেছিলেন। পাথরগুলিকে শুদ্ধ করার জন্যে তিনি দুধ দিয়ে ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমার হাতের পাথরটা তারই একটা।

এই কথা শুনে নিশু চোখ বড় বড় করে বলবে, বলো কী? পেয়েছ কোথায়?

একটা কিছু কিনতে হবে তৌ-এর জন্য। তৌ-এর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব। উপহার কিনে পাঠিয়ে দিতে হবে। তৌ-এর জন্য কী কেনা যায়? তার পছন্দ অবশ্যই শাড়ি। একবার রিকশা থেকে নামার সময় তার সবুজ রঙের শাড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। তৌ কেঁদেকেটে অস্থির। ভাব এরকম যেন তার হাত-পা ছিঁড়ে গেছে। একদিকে ঠিকই আছে। শাড়িকে মেয়েরা আলাদা কিছু ভাবে না। শরীরের অংশ হিসেবে ভাবে।

আজহার উল্লাহ অবাক হয়ে বললেন, এই সিগারেটের কার্টুন, এই লাইটার আমার জন্যে?

মতিন বলল, জি স্যার।

কারণটা বলো।

আপনি খুব আগ্রহ করে সিগারেট খান। একটা সিগারেট ধরাবার আগে প্যাকেট খুলে গুনে দেখেন কয়টা সিগারেট আছে। এইজন্যেই আনলাম।

আজহার উল্লাহ বললেন, আমি হার্টের রোগী, একবার স্ট্রোক হয়েছে। সিগারেট কমিয়ে খাওয়ার জন্যে এই ব্যবস্থা। সারাদিনে সাতটার বেশি খাব না ঠিক করা থাকে বলে সিগারেট গুনি।

স্যার, আপনার জন্যে একটা বই এনেছি।

আজহার উল্লাহ বিড়বিড় করে বললেন, নদ্দিউ নতিমের গল্পগ্রন্থ! মাশাল্লাহ। অবশ্যই মাশাল্লাহ। আমি চট করে মুগ্ধ হই না, তবে নদ্দিউ নতিম সাহেবের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ।

স্যার, বইটা আপনাকে উৎসর্গ করা।

আজহার উল্লাহ কিছুক্ষণ চুপ করে মতিনের দিকে তাকিয়ে থেকে উৎসর্গ পাতা খুললেন। সেখানে লেখা–

অনুবাদকের উৎসর্গ

জনাব আজহার উল্লাহ খান।

স্বর্ণ হৃদয়খণ্ড বক্ষেতে ধরি
যে-জন বসেছে একা
শতজন মাঝে
এই গল্পগ্রন্থখানি তাঁহাকেই সাজে।

আজহার উল্লাহ হাত থেকে বই নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, কাউকে বই উৎসর্গ করতে হলে তার অনুমতি নিতে হয়, এটা জানো?

না।

একটা নিম্নশ্রেণীর Hoax-এর সঙ্গে তুমি আমাকে যুক্ত করলে। কাজটা ঠিক হলো?

জি-না।

এতবড় মিথ্যা গোপন থাকবে না। একদিন প্রকাশিত হবে। তখন আমার কী হবে?

আপনার কিছু হবে না। কারণ আপনি মিথ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন না জেনে।

মিথ্যা এমন জিনিস তার সঙ্গে জেনে যুক্ত হওয়া না-জেনে যুক্ত হওয়া একই জিনিস।

স্যার, আমি উঠি?

দুটা মিনিট বসো। আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি চাকরি বাকরি কিছু কর না। ঠিক না?

জি।

সংসার কীভাবে চলে?

আমি একা মানুষ। আমার কোনো সংসার নেই।

একারও সংসার থাকে। তাকে খেতে হয়। কাপড় পরতে হয়। রাতে ঘুমাতে হয়।

স্যার, আমার এক বন্ধু আছে। সে আমাকে প্রতি মাসে তিন হাজার করে টাকা দেয়। এতেই চলে যায়।

বন্ধু প্রতিমাসে তিন হাজার করে টাকা দেয় কেন?

একবার তার আমি খুব বড় একটা উপকার করেছিলাম। এইজন্যে দেয়।

সে ঢাকায় থাকে?

জি-না। সে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম। বিশাল জায়গা-জমি কিনে হুলুস্থুল কাণ্ড করেছে।

এই বন্ধু তোমাকে মাসে তিন হাজার করে টাকা সারাজীবন দিয়ে যাবে?

জানি না দেবে কি-না। এখন পর্যন্ত দিচ্ছে। তার ইচ্ছা আমি তার রাজত্বে চলে যাই। ম্যানেজারির দায়িত্ব নেই।

তুমি যাচ্ছ?

জি-না। নদ্দিউ নতিম জঙ্গল পছন্দ করতেন না। তাঁর বিখ্যাত উক্তি–জঙ্গলের সন্ধানে তুমি কেন বাইরে যাবে? তোমার চারপাশের মানুষজনের মধ্যেই আছে ঘন অরণ্য।

আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না।

স্যার, আমি যাই।

আরেকটু বসো।

আরেকদিন এসে আপনার সঙ্গে গল্প করব। একটা বাচ্চাছেলে আমার জন্যে। অপেক্ষা করছে। আমাকে যেতে হবে। স্যার যাই?

যাও। একদিন আমার বাসায় এসো। আমার মেয়ে তোমাকে দেখতে চায়। তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে গল্প করেছি।

মতিন বলল, আমি কালই যাব।

কাল তুমি যাবে না। এটা আমি জানি। যেদিন ইচ্ছা হবে চলে এসো। ঠিকানাটা নিয়ে যাও। বাসা চিনবে কীভাবে?

মতিন বলল, ঠিকানা লাগবে না।

মতিনের ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগানো। ছিটকিনি অনেক উপরে। কমলের পক্ষে ছিটকিনি লাগানো সম্ভব না। সে নিশ্চয়ই চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে কাজটা করেছে। মতিন দরজায় টোকা দিয়ে বলল, কমল, আমি কি ভেতর আসব?

এখন না।

এখন না কেন?

আমি এখন আমার Secret-টা লিখছি। Secret লেখা শেষ হলে আসবে। আমি দরজা খুলে দেব।

ঠিক আছে, আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার বিখ্যাত অঙ্কটা কি শেষ হয়েছে?

কমল জবাব দিল না। মতিন মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। আকাশ ঘন নীল। ঢাকার আকাশ কখনো এত নীল হয় না। আকাশটাকে এখন মনে হচ্ছে উজবেকিস্তানের আকাশ, নদ্দিউ নতিমের ঘন নীল আকাশ। আকাশ নিয়ে কি তিনি কোনো কবিতা লিখেছেন? লেখার তো কথা। তার কাছে মানুষ এবং প্রকৃতি কখনো আলাদা কিছু ছিল না।

দরজা খুলে গেল। কমল ঘর থেকে বের হয়ে সহজ গলায় বলল, Secret টা লিখে তোমার টেবিলের ড্রয়ারে রেখেছি।

মতিন বলল, Doog করেছ।

আমি এখন বাসায় যাব। আমাকে বাড়িতে দিয়ে এসো।

চলো যাই। যাবার পথে পিৎজা খেয়ে গেলে কেমন হয়?

না।

না কেন? তুমি পিৎজা খেতে চেয়েছিলে।

এখন চাচ্ছি না।

তোমার কি মন খারাপ?

হুঁ।

কেন?

আমি আমার Secret তোমাকে বলছি এইজন্যে।

মতিন বলল, আমি তোমার Secret এখনো পড়ি নি। এখনো আমার টেবিলের ওভারে আছে। তুমি এক কাজ কর, Secret-টা সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার মন খারাপ, এটা আমার ভালো লাগছে না। ঠিক আছে?

কমল কঠিন গলায় বলল, No. সে হাঁটা শুরু করেছে। কমলের পেছনে পেছনে যাচ্ছে মতিন।

হঠাৎ কমল বলল, তোমাকে যেতে হবে না।

মতিন বলল, কেন?

তুমি তোমার ঘরে যাও। আমার Terces-টা পড়।

এখনই পড়তে হবে?

হ্যাঁ এখনই পড়তে হবে।

পড়ার পর কি আমার কিছু করণীয় আছে?

না।

তোমার গোপন কথা জেনে আমি চুপচাপ বসে থাকব?

হুঁ। তুমি তোমার ঘরে যাও।

তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

আচ্ছা।

গাড়িতে উঠতে উঠতে হঠাৎ কমল আগ্রহ নিয়ে বলল, কবুতরের পুপুর কালার কী তুমি জানো?

মতিন বলল, না।

কমল বলল, সাদা।

মতিন বলল, ও আচ্ছা, একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানলাম।

কমল বলল, ছাগলের পুপুর কালার কালো।

মতিন বলল, এটা জানি। মানুষেরটা হলুদ এটাও জানি।

কমল বলল, এমন কোনো প্রাণী কি আছে যার পুপু সবুজ?

জানি না।

খুঁজে বের করতে পারবে?

অবশ্যই পারব। চিড়িয়াখানার কিউরেটারকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার হেডকেও টেলিফোন করতে পারি। সবচে ভালো হয় যদি কাটাবনে চলে যাই।

কাঁটাবনে কী?

কাঁটাবনে পশুপাখি বিক্রি হয়। দোকানদাররা নিশ্চয়ই বলতে পারবে সবুজ রঙের হাগু কে করে।

তুমি কখন কাঁটাবনে যাবে?

আজই যেতে পারি।

থ্যাংক য়্যু।

কমল তার সিক্রেট দুই পাতায় লিখেছে। তার বয়েসী ছেলেমেয়েরা বড় বড় অক্ষরে লেখে। লাইনও ঠিক থাকে না। কমলের লেখা ছোট ছোট হরফে। লাইন সোজা। লেখা দেখে মনে হবে, সে স্কেল বসিয়ে লিখেছে। তবে তার লেখা চট করে পাঠ করার মতো না। সে লিখেছে উল্টো করে। এই লেখা পড়ার সহজ বুদ্ধি হলো, আয়নার সামনে লেখাটা ধরা। মতিনের ঘরে কোনো আয়না নেই। আয়না আছে মেসবাড়ির বাথরুমে। লেখা নিয়ে বাথরুমে যেতে ইচ্ছা করছে না। সিক্রেট থাকুক সিক্রেটের মতো। কোনো একদিন পড়ে ফেললেই হবে। এত তাড়াহুড়ার কিছু নেই।

১২. বোনের বিয়ে ঠিক

হাবিবুর রহমান তাঁর বোনের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। বরের নাম হেদায়েতুল ইসলাম। সে তার ফার্মেসিতে কাজ করে। ম্যানেজার। বয়স চল্লিশ হয় নি, তবে মাথার সব চুল পেকে গেছে বলে তাকে বেশ বয়স্ক দেখায়। সে চুলে কলপ দেয় না। কলপ দিলে অ্যালার্জির মতো হয়। নাক-মুখ ফুলে উঠে। পাকাচুলের এই মানুষটাকে তুমি তুমি করে বলতে হাবিবুর রহমানের অস্বস্তি লাগে।

হেদায়েতুল ইসলামের এটা দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম স্ত্রী একবছর আগে মারা গেছে। সেই পক্ষের দুটা ছেলেমেয়ে আছে। একজনের বয়স সাত, আরেকজনের চার। এরা থাকে নারায়ণগঞ্জে, নানির বাড়িতে। হেদায়েতুল ইসলাম ঠিক করে রেখেছে, বিয়ের পর বাচ্চাদের নিজের কাছে এনে রাখবে। তার এমন স্ত্রী দরকার যার অন্তরে মায়া মহব্বত আছে। সে নিজের জন্যে বিয়ে করতে চায় না। বাচ্চাদের মানুষ করার জন্যে বিয়ে করতে চায়।

হাবিবুর রহমান বিষয়টা নিয়ে তৌহিদার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করেছেন। তৌহিদা শান্ত গলায় বলেছে–ভাইজান, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

হাবিবুর রহমান বললেন, ওর আগের পক্ষের দুটা সন্তান আছে, এই নিয়ে তোর কোনো সমস্যা নাই তো?

তৌহিদা বলেছে, না।

সূচিপত্র

ঝালকাঠির পাত্রটা হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে পড়েছি মুশকিলে। তবে এই পাত্রও খারাপ না। অনেকদিন দেখেছি। স্বভাব-চরিত্র ভালো। আজকালকার জমানায় ভালো স্বভাব-চরিত্রের পাত্র পাওয়া অসম্ভব। লোম বাছতে কম্বল উজাড় হওয়ার অবস্থা। তারপরেও তোর একটা মতামত আছে। ভালোমতো চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নে।

তৌহিদা বলল, ভাইজান, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

ছেলেকে একদিন বাসায় নিয়ে আসি। তুই কথা বলে দেখ।

তৌহিদা বলল, দরকার নাই। আপনি তো কথা বলেছেন। আমি আর কী কথা বলব।

পুরুষদের কথা বলা এবং মেয়েদের কথা বলা আলাদা। মেয়েরা দুই একটা কথা বলেই অনেক কিছু বুঝে ফেলে। পুরুষরা পারে না। নিয়ে আসি একদিন।

আপনার ইচ্ছা।

এক হরতালের দিনে হাবিবুর রহমান তাঁর ম্যানেজারকে বাসায় নিয়ে এলেন। তৌহিদা ম্যানেজারের জন্য চা-নাশতা নিয়ে গেল।

আধবুড়া একজন চোয়াল-ভাঙা মানুষ কুজো হয়ে বসার ঘরের বেতের চেয়ারে বসে আছে। মাথায় চুল নেই বললেই হয়। যা আছে সবই পাকা। লোকটা মাথা সামান্য কাত করে দাঁড়কাকের মতো বসে আছে। তার গা থেকে প্রচণ্ড ঘামের গন্ধ আসছে। লোকটা তৌহিদাকে ঢুকতে দেখে বলল, ভালো আছ। তৌহিদা?

তৌহিদা বলল, জি।

চা-নাশতার দরকার ছিল না। সকালে এককাপ আর রাতে ঘুমাবার আগে এককাপ। এর বেশি খাই না। অনেকের চা খেলে রাতে ঘুম হয় না। আমার উল্টা। চা না খেলে ঘুম হয় না।

তৌহিদা কিছু বলল না। তার কান্না পাচ্ছে। তার ইচ্ছা করছে চাপা গলায় বলে, এই দাঁড়কাক, তুই চেয়ারে বসে আছিস কেন? তুই ডাস্টবিনের উপর বসে থাক।

হেদায়েত বলল, তুমি কিছু বললো। চুপচাপ কেন? তোমরা কয় ভাই-বোন?

তৌহিদা বলল, আমি একা।

স্যার যে বললেন, তোমরা দুই বোন।

দুই বোন ছিলাম, একবোন খুব ছোটবেলায় মারা গেছে।

কীভাবে মারা গেছে?

পানিতে ডুবে।

আফসোস। বিরাট আফসোস।

তৌহিদা আবারো মনে মনে বলল, তোর আফসোস কী জন্যে? শালী থাকবে না, কারো সঙ্গে ইটিস-পিটিস করতে পারবি না, এইজন্যে আফসোস?

লোকটা সুড়ৎ করে চায়ে চুমুক দিল। এক চুমুকে আধাকাপ চা খালি। এই লোকটার সবকিছুই কি খারাপ? এত গরম চা এক চুমুকে খেয়ে ফেলল।

তৌহিদা, আমার বিষয়ে তোমার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, জিজ্ঞেস কর। আছে কিছু?

কিছু নাই।

আমার বাচ্চা দুটার কথা কি স্যার বলেছেন?

জি।

মেয়ের নাম রানী, আর ছেলের নাম রেখেছি গোলাপ। জন্মের সময় গায়ের রঙ গোলাপের মতো ছিল এইজন্যে গোলাপ। এখন রঙ কালো হয়ে গেছে। জন্মের সময়ের রঙ লাস্টিং করে না। তৌহিদা, দেখি তোমার বাঁ হাতটা?

তৌহিদা চমকে উঠে বলল, কেন?

আমি অল্পবিস্তর পামিস্ট্রি জানি। কিরোর বই পড়ে পড়ে শিখেছি। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ের ফলাফল শুভ হবে কি-না একটু দেখি। দুজনের হাত পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে হয়। পুরুষদের ডান হাত, মেয়েদের বা হাত।

তৌহিদা হাত বাড়িয়ে দিল। তার আচরণে সঙ্কোচের চিহ্নও নেই। তার মন বলছে, এই লোকটা তার বাঁ হাত এখন কিছুক্ষণ কচলাবে। কচলানো হাতে লেগে থাকবে লোকটার গায়ের ঘামের গন্ধ। সাবান দিয়ে ধুলেও এই গন্ধ যাবে না।

তোমার সানলাইন তো মারাত্মক। মাউন্ট অব জুপিটারে আবার আছে ক্রস। ডাবল অ্যাকশন। বিয়ের পর টাকা-পয়সার যোগ আছে।

এতক্ষণ লোকটার প্রতি তার তেমন ঘেন্না হচ্ছিল না। এখন হচ্ছে। লোকটার হাতটাকে মনে হচ্ছে মাকড়শা। একটা কালো মাকড়শা পাঁচটা পা নিয়ে তার হাতের উপর কিলবিল করছে। তৌহিদা অপেক্ষা করছে কখন লোকটা হাত ছাড়বে সে চলে যেতে পারবে। লোকটার হাত ছাড়ার কোনো লক্ষণ নেই।

হেদায়েত হাসিমুখে বলল, তোমার হাতে আছে মীনপুচ্ছ। খুবই মারাত্মক। লাখে একটা পাওয়া যায়। তুমি বিরাট ভাগ্যবতী। অবশ্য একটা জিনিস তোমার খারাপ। স্বাস্থ্যরেখা। রাতে ঘুম ভালো হয়?

হুঁ।

অ্যানিমিয়া আছে। এটা হাত দেখে বলছি না। চোখ দেখে বলছি! অনেক দিন ওষুধ ব্যবসার সঙ্গে আছি। এখন ডাক্তারদের চেয়ে জ্ঞান বেশি! একদিন। ফার্মেসিতে চলে এসো, ওষুধ দিয়ে দিব। ফলিক অ্যাসিড। তার সঙ্গে এক পাতা। ফাইভ মিলিগ্রাম রিভোফ্লবিন। এটা

একটা ভিটামিন ট্যাবলেট। ফলিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিভোফ্লবিন খেলে অ্যাকশান ভালো হয়। অনেকেই বিষয়টা জানে না।

জি আচ্ছা।

পানি বেশি করে খাবে। সকালে একগ্লাস পানি খাবে খালি পেটে পানিতে লেবুর রস চিপে দিবে। লেবুতে আছে ভিটামিন সি।

তৌহিদা উঠে দাঁড়াল। লোকটা এখন আগের মতো ঘাড় কাত করে দাঁড়কাক হয়ে গেছে। তৌহিদার বমি বমি ভাব হলো। কারণ লোকটা এখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তৌহিদার বুকের দিকে। কোনো লজ্জাও সে বোধ করছে না। খুব ভালো হতো তৌহিদা যদি বলতে পারত–আপনি আমার বুক দেখতে চান? বাথরুমে আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে দেখাতে পারব না। ভাইজান যে-কোনো সময় চলে আসতে পারেন। যা ভাবা যায় তা কখনোই বলা যায় না। তৌহিদা ঘর ছেড়ে শান্ত ভঙ্গিতেই বের হয়ে গেল।

হাবিবুর রহমান আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কথা হয়েছে?

তৌহিদা বলল, জি ভাইজান।

কথাবার্তা বলে কী মনে হলো?

ভালো।

স্মার্ট ছেলে না?

জি।

ভালো হাত দেখতে পারে। বিয়ের পর বলবি হাত দেখে দেবে।

আচ্ছা।

হাবিবুর রহমান আনন্দিত গলায় বললেন, বিয়ের তারিখ করে ফেলি? বিয়ের কথাবার্তা একবার হয়ে গেলে দেরি করতে নাই।

তৌহিদা বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নেড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। দুটি হাতই সাবান দিয়ে ভালো করে ধুতে হবে। এই লোক দুটি হাতেই ঘামের গন্ধ লাগিয়ে দিয়েছে।

দুপুরে তৌহিদা কিছু খেতে পারল না। সাবান দিয়ে ধুয়েও হাত থেকে ঘামের গন্ধ যায় নি। এই গন্ধ নিয়ে ভাত খাওয়া যাবে না। ভাতের মধ্যে গন্ধ ঢুকে যাচ্ছে।

ক্ষুধার্ত অবস্থায় মানুষের ঘুম হয় না, কিন্তু তৌহিদার গাঢ় ঘুম হলো। সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল, মতিন তার পাশে শুয়ে আছে। মতিনের একটা হাত তার গায়ে। সে সাবধানে হাতটা সরিয়ে দিতেই মতিন জেগে উঠে বলল, কী হয়েছে? তৌহিদা বলল, গায়ের উপর হাত রাখ কেন? ভার লাগে না?

মতিন বলল, তাহলে হাত রাখব কোথায়?

তৌহিদা বলল, হাত যেখানে ইচ্ছা রাখ। আমার গায়ে না।

মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, স্ত্রীর গায়ে হাত রাখতে পারব না?

তৌহিদা বলল, তুমি তো আমাকে বিয়ে কর নি। আমি তোমার স্ত্রী না।

মতিন বলল, তাহলে আমার স্ত্রী কে?

তৌহিদা বলল, তোমার স্ত্রীর নাম নিশু।

মতিন সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরল। অমনি দেখা গেল ওপাশে নিশু শুয়ে আছে। স্বপ্নে বিষয়টা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হলো না। মনে হলো এটাই স্বাভাবিক। মতিন নিশুর গায়ে হাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। তৌহিদা কাঁদছে।

তৌহিদা কাঁদতে কাঁদতেই ঘুম থেকে জেগে উঠল। তাকাল বিছানার পাশে। বিছানা খালি। অথচ তার মনে হচ্ছিল বিছানায় মতিনকে দেখা যাবে। মতিনের পাশে নিশু মেয়েটাকে দেখা যাবে।

বাচ্চা ছেলেদের গলায় কে যেন তাকে ডাকছে–ও তৌহিদা! ও তৌহিদা! বাচ্চা ছেলেদের গলায় তাকে কে ডাকবে? এ বাড়িতে বাচ্চা কেউ নেই। ঘুম ভাঙার পর কিছুক্ষণ এলোমেলো সময় কাটে। মানুষের গলার স্বর চেনা যায় না। তাই হচ্ছে নিশ্চয়ই। তৌহিদা তার ঘর থেকে বের হলো।

সালেহা তৌহিদাকে ডেকে ডেকে বিরক্ত হচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে কঠিন ধমক দেন। তিনি রোগীমানুষ। একবার ডাকলেই তৌহিদা ছুটে আসবে। তা-না, ডেকে গলা ভেঙে ফেলতে হচ্ছে।

বুবু, আমাকে ডেকেছেন?

সালেহা তিক্ত গলায় বললেন, তোমাকে কেন ডাকব? আমি এই দেশের মহারানীকে ডাকছি। তুমি কি মহারানী? আমার গায়ে একটা পাতলা চাদর এনে দাও।

তৌহিদা চাদর এনে দিল। সালেহা বলেন, চাদর দিতে বললাম সঙ্গে সঙ্গে চাদর দিয়ে দিলে, একবার জিজ্ঞেসও করলে না, কেন। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে না? তৌহিদা কপালে হাত দিয়ে বলল, জ্বর আছে।

জ্বরটা কত দেখ? থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপা এখনো জানো না? জীবনে একটা জিনিসই তো শিখেছ, ফিচ ফিচ করে কান্না।

তৌহিদা জ্বর দেখল। জ্বর একশ দুই-এর সামান্য কম। সালেহা বললেন, জ্বর উঠা শুরু হয়েছে। আরো উঠবে।

বুবু, মাথায় পানি দেয়ার ব্যবস্থা করি?

সালেহা বললেন, তোমাকে কোনো ব্যবস্থা করতে হবে না। তুমি আমার মাথার পাশে চেয়ার টেনে বসো। তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

তৌহিদা চেয়ার টেনে বসল। তার সামান্য ভয় ভয় করছে। জ্বরের ঘোরে। সালেহা কী না কী বলেন। জ্বর বেশি হয়ে গেলে তার মাথার ঠিক থাকে না।

তোমার ভাইজান না-কি তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে?

তৌহিদা জবাব দিল না। সালেহা কড়া গলায় বললেন, কথা বললে জবাব দিবে। কাঠের মূর্তি হয়ে যাবে না। তোমার ভাইজান কি তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে?

জি।

পাত্র নাকি বাসায় এসেছিল? তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতও হয়েছে।

জি।

এত নাটক হয়ে গেল, আমি কই ছিলাম?

বুবু আপনি ঘুমাচ্ছিলেন।

আমাকে ঘুম থেকে জাগানো গেল না?

গতরাতে আপনি এক ফোটা ঘুমান নাই। ভাইজান এইজন্যেই আপনাকে ডাকেন নাই।

তোমার ভাইজান বলল, পাত্র নাকি তোমার খুবই পছন্দ হয়েছে?

তৌহিদা এই প্রশ্নের জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। সালেহা বললেন, ঘাটের মরাকে বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে গেলে কেন? শরীর বেশি আউলা হয়ে গেছে? শরীর বেশি আউলা হলে বাজারে দোকান দিয়ে বসো। শরীরও ঠিক থাকবে পয়সাও পাবে। এইটা ভালো না?

তৌহিদার চোখে পানি এসে গেছে। সে সাবধানে চোখের পানি মুছল। বুবু দেখে ফেললে সমস্যা হবে। আরো কী কথা বলবেন কে জানে। তাঁর মুখ ছুটে গেলে সমস্যা আছে। আগে তিনি নোংরা বলতেন না। এখন বলেন। অসুখে ভুগে ভুগে এরকম হয়েছে।

তৌহিদা।

জ্বু বুবু।

আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি, তোমার জন্য সবচে ভালো হয় যদি তুমি তোমার ভাইজানকে বিয়ে কর। সে তোমার আপন ভাই না, সৎ ভাইও না। লতায় পাতায় ভাই। বেচারার কোনো ছেলেপুলে নাই। তোমাকে বিয়ে করলে হয়তো সন্তান হবে। সতিনের সংসার নিয়ে তোমার চিন্তার কিছু নাই। আমি বেশিদিন বাঁচব না।

তৌহিদা ভীত গলায় বলল, আমি সারাজীবন উনাকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখেছি।

সালেহা বললেন, এখন স্বামীর মতো দেখবে। এই নিয়ে আর কথা বলব না। জ্বরটা আবার দেখ। জ্বর যদি একশ তিন হয় তাহলে মাথায় পানি দেয়ার ব্যবস্থা কর। তার আগে আমার মোবাইল টেলিফোনটা খুঁজে বের কর। মতিনের নাম্বারটায় টেলিফোন করে ওকে ধরে

আমাকে দাও। আজকে আমি তার বিষ ঝেড়ে দেব। সে নাকি আমার ভাই। আজ আমি তার ভাইগিরি বের করে দেব। কত বড় বদমাশ! আমার এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

তৌহিদা ক্ষীণ গলায় বলল, ভয়ে আসে না। আপনি বকা দিবেন।

ভয়, না? ভয় পায়। ভয় আমি তাকে গিলায়ে খাওয়ায়ে দিব। আমাকে চিনে না। আমি সালেহা বেগম।

তৌহিদা কিছুক্ষণ মোবাইল টেলিফোন নাড়াচাড়া করে ভীত গলায় বলল, উনি টেলিফোন ধরছেন না। বলেই মনে হলো তার মিথ্যাটা বুবু ধরে ফেলবেন। তার রাগ আরো বেড়ে যাবে।

সালেহা মিথ্যা ধরতে পারলেন না। তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, চেষ্টা চালিয়ে যাও। যখন ধরতে পারবে তখন আমাকে দেবে। তারপর দেখবে কত ধানে কত চাল। আমি ঐ কুত্তার বাচ্চাটার বিষ ঝাড়ব। আমার নাম সালেহা বেগম না, আমার নাম সালেহা ওঝা।

মতিন তার মেসের ঘরে। দরজা জানালা বন্ধ। সে লেখা নিয়ে বসেছে। লেখার শিরোনাম নদ্দিউ নতিম এবং একটি হস্তীশাবক। নদ্দিউ নতিম বিচিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি একবার শখ করে সার্কাসের দল থেকে একটি হাতির বাচ্চা কিনেছিলেন। হাতির বাচ্চাটা তার সঙ্গে দেড় বছর ছিল। এই দেড় বছরে তিনি কোনো লেখালেখি করেন নি। হাতির

বাচ্চা নিয়ে সময় কাটিয়েছিলেন। তিনি তার আজীবনিতে বলেছেন এই দেড় বছর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। এই বিষয় নিয়ে লেখা।

লেখার মাঝামাঝি সময়ে নিশুর টেলিফোন এলো। তার গলা ক্লান্ত ও বিষণ্ণ। সে বলল, মতিন, তুমি একটু আসতে পারবে?

মতিন বলল, কোথায়?

ক্লিনিকে। আমি ক্লিনিকের ডক্টরদের চেম্বারে বসে আছি।

মতিন বলল, আসতে পারব না। আমি লেখা নিয়ে বসেছি। খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছি।

নিশু বলল, মতিন, আমি বিপদে পড়েছি।

মতিন বলল, আমিও বিপদে পড়েছি। নদ্দিউ নতিম হাতির বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলতেন। হাতির বাচ্চা কথোপকথনে অংশ নিত। অংশটা কীভাবে নিত সেটাই ঠিক করতে পারছি না।

নিশু ধরা গলায় বলল, মতিন, কিছুক্ষণ আগে আমার বাবা মারা গেছেন।

মতিন বলল, সে-কী!

নিশু বলল, ডেডবডি নিয়ে আমি কী করব, কোথায় যাব, কবর কোথায় হবে। কিছুই বুঝতে পারছি না। টেনশনে এমন অবস্থা আমি কাঁদতেও পারছি না।

মতিন বলল, তুমি নিশ্চিন্ত মনে বসে থাক। আমি আমার দুলাভাইকে ক্লিনিকের ঠিকানা দিয়ে টেলিফোন করছি। উনি এইসব বিষয়ে বিরাট অ্যাক্সপার্ট লোক। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার উনিই করবেন।

তুমি আসবে না?

মতিন বলল, আমি লেখার এমন এক পর্যায়ে আছি যে লেখা ছেড়ে উঠা সম্ভব না। আচ্ছা হাতির ডাককে বাংলায় কী বলে যেন?

বৃংহতি।

বাহ্ সুন্দর নাম! নিশু শোন, তুমি কি এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছ?–ঘোড়ার ডাকে আলাদা নাম আছে, হেষা। হাতির ডাকের আলাদা নাম বৃংহতি। কিন্তু বাঘের ডাকের কোনো আলাদা নাম নেই। বাঘের ডাকের একটা আলাদা নাম থাকা উচিত ছিল না?

নিশু জবাব না দিয়ে লাইন কেটে দিল।

নিশুর প্রচণ্ড পানির পিপাসা পেয়েছে। কাকে সে পানির কথা বলবে? যে ডাক্তার তাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছেন তিনি নেই। অন্য ডাক্তাররা এই ঘরে ঢুকছে বেরুচ্ছে। অনেকেই তাকে দেখছে বিরক্ত চোখে। অপরিচিত একটা মেয়ে তাদের ঘরে জবুথবু হয়ে

বসে আছে, বিরক্ত হবারই কথা। একজন আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার কি কাউকে দরকার? নিও না-সূচক মাথা নেড়েছে।

নিশু ঘড়ি দেখল। বাবা মারা যাবার পরপরই সে একবার ঘড়ি দেখেছিল। কেন দেখেছিল? মৃত্যুর সময় জানার জন্যে? জন্ম-সময় জানাটা জরুরি। মৃত্যু সময় জেনে কী হবে?

তার বাবা বিখ্যাত কেউ হলে পত্রিকায় নিউজ হতো–জনাব আজিজ আহমেদ অমুক দিন এতটার সময় অমুক হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র সন্তান পাশে ছিল। তার ডাক নাম নিশু। সে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী।

আচ্ছা এসব সে কী ভাবছে? তার উচিত হাউমাউ করে কাঁদা। সে কাঁদতেও পারছে না। কান্না আসছে না। এমন কি হতে পারে পরিচিত কেউ আশেপাশে নেই বলে সে কাদতে পারছে না? বাবার জন্যে সে কোনো দুঃখ পাচ্ছে না–এটা তো ঠিক না। বাবা ছাড়া তার কে আছে? কিছুদিন থেকে বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব খারাপ যাচ্ছিল। এই কারণে কি তার মনে বাবার উপর চাপা রাগ আছে? রাগ আছে বলেই এখনো তার চোখ শুকিয়ে আছে।

জীবনের শেষের কয়েকটা দিন তার মাথারও ঠিক ছিল না। আবোলতাবোল কথা বলতেন। একদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠে নিশুকে দেখে বিরক্ত গলায় বললেন, একা এসেছিস কেন? জামাই কই?

নিশু বলল, আমি বিয়ে করেছি নাকি যে জামাই নিয়ে আসব?

আজিজ আহমেদ রাগী গলায় বললেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা ফাজলামি করবি। আমি ঠাট্টা ফাজলামি পছন্দ করি না। তুই যে গোপনে বিয়ে করেছিস এই খবর আমি জানি।

নিশু বলল, এই খবর যদি জানো তাহলে বলো কাকে বিয়ে করেছি?

মতিনকে। আর কাকে!

ও আচ্ছা।

ও আচ্ছা আবার কী? স্বীকার কর।

আচ্ছা যাও স্বীকার করলাম।

তুই একা আসিস কেন? ওকে আনিস না কেন?

মতিন তোমাকে ভয় পায় বলে আসে না। ভাবে তাকে তুমি বকা দিবে।

বকা তো তাকে দেবই! গোপনে বিয়ে করার জন্য বুকা দেব না? আমাকে রোজ কেন দেখতে আসে না এইজন্যে বকা দেব। আরেকটা কথা, তুই মতিনকে নাম ধরে ডাকবি না। তুই তুকারি করবি না। বিয়ের আগে ডেকেছিস—আর না।

ঠিক আছে আর ডাকব না। বাবা, তুমি কথা বেশি বলছ। এত কথা বলা। ঠিক না।

তোরা স্বামী-স্ত্রী সারারাত জেগে কথা বলিস। তোদর কথার যন্ত্রণায় আমি ঘুমাতে পারি না। আর আমি কথা বললেই অসুবিধা?

মৃত্যুর পাঁচ-দশ মিনিট আগে তিনি ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন। অদৃশ্য কোনো একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আজরাইল। আপনাকে চিনতে পারি নাই, ক্ষমা করবেন। আপনি কি আমার জান কবচ করতে এসেছেন? জি করেন। আপনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন বলে চিনতে পারি নাই। আপনাকে সালামও দিতে ভুলে গেছি। আসসালামু আলায়কুম। আমার পাশে আমার মেয়ে বসে আছে। তার নাম নিশু। সে আবার কয়েকদিন আগে গোপনে। বিয়ে করেছে। আমার মেয়ে জামাইয়ের নাম মতিন। সে আমাকে খুব ভয় পায় বলে হাসপাতালে আসে না। আপনি একটু সরে গিয়ে আমার মেয়েটার পেছনে দাঁড়ান। আপনাকে দেখলে আমার মেয়ে ভয় পাবে।

১৩. সুইজারল্যান্ডে পড়তে যাবার ব্যাপারে

সুইজারল্যান্ডে পড়তে যাবার ব্যাপারে কমলের কোনো আপত্তি লক্ষ করা যাচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে তার আগ্রহই আছে। ভালো আগ্রহ। সে তার মা কে কী কী জিনিস লাগবে তার লিস্ট করে দিয়েছে। লিস্টে আছে–

১. একটি অ্যালার্ম টেবিল ঘড়ি।

২. দুটি ফ্লাস্ক।

৩. নিউটনের লেখা অঙ্কের বই Principia Mathematica.

৪. সুইজারল্যান্ডে যত বিমান যায় এবং আসে তার টাইমটেবল।

৫. দুটি জিওমেট্রি সেট।

৬. একটি ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি।

৭. একটি ইংলিশ টু জার্মান ডিকশনারি।

৮. একটি ইংলিশ টু রুশ ডিকশনারি।

মুনা ৩, ৪ এবং ৮ নাম্বার আইটেম ছাড়া বাকি সবই জোগাড় করেছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সে ইংলিশ টু রুশ ডিকশনারি দিয়ে কী করবে? কমল জবাব দেয় নি।

কমলের সঙ্গে কে কে যাবে তা এখনো ঠিক হয় নি। তার মা যাবে এটা ঠিক হয়েছে। ফারুক সাহেবের ভিসা হয়েছে। তিনি যাবার জন্যে প্রস্তুত। তবে হঠাৎ করে সালেহ ইমরান ঠিক করেছেন তিনি যাবেন। ছেলেকে হোস্টেলে রেখে ফিরে আসবেন। সালেহ ইমরান এই সিদ্ধান্ত নেয়ায় আহমেদ ফারুকের যাবার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। মুনা বলেছেন, তুমি যখন যাচ্ছই তখন আর ফারুক সাহেবের যাবার দরকার কী?

সালেহ ইমরান হা না কিছু বলেন নি। তাকে চিন্তিত এবং বিষণ্ন মনে হয়েছে। ছেলে তার কাছে থাকবে না, দূরদেশে পড়ে থাকবে, এটা তিনি নিতে পারছেন না। তার এই ছেলে আর দশটি স্বাভাবিক ছেলের মতো না। অন্যরকম একটি ছেলে। কোনো একদিন তার রাগ উঠে যাবে কেউ বুঝতে পারবে না। সে গুটিয়ে থাকবে নিজের মধ্যে। প্রবাসী ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবে তাও না। সে কখনো তাকে টেলিফোন করবে না। ছেলেকে বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঠিক হয় নি। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে হুট করে তা পাল্টানো যায় না। তিনি মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন ছেলেকে সুইজারল্যান্ডের স্কুলে ঠিকই ভর্তি করাবেন। ছেলে দিন দশেক স্কুলে থাকবে। তিনিও স্কুলের আশেপাশে কোনো একটা হোটেলে থাকবেন। তার দেশে ফিরে আসার সময় যখন হবে তিনি ছেলেকে নিয়ে ফিরবেন। বিষয়টা নিয়ে তিনি এখনো মুনার সঙ্গে আলাপ করেন নি। কারণ মুলা কী বলবে তিনি জানেন। মুনা বলবে, অসম্ভব। সালেহ ইমরানের ইচ্ছা তিনি ছেলের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। এখনো কথা বলা হয়ে উঠে নি। তিনি ঠিক করে রেখেছেন কোনো এক মুভি নাইটে। প্রসঙ্গ তুলবেন।

আজ মুভি নাইট। কমল তার বাবার পাশে বসেছে। দুজনের মাঝখানে তিন ফুটের মতো ফাকা জায়গা। সালেহ ইমরান ছেলের কাছে সামান্য এগিয়ে গেলেন। তিনি যতটুকু এগুলেন কমল ঠিক ততটুকুই সরে গিয়ে তাদের মাঝখানের দূরত্ব ঠিক রাখল।

সালেহ ইমরান বললেন, কমল, আজ কী ছবি?

কমল বলল, তুমি ঠিক কর।

সালেহ ইমরান বললেন, বাংলা ছবি দেখলে কেমন হয়।

কমল বলল, Ko.

সালেহ ইমরান বললেন, Ko মানে কী? Ok?

হুঁ। বাংলা ছবিটার নাম কী?

পথের পাঁচালি। অপু দুর্গার গল্প। তারা দুই ভাইবোন। ছবিতে অপুর যে চেহারা তার সঙ্গে তোমার চেহারার মিল আছে।

বেশি মিল?

খুব বেশি না, তারপরেও কিছুটা মিল আছে।

অপুর কাঁধে কি আমার মতো জন্মদাগ আছে?

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার কাঁধে জন্মদাগ আছে নাকি?

কমল বলল, হুঁ।

দেখি?

কমল বলল, এখন দেখাতে ইচ্ছা করছে না।

কখন ইচ্ছা করবে?

কমল বলল, জানি না।

সালেহ ইমরান বললেন, ছবি কি শুরু করব?

কমল বলল, তোমার ইচ্ছা।

সালেহ ইমরান বললেন, একজনের সঙ্গে আরেকজনের চেহারার মিল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার একটা ব্যাপার মনে এসেছে। পৃথিবীর কোনো মানুষের বুড়ো আঙুলের ছাপ একরকম না, এটা কি তুমি জানো?

জানি।

পৃথিবীতে এত মানুষ এসেছে, এদের কোনো দুজনের বুড়ো আঙুলের ছাপ একরকম না। এটা অদ্ভুত না?

কমল বলল, হুঁ।

সালেহ ইমরান আগ্রহের সঙ্গে বললেন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আলাদা, অথচ দেখ প্রতিটি আমগাছ একরকম, কাঁঠাল গাছ একরকম। শীতের সময় যে হাজার হাজার মাইগ্রেটরি বার্ড আমাদের দেশে উড়ে আসে তারাও একরকম।

কমল বলল, তারাও প্রত্যেকেই আলাদা। আমরা বুঝতে পারি না। প্রতিটি পাখিই যে আলাদা সেটা একটা পাখি বুঝতে পারবে। প্রতিটি আমগাছও আলাদা, এটা একটা আমগাছ বুঝতে পারবে। আমরা বুঝতে পারব না।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার ব্যাখ্যাটা ইন্টারেস্টিং। তবে সত্যি না।

তুমি কী করে বুঝলে সত্যি না?

সালেহ ইমরান বললেন, আমার মন বলছে এটা সত্যি না।

কমল বলল, আমার মন বলছে এটা সত্যি।

সালেহ ইমরান বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমি যা বলছ তাই সত্যি। এখন কি ছবি শুরু করব?

তোমার ইচ্ছা।

কমল, তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ?

হুঁ।

কেন মন খারাপ?

তোমাকে বলব না।

আমাকে বলবে না কেন?

তোমাকে বললে তুমি আমার মন ঠিক করতে পারবে না। শুধু শুধু কেন বলব?

এমন কেউ কি আছে যে তোমার মন ঠিক করতে পারবে?

আছে। নদ্দিউ নতিম।

আমাদের মতিনের কথা বলছ?

হুঁ।

তুমি মন খারাপ করে আছ এই অবস্থায় ছবি দেখার তো কোনো মানে হয়। না। চল একটা কাজ করি, গাড়ি করে তোমাকে নিয়ে যাই মতিনের কাছে। সে তোমার মন ভালো করে দিক, তারপর ছবিটা দেখি।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে আনন্দ। সালেহ ইমরান বললেন, তুমি কি আমার বা তোমার মায়ের সঙ্গর চেয়ে মতিনের সঙ্গ বেশি পছন্দ কর?

কমল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি যে একা সুইজারল্যান্ডে থাকবে, আমাকে এবং তোমার মাকে তুমি মিস করবে না?

কমল বলল, না।

সালেহ ইমরান বললেন, মিস করবে না কেন?

কমল বলল, মতিন আমার সঙ্গে থাকবে এইজন্যে মিস করব না।

মতিন তোমার সঙ্গে থাকবে?

হ্যাঁ। তাকে ছাড়া আমি যাব না।

আমি যতদূর জানি মতিন যে যাবে না এই বিষয়টা পরিষ্কার করে তোমাকে বলা হয়েছে।

মতিন যাবে। মতিন অবশ্যই যাবে।

সালেহ ইমরান আর কথা বাড়ালেন না, উঠে দাঁড়ালেন। তিনি একধরনের স্বস্তিও বোধ করছেন। ছেলে বাইরে যাবে না। তার চোখের সামনেই থাকবে। এই ঘটনাটি আপনাআপনি ঘটে গেছে। তাকে কিছু করতে হয় নি। মুনার কাছে। ব্যাখ্যা করতে হবে না।

মতিনকে তার মেসবাড়িতে পাওয়া গেল না। মেস ম্যানেজার বলল, উনার আসা যাওয়ার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। দশ মিনিট পরেও আসতে পারে, আবার দশ ঘণ্টা পরেও আসতে পারে।

কমল বলল, দশ ঘন্টা পর তো দিন হয়ে যাবে।

উনি যেমন মানুষ রাত পার করে দিনেও আসতে পারে। দুনিয়ায় হিসাব ছাড়া মানুষ কিছু আছে, ইনি তার একজন। আপনারা অপেক্ষা করতে চাইলে অপেক্ষা করতে পারেন।

সালেহ ইমরান কিছু বলার আগেই কমল বলল, আমরা অপেক্ষা করব।

ম্যানেজার বলল, আমার ঘরে অপেক্ষা করেন। কোনো অসুবিধা নাই।

ম্যানেজারের ঘরে দুজন বসে আছে। সালেহ ইমরান ঘড়ি দেখলেন। উনিশ মিনিট পার হয়েছে। কমল কোনো অস্থিরতা দেখাচ্ছে না। শান্তভঙ্গিতে চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে দীর্ঘ সময় এইভাবে বসে থাকতে পারবে। অপেক্ষা করতে

তার খারাপও লাগছে না। সালেহ ইমরান ঠিক করেছেন ছেলে যতক্ষণ অপেক্ষা করতে চায় তিনি ততক্ষণই অপেক্ষা করবেন। নিজ থেকে বলবেন না, অনেক অপেক্ষা করা হয়েছে এখন চল যাওয়া যাক। অপেক্ষার একটা পরীক্ষা সালেহ ইমরান আজ দিতে চান।

মতিন আছে নিশুদের বাড়িতে। নিশু রান্না করছে, সে পাশে বসে আছে। রান্না এমন কিছু না। ডাল, বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি। নিশু বলল, তুমি তো আমার সঙ্গে খাবে, তাই না?

মতিন বলল, হুঁ।

নিশু বলল, ফ্রিজে কিছুই নেই। অনেক দিন বাজার করা হয় না।

মতিন বলল, কী কী লাগবে বলো, আমি এনে দেব।

নিশু বলল, লাগবে না। খাওয়া দাওয়াটা আমার কাছে ইম্পোর্টেন্ট না।

তোমার কাছে কোনটা ইম্পোর্টেন্ট?

বেঁচে থাকাটা ইম্পোর্টেন্ট। বাঁচা উইথ ডিগনিটি।

ডিগনিটি বলতে কী বুঝাচ্ছ?

শুধু শুধু প্যাঁচাল পাড়বে না। ডিগনিটির অর্থ তুমি জানো।

মতিন সিগারেট ধরাল। তার প্যাকেটে একটা মাত্র সিগারেট। সিগারেট ধরাবার পর সে সামান্য টেনশনে পড়ে গেল। সঙ্গে সিগারেট নেই, এই চিন্তাটাই টেনশনের।

নিশু বলল, তোমার প্যাকেট তো মনে হয় খালি। প্যাকেটে সিগারেট থাকলে আমি একটা খেতাম।

মতিন অবাক হয়ে বলল, তুমি সিগারেট খাও না-কি?

নিশু বলল, এখন খাই। বাবাকে কবর দিয়ে বাসায় ফিরে কেমন যেন হয়ে গেলাম। ভয়, অবসন্ন ভাব, ক্লান্তি।

রাতে একা ছিলে?

অবশ্যই একা। দোকা পাব কোথায়?

তুমি খুবই সাহসী মেয়ে।

যত সাহসী তুমি আমাকে ভাবছ তত সাহসী আমি না। রাতে বিছানায় শুয়েছি, হঠাৎ শুনি বাবার ঘর থেকে কাশির শব্দ আসছে। উনি সিগারেট টানছেন, সিগারেটের গন্ধ আসছে। হেলুসিনেশন আর কী। গেলাম বাবার ঘরে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বাবার টেবিলের উপর দেখি এক প্যাকেট সিগারেট। ভয় কাটানোর জন্যে একটা ধরালাম। সেই থেকেই আমার শুরু।

মতিন বলল, ঐ রাতে আমার আসা উচিত ছিল। আমি আসি নি কেন কারণটা বলব?

কারণ বলেছ–হস্তীবিষয়ক রচনা। নদ্দিউ নতিমের নতুন লেখা।

মতিন বলল, মূল কারণ এটা। আমি মৃত মানুষের সঙ্গে যেতে পারি না। আমার মা মারা গেছেন এই খবর পেয়ে আমি পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম। ফিরেছি তিনদিন পর। এসে দেখি মার কবর হয়ে গেছে। খুবই স্বস্তি পেয়েছি। ভয় ছিল দেখব মাকে কবর দেয়া হয় নি। আমি শেষ দেখা দেখব এইজন্যে রেখে দিয়েছে।

নিশু বলল, তুমি না আসায় আমার কোনো সমস্যা হয় নি। তোমার দুলাভাই চলে এসেছিলেন। সবকিছু তিনি করলেন। উনি একজন সত্যিকার ভালোমানুষ।

ঠিকই বলেছ।

তোমার বোন ভাগ্যবতী।

বোন ভাগ্যবতী তো বটেই। আজ রাতে যদি আমি তোমার এখানে থাকি তোমার কি কোনো সমস্যা হবে?

নিশু বলল, সমস্যা কী? তুমি বাবার ঘরে শুয়ে থাকবে। আজ থাকতে চাচ্ছ কেন?

মতিন বলল, বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে থেকে যাই। রাতে তোমার সঙ্গে গল্প করি। May be I am in love with you.

নিশু বলল, May be.

মতিন বলল, তোমার বিদেশ যাত্রা কি ঠিক আছে?

নিশু বলল, ঠিক আছে, তবে এক সেমিস্টার পিছিয়েছি।

এখন তো নিশ্চয়ই বিয়ে করে যাচ্ছ না।

না। বিয়ে টিয়ের ঝামেলা শেষ।

সারাজীবন বিয়ে করবে না?

সারাজীবনের কথা বলতে পারছি না। আমি বর্তমানে বাস করি। আমার সব কিছুই বর্তমান নিয়ে। আমি বর্তমানে বিয়ে করব না।

গুড।

নিশু বলল, বিয়ে করব না, এটা গুড?

মতিন বলল, তুমি যে তোমার ইচ্ছাটা জোর দিয়ে বলতে পারছ এটা গুড। কোনো মানুষই নিজের গোপন ইচ্ছা জোর দিয়ে বলতে পারে না। নদ্দিউ নতিমের মতো লোকও পারেন নি।

এখানে নদ্দিউ নতিম কোত্থেকে এলো?

কথার কথা বললাম।

নিশু বলল, নদ্দিউ নতিমের ভূতটা ঘাড় থেকে নামাও। তুমি কি বুঝতে পারছ যতই দিন যাচ্ছে এই ভূত ততই তোমার উপর জেঁকে বসছে?

বসুক না, ক্ষতি কী? নদ্দিউ নতিম লোকটা কিন্তু খারাপ না। আমি প্রায়ই তাঁকে স্বপ্নে দেখি।

স্বপ্নে দেখ?

হুঁ। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। জোব্বার মতো একটা পোশাক পরেন। লম্বাটে মুখ। চোখ তীক্ষ্ণ।

কথাবার্তা বাংলায় বলেন?

আমাদের কথাবার্তা হয় না। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি।

ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা করব কেন?

রান্না শেষ। হাত ধুয়ে খেতে আস।

মতিন খেতে বসেছে। নিশু তার প্লেটে ভাত তুলে দিচ্ছে। হঠাৎ নিশুর কী যেন হলো, তার মনে হলো এই মানুষটা তার অতি অতি প্রিয়জন। স্বামী। প্রবাসী স্বামী। অনেক দিন পর দেশে ফিরেছে। সে তার স্বামীকে আদর করে খাওয়াচ্ছে। তাদের একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। স্বামীর খাওয়া শেষ হলে নিশু তার বাচ্চা মেয়েটার জন্যে খাওয়া নিয়ে যাবে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে খাইয়ে দিতে হবে। মেয়েটা খাওয়া নিয়ে বড় যন্ত্রণা করে!

নিশুর চোখে পানি এসে গেছে।

মতিন অবাক হয়ে বলল, কাঁদছ কেন?

নিশু চোখ মুছতে মুছতে বলল, হঠাৎ বাবার কথা মনে করে চোখে পানি এসে গেছে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রায়ই না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। বাবা আমাকে ঘুমের মধ্যে মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন।

ধৈর্যের পরীক্ষায় সালেহ ইমরান ফেল করলেন। তিনি এসেছিলেন রাত আটটায়। এখন বাজে বারটা দশ। চার ঘণ্টা দশ মিনিট এক জায়গায় বসে আছেন। আর কত! তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, চল উঠি। আরেক দিন আসব।

কমল উঠল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে।

১৪. নদ্দিউ নতিম সাহেবের গল্পের বই

হ্যালো মতিন,

তোর পাঠানো নদ্দিউ নতিম সাহেবের গল্পের বইটির শেষ গল্পটা দ্বিতীয় রাত্রি কিছুক্ষণ আগে শেষ করলাম। উজবেক এই মরমী কবির (!) গল্পের হাত তো খুব ভালো। এই ব্যাটার কবিতার চেয়ে গদ্য ভালো লাগে। গদ্যের সারল্য এমন যে অন্যের লেখা পড়ছি তা মনেই হয় না। যেন এই লেখাটা আমার নিজের। দ্বিতীয় রাত্রি গল্পটা পড়ে এত আনন্দ পেয়েছি! বুকের ভেতরে একধরনের হাহাকার বোধ করেছি। আমার নিজের মধ্যে কোনো হাহাকার আছে তা আগে বুঝতে পারি নি। তবে গল্পের শেষ লাইনটা আমি বুঝতে পারি নি। তুই লিখেছিস (সরি নদ্দিউ নতিম সাহেব লিখেছেন) তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হইল। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদয় মানে কী? সূর্য কি পশ্চিম আকাশে উঠে? শেষ বাক্যটা সাধুভাষায় কেন লেখা তাও বুঝলাম না। অবশ্য পাঠককে যে সবকিছুই বুঝতে হবে তাও না। লেখক নিজে বুঝে লিখেছেন কি-না সেটাই বিবেচ্য।

মতিন, নদ্দিউ নদ্দিউ খেলা তো অনেকদিন হলো, এখন স্বনামে আত্মপ্রকাশ কর। সূর্য পশ্চিমে না, পূর্ব দিকেই ঠিকঠাক মতো উঠুক। প্রতিভা নামক ঐশ্বরিক জিনিসটা তোর আছে। প্রতিভাকে লালন করতে হয়। প্রতিভাকে অবহেলা করলে যিনি এই বস্তুটা দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁকে অবহেলা করা হয়। আমার লেখায় আস্তিক আস্তিক গন্ধ পাচ্ছিস না? আমি মনে হয় নাস্তিকের খোলস ছেড়ে বের হয়ে পড়েছি। যে দিকে তাকাই, যা দেখি তার মধ্যেই মহৎ পরিকল্পনা দেখি। যেন কেউ একজন অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সব ঘটিয়ে যাচ্ছেন। এই বিষয়ে সাক্ষাতে তোর সঙ্গে কথা বল।

তোর গল্পগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আজহার উল্লাহ খান নামের একজনকে পাওয়া গেল। উৎসর্গপত্র পড়ে জানলাম তার হৃদয় স্বর্ণখণ্ডের। তোর জীবনে এই চরিত্র কখন উদিত হয়েছে? সে কে? কী করে? কেনই বা তোর ধারণা হলো মানুষটার হৃদয় স্বর্ণখণ্ডের? আমাকে জানাবি। সবচে ভালো হয় মানুষটাকে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারিস। হৃদয় স্বর্ণখণ্ডের এমন মানুষের সঙ্গে অনেকদিন কথা হয় না। জঙ্গলে থেকে পুরোপুরি জংলি হয়ে যাচ্ছি।

একটা হাতির বাচ্চার কথা লিখেছিলাম না? হাতির বাচ্চা পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে। এক রাতে তার মা তাকে নিয়ে গেছে। খুবই মন খারাপ হয়েছিল। হাতির বাচ্চার মতো সুন্দর কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হয় না। মানুষের বাচ্চার মতো হাতির বাচ্চাও জানে কী করে আদর আদায় করতে হয়। আমি তার নাম দিয়েছিলাম বাবাজি।

বাবাজি কী করত জানিস? ধর আমি উঠানে বসে কোনো একটা কাজ করছি, সে আমার পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াত। (হাতি বেড়ালের চেয়েও নিঃশব্দে চলাফেরা করতে পারে। বিশাল একটা প্রাণী, তার চলাফেরা নিঃশব্দে। অদ্ভুত না?) তারপর বাবাজি কী করত শোন। আমাকে চমকে দিয়ে সে তার শুড়টা রাখত আমার কাঁধে। আমাকে চমকে দেয়াটাই তার খেলা।

বাবাজি চলে যাবার পর আমার জীবন হঠাৎ করে শূন্য হয়ে গেল। একদিন বাবাজির কথা ভাবতে ভাবতে চোখে পানি এসে গেল। চিন্তা করে দেখ, আমার মতো মানুষের চোখে পানি। কুমিরের চোখে পানির ব্যাখ্যা থাকতে পারে। আমার মতো প্রস্তর মানুষের চোখে পানি!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এখন বলি সবচে মজার ঘটনা। গত পূর্ণিমার রাতে বাবাজিকে তার মা আমার এখানে রেখে গেছে। আমাকে দেখে বাবাজির সে-কী লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি।

আবারো আমার চোখে পানি এসে গেল। দীর্ঘদিন পর হারানো সন্তান ফিরে এলে বাবা যা করেন আমি তাই করলাম। ছুটে গিয়ে বাবাজিকে জড়িয়ে ধরলাম। পুরোপুরি হিন্দি ছবির মিলন দৃশ্য। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকসহ। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিচ্ছিল বাবাজির মা। সে দূর থেকে ঘোৎ ঘোঁৎ ধরনের শব্দ করছিল। শূকর ঘোৎ ঘোৎ করে জানতাম, হাতিও যে করে জানতাম না।

বাবাজি এখন আসা-যাওয়ার মধ্যে আছে। কিছুদিন পর পর তার মা তাকে আমার এখানে দিয়ে যায় আবার নিয়ে যায়। আমার এখানে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বাবাজির চেষ্টা আমাকে বিরক্ত করার। সে আমার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। শুড় দিয়ে টান দিয়ে বিছানা-বালিশ নামিয়ে তছনছ করে। আমি যাতে বিরক্ত হবো সে তাই করবে। বিরাট যন্ত্রণায় আছি।

বাবাজি শুধু যে আমাকে যন্ত্রণা করে তা-না, মাসি পিসিকেও খুব যন্ত্রণা করে। তাদেরকে তাড়া করে। তারাও কম যায় না। প্রায়ই দেখি দাত-মুখ খিচিয়ে বাবাজির দিকে। আসছে। তাদের বৈরীতার ভেতরও মনে হয় একধরনের সখ্য আছে। কবে একদিন দেখলাম, বাবাজির পিঠে মাসি পিসি বসে আছে। বাবাজি ওদের পিঠে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হেলেদুলে হাঁটছে। বাঘ এবং হরিণের সঙ্গে বানরের সখ্যের কথা শুনেছি। হাতির বিষয়ে শুনি নি।

নিজের আনন্দের কথা লিখেই চিঠি ভরে ফেললাম–ততার বিষয়ে কিছুই জানতে চাইলাম না। সরি এবাউট দ্যাট। তুই লিখেছিস তৌ-এর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয় নি। বিয়ে হবে না জানতাম। তারপরেও কষ্ট লেগেছে। তৌ মেয়েটার জন্যে কষ্ট। বিয়ে ভাঙার ঘটনায় মেয়েরা খুব কষ্ট পায়। এই বিষয়টা আমি জানি। আমার বড় বোনের বিয়ে এভাবেই ভেঙেছিল। গায়েহলুদের পর বিয়ে ভাঙল। বড় আপার মাথা খারাপের মতো হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে মানসিক ডাক্তার দেখাতে হয়েছিল। এই ঘটনার পর অনেক ভালো ভালো পাত্র বাবা এনেছিলেন, বড় আপা বিয়ে করতে রাজি হন নি। তিনি বেঁচেছিলেনও অল্পদিন। আমার কেন জানি মনে হয়, বড় আপার সঙ্গে তৌ মেয়েটার চেহারারও মিল আছে। দেখলে বলতে পারতাম। সেই সুযোগ তো নেই।

মতিন শোন, তৌ মেয়েটার বিয়ে তুই ভেঙেছিস, কাজেই তোর দায়িত্ব মেয়েটার যেন ভালো বিয়ে হয় সেটা দেখা। আমি চাই না আমার বড় আপার ভাগ্যে যা ঘটেছে তৌ-এর ভাগ্যে তাই ঘটে।

আজ এই পর্যন্ত।

ইতি–
কঠিন গাধা

পুনশ্চ-১: তোকে বই পাঠাতে বলেছিলাম, বই এখনো পাই নি। সূর্যমুখী ফুলের বিচি পাঠাবি। অনেক বিচি। আমি ঠিক করেছি, একটা গোটা পাহাড়ে সূর্যমুখীর চাষ করব।

পুনশ্চ-২; আসল কথাটাই তোকে লেখা হয় নি। Autobiography of a Fictitious Poet শেষ হয়েছে। কপি নাসির ভাইয়ের কাছে। পাঠিয়ে দিয়েছি।

নাসির ভাইকে মনে আছে না? আমার চাচাতো ভাই। ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক। উনার মতামত জানার জন্যে পাঠিয়েছি। দেখি উনি কী বলেন।

১৫. তৌহিদা এসেছে নিউ সালেহা ফার্মেসিতে

তৌহিদা এসেছে নিউ সালেহা ফার্মেসিতে। সে তার ভাইজানের সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলবে। সালেহা বুবু তাকে নিয়ে ভয়াবহ পরিকল্পনা করেছেন, সেই কথা। কথাগুলি সে শেষ পর্যন্ত বলতে পারবে কি-না বুঝতে পারছে না। হয়তো বলতে পারবে না। কিছুক্ষণ ভাইজানের সামনে চোখমুখ লাল করে বসে থেকে উঠে চলে আসবে। সে কী করে ভাইজানকে বলবে–ভাইজান, সালেহা বুবু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়ার চিন্তা করছেন।

ভাইজান তার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনলে বিরক্ত হবেন। হয়তো তাকে ধমক দিয়ে বলবেন, তোর বুবু অসুস্থ। মাথার ঠিক নাই। সে উল্টাপাল্টা কিছু বলল আর তুই আমাকে সেটা বলার জন্য ফার্মেসিতে চলে এসেছিস? তোর লজ্জা লাগল না? ভাইজান অবশ্যই এ নিয়ে তাকে ধমক দিতে পারেন। কত ছোটবেলায় সে ভাইজানের সঙ্গে থাকতে এসেছে। তখন সবসময় তার নাক দিয়ে সিকনি পড়ত। চোখে পড়লেই ভাইজান বলতেন, কাছে আয় নাক ঝেড়ে দেই। ঝড়বৃষ্টির রাতে ভয়ে তার ঘুম হতো না। বজ্রপাতের সময় বিছানায় বসে কাঁদত। তখন ভাইজান বলতেন, আয় আমার সঙ্গে এসে ঘুমা। গায়ের উপর পা তুলবি না। গায়ের উপর পা তুললে পা ভেঙে দেব।

হাবিবুর রহমান ফার্মেসিতে ছিলেন না। তিনি মোহাম্মদপুর বাজারে গেছেন। শিং মাছ কিনতে। কাচকলা দিয়ে শিং মাছের ঝোল অতি সহজপাচ্য। সালেহার জন্য শিং মাছ তিনি দেখেশুনে কিনেন। পেট লাল হয়ে আছে এরকম শিং মাছ চলবে না। লাল পেটের শিং মাছ গুরুপাক। এই তথ্য সবাই জানে না। তিনি এক কবিরাজের কাছে শুনেছেন।

ফার্মেসির ম্যানেজার হেদায়েতুল ইসলাম তৌহিদাকে দেখে আনন্দিত গলায় বলল, আস আস। আজ সকাল থেকেই কেন জানি মনে হচ্ছিল তুমি আসবে। এসে ভালো করেছ, কিছু ওষুধপত্র দিয়ে দিব। প্রেসারটাও মেপে দিব। সবারই উচিত সপ্তাহে একবার প্রেসার মাপা।

তৌহিদা বলল, ভাইজান কোথায়?

স্যার বাজারে গেছেন। বাজার থেকে সরাসরি ফার্মেসিতে আসবেন।

তৌহিদা ভেতরের ঘরে এসে বসল। ম্যানেজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকে ফ্যান ছাড়তে ছাড়তে বলল, ইস ঘেমে কী অবস্থা! তোমার গা কি বেশি ঘামে? বগল ঘামে? বগল ঘামার লোশন আছে। দিয়ে দিব।

পুরুষমানুষের মুখে এটা কী ধরনের কথা! সে আরো কী বলবে কে জানে। তৌহিদার মনে হলো তার ঘরে এসে বসা ঠিক হয় নি। এই লোক এখন অবশ্যই তার গায়ে হাত দিবে। লোকটার চোখ চকচক করছে।

তৌহিদা বলল, আমি যাই।

বসতে না বসতেই যাই। তোমার সমস্যাটা কী? আমি কি পরপুরুষ? দুদিন পরে আমাকে বিয়ে করছ না!

সূচিপত্র

তৌহিদা যা ভেবেছিল তাই, লোকটা তার হাত ধরে ফেলেছে। এই হাত শুধু যে তার হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে তা না, অন্য কোথাও যাবে। ঐদিন লোকটাকে দাঁড়কাকের মতো লাগছিল। আজও দাঁড়কাকের মতোই লাগছে। বদমাশটা একটা শার্ট পরেছে, উপরের বোতাম লাগায় নি। বুকের পাকা লোম দেখা যাচ্ছে। এরচে কুৎসিত দৃশ্য কি পৃথিবীতে কিছু আছে? তৌহিদা একদৃষ্টিতে লোকটার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। নখ বড় বড় হয়ে আছে। নখের নিচে ময়লা। নাম যেন কী লোকটার? হেদায়েতুল ইসলাম। তার একটা ছেলে একটা মেয়ে। ছেলেটার নাম গোলাপ। এই লোকটার সঙ্গে বিয়ে হলে সে তাকে ডাকবে গোলাপের বাপ। লোকটার হাত এখন তৌহিদার উরুতে। তৌহিদা কী বলবে–এই গোলাপের বাপ, হাত সরাও? না-কি বলবে, এই হারামজাদা! হাত কোথায় রেখেছিস? থাপ্পড় দিয়ে তোর দাঁত ফেলে দিব।

তৌহিদা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। হেদায়েতুল ইসলাম বলল, কী হলো, যাও কোথায়?

তৌহিদা বলল, আমার কাজ আছে।

চা আনতে বলেছি। চা খেয়ে যাও। এই ফাঁকে প্রেসারটা মেপে দেই। আমি সিওর তোমার প্রেসার আছে।

তৌহিদা প্রায় ছুটেই বের হয়ে গেল। কিছুই বলা যায় না এই লোক তাকে ঝাপ্টে ধরে ফেলতে পারে।

এই শোন, স্যারকে কী বলব?

আপনার যা ইচ্ছা বলুন।

সাহসী মেয়ে তৌহিদা কখনোই ছিল না। আশ্রিত মেয়েরা কখনো সাহসী হয় না। তাদের মধ্যে পরগাছা ভাব থেকেই যায়। তারপরেও সে আজ ভালো রকম সাহস দেখাল। বাসায় ফিরে না গিয়ে রিকশা নিয়ে মতিনের মেসে উপস্থিত হলো। মতিনের মেসে (বেঙ্গল মেস) সে আগে কখনো আসে নি। কথাটা পুরোপুরি সত্যি না। এর আগে দুবার এসেছে, তবে ভেতরে ঢোকে নি। ভেতরে ঢোকার সাহস হয় নি। গেটের সামনে থেকে ফিরে গেছে। আজ সে ঢুকে পড়েছে। রুম নাম্বার সতেরো। তৌহিদা জানে না সে মতিনকে কী বলবে। তার জীবনের ভয়ঙ্কর বিপদের কথাটা হয়তো বলবে। কিংবা কিছুই বলবে না। আমেকদিন এই মানুষটাকে সে দেখে না। কিছুক্ষণ চোখের দেখা দেখল। সেটাও তো কম না। তার যেমন কপাল, রুম নাম্বার সতেরোর সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে তালা ঝুলছে। কিছু কিছু মানুষের কপাল এত খারাপ হয় কেন?

দরজায় তালা নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধও না। সামান্য ফাক হয়ে আছে। তৌহিদার এখন কী করা উচিত? দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাওয়া? না-কি দরজায় টোকা দেয়া?

তৌহিদা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল।

আরে তৌ তুমি! What a pleasant surprise. আজ সকাল থেকে মনটা খুব খারাপ। তোমাকে দেখে মন ভালো হয়ে গেছে।

তৌহিদার পা কাঁপছে। কেন জানি তার মনে হচ্ছে সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। পড়ে গেলেই ভালো হয়। মতিন ভাই তখন বাধ্য হয়ে তাকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেবে। সে

কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকবে মতিন ভাইয়ের বিছানায়। এটাও কম কী? তার মতো মেয়ের জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দই থাকবে। বড় আনন্দ কখনোই থাকবে না। বড় আনন্দ ভাগ্যবতীদের। জন্যে। সে কোনোকালেই ভাগ্যবতী ছিল না।

তৌ, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

তৌহিদার মনে হলো মতিন ভাই তাকে তৌ ডাকছেন না। তিনি ডাকছেন বৌ। আর কী সুন্দর করেই না ডাকছেন। বৌ, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো।

সে কোথায় বসবে? ঘরে একটা চেয়ার আছে। চেয়ারে বসলে মতিন ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে বসা হয়। সে যদি বিছানায় মতিন ভাইয়ের পাশে বসে তাহলে কি তিনি রাগ করবেন? কিংবা তাকে বেহায়া ভাববেন?

তৌহিদা চেয়ারে বসতে বসতে বিড়বিড় করে কী যেন বলল! কী বলল সে নিজেও বুঝতে পারল না।

মতিন বলল, তুমি এত দূরে বসেছ কেন? বিছানায় বসো। আমার কাছাকাছি বসো। তোমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছি। আমার মেসের ঠিকানা কোথায় পেয়েছ? আচ্ছা থাক, ঠিকানা কোথায় পেয়েছ বলার দরকার নেই। ঠিকানা পাওয়া ইম্পোর্টেন্ট না। ঠিকানায় চলে আসা ইম্পোর্টেন্ট।

তৌহিদার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে অনেক কষ্টে চোখের পানি সামলে তিনের বিছানায় এসে বসল। মতিন বলল, এখন শোন কেন আমার মনটা খারাপ।

বলুন।

একটা দশ এগারো বছরের ছেলে আছে, তার নাম লমক!

কী নাম? লমক?

তার নাম কমল, আমি উল্টো করে বললাম, লমক। কারণ এই ছেলেটা অনেক কথাই উল্টো করে বলে।

কেন?

ছেলেটা আর দশজনের মতো না। আলাদা। এদের বলে অটিস্টিক বেবি। এই ধরনের শিশুদের অনেকেই মানসিক রোগী ভাবে। তাদের ভাবভঙ্গি সেরকমই। তবে তারা কোনো কোনো দিকে অস্বাভাবিক মেধাবী হয়। কেউ হয় সঙ্গীতে আবার কেউ হয় অঙ্কে। এই ছেলেটির মেধা হাইয়ার ম্যাথে। ছেলেটা তার একটা সিক্রেট আমাকে লিখে জানিয়েছিল। সিক্রেটটা আমি এতদিন পড়ি নি। ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম। আজ সকালে পড়েছি। পড়ার পর থেকে মনে হচ্ছে কেন পড়লাম। সব সিক্রেট জানতে নেই।

তৌহিদা ক্ষীণ স্বরে বলল, সিক্রেটটা কী?

মতিন বলল, সিক্রেট বলে বেড়ানোর বিষয় না। তাহলে আর সিক্রেট থাকে না।

তৌহিদা বলল, সে আপনাকে তার সিক্রেট বলল কেন?

সিক্রেট কাউকে না কাউকে বলতে হয়। তুমি কি তোমার জীবনের সব গোপন বিষয় নিজের কাছে রেখে দিয়েছ? কাউকে নিশ্চয়ই বলেছ।

আমার বলার কেউ নেই।

এখন নেই, কোনো একদিন হবে তখন বলবে।

তৌহিদা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, গোপন কথা বলার মতো কেউ হবে

মতিন বলল, এরকমও হতে পারে। তখন কী করতে হয় জানো? তখন গোপন কথা দিয়ে কবিতা লিখতে হয়। কবিতা লিখে সবাইকে জানিয়ে দিতে হয়। নদ্দিউ নতিম এই কাজটাই সারাজীবন করেছেন।

নদ্দিউ নতিম কে?

একজন উজবেক কবি। যেমন তাঁর কবিতা অসাধারণ, মানুষ হিসেবেও তিনি অসাধারণ। তার একটা কবিতা তোমাকে পড়ে শোনাই? গোপন কথা নিয়ে তার একটা কবিতা আছে–

একটি গোপন কথা
পদ্ম জেনেছিল
পদ্ম তাই লজ্জায়
লুকিয়েছে মুখ
মীনদের মাঝে কোলাহল

পদ্মের হয়েছে আজ
কেমন অসুখ?

মতিন কবিতা পড়ে যাচ্ছে, পাশে বসে চোখ মুছছে তৌহিদা। একই সঙ্গে তার ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে আবার ভয়ঙ্কর আনন্দও হচ্ছে। কষ্টের কারণটা স্পষ্ট, কিন্তু আনন্দের কারণটা স্পষ্ট না। সে সারাজীবন এই মানুষটার পাশে বসে থাকতে পারবে না। তাকে একসময় উঠে চলে যেতে হবে। তার একদিন বিয়ে হবে। গায়ে ঘামের গন্ধভর্তি কোনো এক দাঁড়কাকের সঙ্গেই হবে। সেই দাঁড়কাক তাকে কবিতা শোনাবে না, সে হাত বুলাবে তার উরুতে।

তৌহিদা কবিতা পড়ার মাঝখানেই উঠে দাঁড়াল। মতিন বলল, কোথায় যাও?

তৌহিদা বলল, বাসায় যাব। আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।

এসো আমি একটা ট্যাক্সি করে দেই।

তৌহিদা চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, আপনাকে আসতে হবে না।

কাঁদছ কেন?

আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাদছি। আপনার কী?

দুটা মিনিট বসো তো। চা খাও।

এই মানুষটা তাকে চা খেতে বলছে। দাঁড়কাকটাও বলেছিল। দুজনের কথা বলার ধরন কত আলাদা।

তৌহিদা উঠে দাঁড়াল। মতিন ঝট করে তার হাত ধরে টেনে বসাল। দাঁড়কাকটাও তার হাত ধরেছিল।

তৌ শোন, মন খারাপ করে কাঁদতে কাঁদতে তুমি আমার ঘর থেকে যাবে তা আমি হতে দেব না।

তৌহিদা ফেঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আপনি আমার মন ভালো করে দেবেন?

মতিন বলল, অবশ্যই।

তৌহিদা বলল, কীভাবে?

কোনো একটা জটিল জিনিস তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দেব। একটা ধাধা। তুমি ধাধার রহস্য বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। মন খারাপ ভাব দূর হয়ে যাবে। তুমি একটা কাজ কর, ড্রয়ারটা খোল। কমলের লেখা সিক্রেটটা ড্রয়ারে আছে। হাতে নাও। পড়। দেখ কোনো অর্থ বের করতে পার কি-না।

তৌহিদা ড্রয়ার খুলে কাগজ হাতে নিল। হিজিবিজি এইসব কী লেখা? এর অর্থ কী?

অর্থ বের করার চেষ্টা কর।

তৌহিদা গভীর মনোযোগে লেখা পড়ার চেষ্টা করছে।

মতিন বলল, দেখি তোমার বুদ্ধি।

terces ym uoy gnillet ma I owN. kram htrib a evah I. redluohs thgiR. der si ruoloC...

তৌহিদা কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলল, এটা কি কোনো বিদেশী ভাষা?

বিদেশী ভাষা অবশ্যই। তবে তোমার জানা ভাষা। ইংরেজি।

কমল তার ঘরের রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল। মুনা দরজার পাশ থেকে বললেন, কমল, আসব?

কমল জবাব দিল না। আগের মতোই দুলতে থাকল। মুনা ঘরে ঢুকলেন। ছেলের ডানপাশে রাখা সাইডটেবিলে বসলেন। কমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি যদি দোলা বন্ধ কর তাহলে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে পারি।

এখন গল্প করব না।

গল্প না। তোমাকে আমার কিছু জরুরি কথা বলা দরকার।

কমল বলল, won ton.

এর মানে কী? কমল বলল, এর মানে Not now.

মুনা বললেন, কথাটা আমার এখনই বলা দরকার।

তাহলে বলো। কিন্তু আমি দোলা বন্ধ করব না।

তুমি না-কি তোমার বাবাকে বলেছ মতিন নামের লোকটিকে ছাড়া তুমি কোথাও যাবে না?

হুঁ।

কেন?

বাবাকে explain করেছি।

আমাকেও কর। তোমার মুখ থেকেই তোমার এক্সপ্লেনেশন শুনতে চাই।

এককথা বারবার বলতে ইচ্ছা করে না।

তুমি এককথা বারবার বলো।

এখন বলব না। এখন আমি অন্য একটা জিনিস নিয়ে চিন্তা করছি।

জিনিসটা কী?

Hilberts hotel paradox. হিলবার্টের হোটেলে আছে অসীম সংখ্যার রুম। প্রতিটি রুমে একজন অতিথি আছে। তখন হঠাৎ করে আরো অসীম সংখ্যার অতিথি উপস্থিত হলো। তারা কোথায় থাকবে? মা, তুমি বলো তারা কোথায় থাকবে?

মুনা হতাশ গলায় বললেন, তারা অন্য হোটেলে যাবে।

কমল বলল, না। কারণ আলফা নাল প্লাস আলফা নাল সমান সমান আলফা নাল। আবার আলফা নাল গুণন আলফা নাল সমান সমান আলফা নাল।

আলফা নাল কী?

আলফা শব্দ এসেছে হিব্রু আলেফ থেকে। আলফা নাল হলো যেখানে সব স্বাভাবিক সংখ্যা আছে। ম্যাথমেটিশিয়ান Cantor এটা বের করেছিলেন। মা, বোর্ডে লিখব?

মুনা কিছু বললেন না। কমল উৎসাহের সঙ্গে বোর্ডের সামনে দাঁড়াল। হাতে লাল চক নিয়ে লিখতে লাগল—

a0 + 1 = a0

a0 + a0 = a0

a0 x a0 = a0

(a0)^50 = a0

(a0)^(1/2) = a0

মুনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে থাকার আর অর্থ হয়। চলে যাওয়াও যাচ্ছে না, কমল মন খারাপ করবে। বিদঘুটে লেখাগুলি লিখে সে যে আনন্দ পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে। তার চোখ ঝলমল করছে। তাকে দেখাচ্ছেও সুন্দর। একজন ক্ষুদে মাস্টার। চক-ডাস্টার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ছড়ার কানাই মাস্টার–

আমি আজ কানাই মাস্টার
পড় মোর বিড়াল ছানাটি...

কমল মার দিকে তাকিয়ে বলল, মা, ইন্টারেস্টিং না?

মুনা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। কমল বলল, এরচে ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবে?

এরচে ইন্টারেস্টিং জিনিসও আছে?

অবশ্যই আছে। এখন আমি একটা সিরিজ লিখব। সিরিজটা মন দিয়ে দেখ।

কমল বোর্ডের একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত একটা সিরিজ লিখল–

1-1+1-1+1-1+1-1+1-1...

মা, সিরিজটা দেখেছ?

হুঁ।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এর উত্তর কত?

মুনা বললেন, উত্তর শূন্য। প্লাস মাইনাসে সব কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে।

কমল বলল, একই সিরিজ আমি ব্র্যাকেট দিয়ে লিখছি। দেখ কী হয়–

1+(-1+1)+(-1+1)+(-1+1)...

এর উত্তর কত মা?

মুনা বললেন, ওয়ান!

কমল বলল, এখন কি মজাটা বুঝতে পারছ মা? একই সিরিজের উত্তর একবার হচ্ছে শূন্য। আরেকবার হচ্ছে One, অদ্ভুত না?

মুনা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কমল বলল, One যদি হয় বাতি জ্বলা আর শূন্য যদি হয় বাতি নেভা, তাহলে কী হয়? এই সিরিজটা অগ্রসর হচ্ছে, বাতি জ্বলছে বাতি নিভছে। আমরা পুরোপুরি কখনো বলতে পারব না–বাতি জ্বলছে না নিভছে।

মুনা বললেন, তোমার এইসব শুনে আমার মাথা ধরে যাচ্ছে। তুমি বাতি জ্বালাতে থাক নিভাতে থাক, আমি ঘুমুতে গেলাম।

সালেহ ইমরান তাঁর স্টাডিরুমে টিভি ছেড়ে বসেছেন। দেখছেন সিএনএন। টিভিতে একদল সন্ত্রাসীকে দেখাচ্ছে। তারা রাশিয়ার একটা স্কুলের একদল ছাত্রকে আটকে রেখেছে। হুমকি দিচ্ছে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। তবে তাদের দলের যে কজন রাশিয়ার কারাগারে আছে তাদের ছেড়ে দিলে এই কাজটা তারা করবে না। সালেহ ইমরান ভেবেই পাচ্ছেন না একদল অবোধ শিশুকেও কেউ জিম্মি করতে পারে! ঘটনা কোনদিকে মোড় নেয় দেখার জন্যে তিনি আজ প্রায় সারাদিনই টিভির সামনে বসেছিলেন। তার ধারণা শেষ পর্যন্ত প্রতিটি শিশুই মুক্তি পাবে। শিশুদের বাবা-মারা বাইরে অপেক্ষা করছেন। তারা যখন তাদের বাচ্চাদের ফিরে পাবেন তখন যে আনন্দময় পরিবেশ হবে সেটা দেখার জন্যেই সালেহ ইমরান অপেক্ষা করছেন। তার ধারণা এই দৃশ্যটি হবে জগতের মধুরতম কিছু দৃশ্যের একটি।

রাত এগারোটা। মুনা স্টাডিরুমের দরজা ধরে দাঁড়ালেন। দরজায় টোকা দিলেন। সালেহ ইমরান টিভি পর্দা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মুনা বললেন, তুমি ঘুমুবে না?

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি শুয়ে পড়, আমার দেরি হবে।

মুনা বললেন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।

আগামীকাল শুনি।

যে-কথা এখন বলতে চাচ্ছি আগামীকাল তা নাও বলতে ইচ্ছা হতে পারে।

কথাগুলি কি খুবই জরুরি?

হ্যাঁ জরুরি। খুব জরুরি কি-না তা জানি না, তবে জরুরি।

সালেহ ইমরান বললেন, কথাগুলি কি এখানেই বলবে,–কি আমাকে বিশেষ কোনো জায়গায় যেতে হবে?

মুনা বললেন, এখানেও বলতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আমি প্রেমের কোনো সংলাপ বলব না যে তোমাকে নীপবনে যেতে হবে।

সালেহ ইমরান টিভি বন্ধ করলেন। মুনা এসে তাঁর সামনে বসতে বসতে সহজ গলায় বললেন, এই বাড়িতে বাস করে আমি কোনো আনন্দ পাচ্ছি না।

এই কথা তো আগেও কয়েকবার শুনেছি। এটাই তোমার জরুরি কথা?

হ্যাঁ। এই বাড়িতে কোনো আনন্দ নেই। আমি যখন ছেলের কাছে যাই, সে হিজিবিজি কথা বলে। আমি যখন তোমার কাছে আসি, তুমি ঝিম ধরে থাক। তোমার এই বাড়িটাতে মনে হয় সময় থেমে আছে।

তোমার বাড়ি তোমার বাড়ি করছ কেন? বাড়িটা তো তোমারও।

মুনা বললেন, এই বাড়িটাকে কখনো আমার নিজের বাড়ি মনে হয় নি। বাড়িটাকে আমার হোটেলের মতো লাগে। যে হোটেলে আমি গেস্ট হিসেবে থাকতে এসেছি। মেয়াদ শেষ হলে বিল মিটিয়ে চলে যাব।

বিল মেটাতে চাচ্ছ?

মুনা বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ চাচ্ছি।

সালেহ ইমরান বললেন, কমল? কমলের কী হবে?

সে থাকবে তোমার সঙ্গে। তোমাকে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি পছন্দ করে। তাছাড়া তার পাশে কে আছে কে নেই এটাকে সে কোনোরকম গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না।

মুনা উঠে দাঁড়ালেন।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার কথা শেষ?

মুনা বললেন, হ্যাঁ শেষ। এখন তুমি টিভি ছাড়তে পার। চা বা কফি লাগবে? পাঠাতে বলব?

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার কথার সারমর্ম কী? মুনা বললেন, সারমর্ম হলো, আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না।

১৬. ফার্মেসির ম্যানেজার হেদায়েতুল ইসলাম

নিউ সালেহা ফার্মেসির ম্যানেজার হেদায়েতুল ইসলামের চাকরি আজ দুপুর বারটায় নট হয়েছে। শুধু যে নট হয়েছে তা-না, হাবিবুর রহমান ফার্মেসির আরেক কর্মচারী সামছুকে বলেছেন–হারামজাদা ম্যানেজারটার গালে শক্ত করে একটা চড় দাও দেখি।

সামছু চড় দেয় নি। সে মাথা নিচু করে সামনে থেকে বিদায় হয়েছে।

হেদায়েতুল ইসলামের চাকরি যাওয়ার কারণ সে মাঝে মধ্যেই রাতে ফার্মেসিতে থেকে যেত। গভীর রাতে নিশিকন্যাদের আনাগোনা হতো। ব্যাপারটা অনেকদিন থেকেই চলছিল। হাবিবুর রহমান ধরতে পারেন নি। আজই ধরা পড়েছে। হাবিবুর রহমান মোহাম্মদপুর বাজার থেকে কাঁচাবাজার করে ফিরেছেন। গরমে ঘেমে অস্থির। তিনি কিছুক্ষণ ফ্যানের বাতাস খাবার জন্য ফার্মেসির পেছনের ঘরটায় ঢুকলেন। ফ্যান ছেড়ে দিলেন, তখন তাঁর চোখে পড়ল বালিশের কাছে কালো কী যেন ঝলমল করছে। হাতে নিয়ে দেখেন কনডমের খোলা প্যাকেট। তিনি ডেকে পাঠালেন সামছুকে। সে রাতে ফার্মেসির মেঝেতে তোষক বিছিয়ে ঘুমায়।

সামছু এসে সামনে দাঁড়াল। হাবিবুর রহমান ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এই বস্তুটা আমি আমার বিছানায় বালিশের কাছে পেয়েছি। বস্তুটা চেন? হাতে নিয়ে দেখ।

সামছু হাতে নিয়ে বলল, চিনি স্যার।

এই বস্তু আমার ঘরে এলো কীভাবে? ঠিকমতো জবাব দিবে। বলো। কীভাবে এসেছে? কে এনেছে? কে এই জিনিস ব্যবহার করেছে?

আমি জানি না স্যার।

কে জানে?

ম্যানেজার সাব জানে।

ম্যানেজার সাহেব কাল রাতে এখানে ছিল?

জি স্যার।

কোনো মেয়ে এসেছিল তার কাছে?

জি স্যার।

কোন মেয়ে?

নাম জানি না স্যার। আজেবাজে মেয়ে।

ম্যানেজার কি প্রায়ই ফার্মেসিতে থেকে যেত?

জি স্যার।

আমাকে আগে বলো নি কেন?

ম্যানেজার সাব বলতে নিষেধ করেছিলেন।

আচ্ছা তুমি যাও। ম্যানেজারকে পাঠাও।

হেদায়েতুল ইসলাম এসে মাথা কাত করে দাঁড়িয়ে রইল। হাবিবুর রহমান। ভেবে পেলেন না এত বড় একটা বদমাশ এত দিন বদমায়েশি করে যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। উল্টো তার বিয়েও ঠিক করে ফেলেছেন।

তোমার চাকরি নট।

জি আচ্ছা স্যার।

ক্যাশের চাবি আমার কাছে দিয়ে বিদায় হও।

জি আচ্ছা।

এক তারিখ এসে ভাংতি মাসের বেতন নিয়ে যাবে।

হেদায়েতুল ইসলাম পিচ করে তার পায়ের কাছে থুথু ফেলে বলল, বেতন লাগবে না।

হাবিবুর রহমানের এই পর্যায়ে ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি সামছুর দিকে তাকিয়ে বললেন, হারামজাদা ম্যানেজারটার গালে শক্ত করে একটা চড় দাও দেখি।

সামছু চড় দেয় নি। মাথা নিচু করে বের হয়ে গেছে। সামছুটাও বদমাশ। তাকেও বিদায় করা উচিত। একসঙ্গে সব বিদায় করলে তিনি চলবেন কীভাবে? এই তো এখনই সামছুকে লাগবে। বাসায় বাজার পাঠাতে হবে। আজ টাটকা মলা মাছ পেয়েছেন। মাছ এখনই না পাঠালে টাটকা মাছ কেনা অর্থহীন হয়ে যাবে। রাতে ফার্মেসিতে কাউকে না কাউকে থাকতে হবে। তার পক্ষে ফার্মেসিতে থাকা সম্ভব না। হঠাৎ করে সালেহার শরীর অতিরিক্ত খারাপ করেছে। একা একা বাথরুমে যেতে পারে না। তাকে ধরে ধরে নিতে হয়।

ম্যানেজারের ঘটনা শুনে তার কী রিঅ্যাকশান হয় কে জানে। রোগে ভুগে ভগে তার মেজাজ হয়েছে অতিরিক্ত খারাপ। সামান্য কারণে এমন হৈচৈ শুরু করে! সালেহাকে মূল ঘটনা বলা যাবে না। ঘটনা অতিরিক্ত নোংরা। বলতে হবে টাকা-পয়সা চুরি করেছে বলে চাকরি গেছে। তৌহিদা বেচারির ভাগ্যটা খারাপ যাচ্ছে। কোনো বিয়ে নিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত এগুতে পারছেন না। মনে হয় তাবিচ-কবচের কোনো ব্যবস্থা করতে হবে। বিয়ে-শাদির জন্যে তাবিচ-কবচে ভাললা তদবির আছে। সবচে ভালো হতো যদি আজমির শরিফের সুতা এনে বাঁ-হাতে পরানো যেত। আজমির শরিফের সুতা মন্ত্রের মতো কাজ করে।

সামছু! সামছু কই?

সামছু এসে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হাবিবুর রহমান বললেন, মাছ নিয়ে বাসায় দিয়ে আস। বলবে ঝাল ঝাল করে যেন রান্না করে।

জি আচ্ছা স্যার।

তেলাপিয়া মাছ আছে। তেলাপিয়ার ভাজি।

জি আচ্ছা স্যার।

মাছ দিয়ে এসে আমার এই ঘরের পাটি ফেলে দিবে। বালিশ ফেলে দিবে। নতুন পাটি নতুন বালিশ কিনে আনবে।

জি আচ্ছা স্যার।

ডেটলের পানি দিয়ে ঘর ধুবে।

জি আচ্ছা স্যার।

তুমি নিজেও আমাকে যথাসময়ে খবর না দিয়ে বিরাট অন্যায় করেছ। তুমিও অপরাধী।

জি স্যার অপরাধী।

তুমি আগে কানে ধরে পঞ্চাশবার উঠবোস কর, তারপর বাজার নিয়ে যাও।

সামছু মনে হলো এই শাস্তিতে আনন্দিত। সে আগ্রহ নিয়ে উঠবোস করছে। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে না সে লজ্জা পাচ্ছে। উঠবোস করতে তার যে কষ্ট হচ্ছে তাও না। অর্থহীন শাস্তি। হাবিবুর রহমান বিরক্ত মুখে বললেন, ঠিক আছে আর লাগবে না, এখন মাছ নিয়ে রওনা দাও।

হাবিবুর রহমান বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যাবেলায়। শোবার ঘরে ঢুকে তিনি হতভম্ব। সালেহা ছটফট করছে। তাঁর চোখের মণি স্থির। হাত-পা শক্ত।

হাবিবুর রহমান বললেন, কী হয়েছে?

তিনি বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললেন, কলেমা পড়। চার কলেমা পড়ার দরকার নাই, শুধু কলেমা তৈয়ব।

হাবিবুর রহমান বললেন, কলেমা পড়ব কেন?

সালেহা বেগম বললেন, আমি মারা যাচ্ছি এইজন্যে।

হাবিবুর রহমান বললেন, আগে ডাক্তারের ব্যবস্থা করি। পরে কলেমা।

সালেহা বেগম হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার ডাক্তার লাগবে না। আজরাইল চলে এসেছে। আমি চোখের সামনে দেখছি। ঐ তো দাঁড়ানো।

সালেহা বেগমের দৃষ্টি একটি বিশেষ দিকে স্থির হয়ে গেল। হাবিবুর রহমান। ভীত গলায় বললেন, বলো কী? লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

হৈচৈ শুনে তৌহিদা ছুটে এসেছে। সেও হতভম্ব। সালেহা বললেন, তৌহিদা, তুই আমাকে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে শোনা। বলেই স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন–ওগো তুমি আমার হাত ধরে পাশে বসো। আমার মাথা কোলে নাও। আমি তোমার কোলে মাথা রেখে মরব।

হাবিবুর রহমান স্ত্রীর মাথা কোলে নিলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তৌহিদা সূরা ইয়াসিন পাঠ করা শুরু করল না, সে সালেহার পায়ের তালুতে সরিষার তেল মালিশ করতে লাগল। সালেহা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, মরণের সময় আমি যদি তোমার কাছে একটা জিনিস চাই তুমি কি দেবে?

হাবিবুর রহমান ধরা গলায় বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।

আল্লাহপাকের নামে কীরা কাট।

হাবিবুর রহমান আল্লাহর নামে শপথ করলেন। সালেহা বেগম বললেন, আমি তো মারা যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর পর তোমাকে কে দেখবে? তুমি বিবাহ করবে।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার মৃত্যুর পর আমি বিবাহ করব, কথা দিলাম। এখন শান্ত হও।

যে-কোনো মেয়ের হাতে আমি তোমাকে দিব না। আমি নিজে পছন্দ করে তোমার বিয়ে দিয়ে যাব। তুমি বিয়ে করবে তৌহিদাকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার মত আছে।

হতভম্ভ হাবিবুর রহমান বললেন, এইসব কী বলো!

সালেহা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, তুমি আল্লাহর নামে কীরা কেটেছ। ভুলে যেও না। এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ হয় না। স্ত্রীর অনুমতি থাকতে হয়। আমার অনুমতি আছে। আমি তোমার বিয়েতে সাক্ষী হবো।

তুমি শান্ত হও। আমি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করি।

সালেহা বললেন, অ্যাম্বুলেন্স না। তুমি কাজির ব্যবস্থা কর। এক্ষণ যাও। আমি আর বেশি সময় নাই। তোমার বিয়ে না দিয়ে আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি কিন্তু সারাজীবনের জন্যে দায়ী থাকবে।

সালেহা বড় বড় করে শ্বাস নিতে নিতে কলেমা তৈয়বা পড়তে লাগলেন।

হাবিবুর রহমান তৌহিদার দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, কী করিরে তৌহিদা?

তৌহিদা বলল, ভাইজান, বুবু যা বলছেন তাই করেন। উনার পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হাবিবুর রহমান বললেন, তুই কি পাগল হয়ে গেলি? তোকে কেন বিয়ে করব!

সালেহা বললেন, তাহলে থাক। বিয়ের দরকার নাই। আমাকে তোমরা বিদায় দাও।

সালেহার খিঁচুনি শুরু হলো।

রাত আটটায় তিন লক্ষ এক টাকা দেনমোহরে হাবিবুর রহমানের সঙ্গে তৌহিদার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর পর সালেহার শ্বাসটানা স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, তৌহিদা, আমাকে কড়া করে এককাপ চা দাও।

তৌহিদা চা আনতে উঠে গেল। সালেহা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বিয়ে হয়ে গেছে বলে একসঙ্গে ঘুমানো শুরু করবে না। একসঙ্গে থাকা শুরু করবে আমার মৃত্যুর পর। তার আগে না। তৌহিদাকে বলে দিবে, তোমাকে আগে যেমন ভাইজান ডাকত এখনো যেন ভাইজান ডাকে।

হাবিবুর রহমান বিড়বিড় করে বললেন, তোমার শরীরের অবস্থা কী?

সালেহা বললেন, ভালো। মাছ দিয়ে মাষকালাইয়ের ডাল খেতে ইচ্ছা করছে। তুমি মাষকালাইয়ের ডাল নিয়ে আস। খোসাসহটা আনবে। টাকি মাছ। আনবে। অন্য মাছ না।

হাবিবুর রহমান বললেন, তুমি এটা কী করলে?

সালেহা বললেন, যা করেছি ঠিক করেছি। তুমি আমার ছাগল ভাইটাকে টেলিফোন করে বিয়ের খবর দাও।

দরকার কী?

সালেহা বললেন, দরকার আছে। যা করতে বলছি কর। ঠিক আছে তোমাকে ফোন করতে হবে না। আমিই করব। লাইন ধরে দাও।

এখনই টেলিফোন করতে হবে না। তোমার শরীর ভালো না। তুমি রেস্ট নাও।

কে বলেছে আমার শরীর ভালো না। আমার শরীর ঠিকই আছে। কই টেলিফোন ধরে দাও।

হাবিবুর রহমান টেলিফোনে মতিনকে ধরে রিসিভার এগিয়ে দিলেন। সালেহা বললেন, কে? মতিন?

মতিন বলল, কেমন আছ বুবু? অনেকদিন পর তোমার গলা শুনলাম। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে ভালো আছ।

হুঁ ভালো আছি।

দুলাভাই কেমন আছেন?

সেও ভালো আছে। সে আরেকটা বিয়ে করেছে।

বলো কী? কবে?

এই তো কিছুক্ষণ আগে। তিনলক্ষ এক টাকা দেনমোহরে তৌহিদাকে বিয়ে করেছে।

তোমার কথার আগামাথা পাচ্ছি না। দুলাভাই তৌহিদাকে কেন বিয়ে করবে?

তুই বিয়ে করবি না বলে তোর দুলাভাইও করবে না এটা কেমন কথা!

বিয়ে কি সত্যি হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। এক কথা কতবার বলব!

দুলাভাই এখন আছেন কোথায়?

এখানেই আছে। তৌহিদাও আছে। তোর দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবি?

এখন বলব না। পরে বলব। ঘটনাটা আগে হজম করে নেই।

সালেহা তৃপ্তি তৃপ্তি গলায় বললেন, যা হজম কর। এমনিতে হজম না হলে হজমি বড়ি খা।

সালেহা আরাম করে চা খেলেন। অনেকদিন পর নিজেই মাষকালাই দিয়ে টাকি মাছ রান্না করলেন। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে বললেন, অনেকদিন একসঙ্গে ছবি দেখা হয় না। ভিসিআর-এ একটা ছবি ছাড় তো। পাহেলি নামের একটা ছবি আনা আছে, ঐটা ছাড়। তৌহিদাকে ডাক। সেও দেখুক। দুই পাশে দুই বউ নিয়ে ছবি দেখার আলাদা মজা। হি... হি... হি...।

তৌহিদা ছবি দেখতে রাজি হলো না। সালেহা অনেক রাত পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে ছবি দেখলেন। ছবিতে এক মেয়ের স্বামী বিয়ের পর পর বিদেশে চলে যায়। তখন একটা ভূত স্বামীর বেশ ধরে মেয়েটির সঙ্গে বাস করতে আসে, তাদের একটা বাচ্চাও হয়।

ছবি দেখতে দেখতে সালেহা বললেন, ভূত স্বামীর ছায়া পড়ছে না। দেখ ভালো করে, সবার ছায়া পড়ে, ভূতটার পড়ে না।

হাবিবুর রহমান চিন্তিত গলায় বললেন, তোমার শরীর তো মনে হয় ঠিক হয়ে গেছে।

সালেহা বললেন, তাতে কি তোমার কোনো সমস্যা?

হাবিবুর রহমান বললেন, সমস্যা হবে কেন?

ছবি শেষ করে সালেহা মুখভর্তি পান নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ শরীরটা বেশ ভালো লাগছে। তোমার বিশেষ কিছু লাগলে বলো? লাগবে কিছু?

হাবিবুর রহমান না-সূচক মাথা নাড়লেন। সালেহা আরাম করে ঘুমালেন। এমনিতে রাতে কয়েকবার তার ঘুম ভাঙে। পানি খান। মাথার তালু গরম হয়ে যায়। তালুতে ভেজা ন্যাকড়া দিতে হয়। আজ রাতে সে-সব কিছুই হলো না। তবে হাবিবুর রহমানের এক ফোঁটা ঘুম হলো না। তিনি সারারাত স্ত্রীর পাশে জেগে বসে রইলেন। মনে মনে মন্ত্র জপের মতো বলতে লাগলেন, ভুল করেছি। বিরাট ভুল। আকাশপাতাল ভুল। স্ত্রীর প্ররোচনায় সব স্বামী এরকম ভুল করে। আদম আলায়সসালামকে গন্ধম কে খাইয়েছে? বিবি হাওয়া।

তৌহিদাও জেগে রইল। সে তার ঘরের বাতি জ্বেলে তাকিয়ে থাকল সিলিং ফ্যানের দিকে। সিলিং ফ্যানে শাড়ি ঝুলিয়ে মেয়েরা ফাঁস নেয়। তার নিজের মাও এই কাণ্ড করেছিলেন। আদর্শ মায়ের আদর্শ মেয়ে হিসেবে এই কাজটা কি সে করতে পারে না? শাড়ি কীভাবে গলায় পেঁচায়? মতিন ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর তার জন্যে একটা বিয়ের শাড়ি কেনা হয়েছিল। ঐ শাড়িটা গলায় পেঁচালে হয় না? কেন হবে না! অবশ্যই হয়, সাহস করে পেঁচিয়ে দিলেই হয়।

ভোরবেলায় তৌহিদাকে পাওয়া গেল সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। তার গায়ে পেটিকোট ছাড়া কোনো কাপড় নেই। পরনের শাড়ির একটা মাথা ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। অন্য মাথা বিছানায়। তৌহিদা খাটে হেলান দিয়ে বসে আছে।

তৌহিদা অনেকবেলা পর্যন্ত ঘরে বসে আছে কেন এটা দেখতে গিয়ে তাকে এই অবস্থায় পাওয়া গেল। তৌহিদা সালেহাকে দেখে খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, বুবু, পান খাব। আমাকে জর্দা দিয়ে একটা পান দেন।

সালেহা ভীত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে?

তৌহিদা বলল, আমার কিছু হয় নাই। বুবু, একটা পান দেন।

তুই নেংটা হয়ে বসে আছিস কী জন্যে?

তৌহিদা বলল, পান খেয়ে গোসল করব, তারপর নতুন শাড়ি পরব।

তোর কি জ্বর? দেখি কপালটা।

তৌহিদা কঠিন গলায় বলল, খবরদার আমার গায়ে হাত দিবা না। স্বামী ছাড়া কেউ আমার গায়ে হাত দিবে না। বুবু, পান কই? খালিমুখে কতক্ষণ বসে থাকব।

ঘরে পান ছিল না। হাবিবুর রহমান পান নিয়ে এলেন। তৌহিদা মুখে পান নিয়ে আরাম করে চিবুচ্ছে। পানের পিক ফেলছে। তার আচার আচরণে স্পষ্ট কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। শাড়ি পরতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তবে সালেহা তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হাবিবুর রহমানের একটা পাঞ্জাবি পরিয়ে দিয়েছেন।

হাবিবুর রহমান খুবই ভয় পেয়েছেন। তিনি ঘরে ঢুকছেন না। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সেখান থেকেই বললেন, তৌহিদা, তোর কি রাতে ঘুম হয় নাই?

তৌহিদা বলল, জি-না ভাইজান।

ফ্যানে শাড়ি ঝুলিয়েছিস কী জন্যে?

সেটা তোমাকে বলব না ভাইজান। বললে তুমি রাগ করবে।

আচ্ছা থাক বলার দরকার নাই।

ভাইজান, আমি দেশের বাড়িতে যাব। আমাকে দেশের বাড়িতে রেখে আস।

দেশের বাড়িতে তো তোর কেউ নাই।

না থাকুক, আমি যাব। আমাকে ট্রেনে তুলে দিলেই আমি যেতে পারব।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোকে ঘুমের ওষুধ দিব। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আরাম করে ঘুমা। ঘুম ভাঙলে তোকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাব।

একটা নতুন স্যুটকেস কিনে দিও। আগের স্যুটকেসটার তালা ভাঙা।

নতুন স্যুটকেস কিনে দেব।

ভাইজান, এখন কিনে দাও।

হাবিবুর রহমান হতাশ চোখে সালেহার দিকে তাকালেন। তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর সামনে মহাবিপদ।

১৭. তৌহিদাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে

হাবিবুর রহমান তৌহিদাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসেছেন। ডাক্তারের নাম সালাহউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন শ্রীনরোভে। চেম্বারের সামনে বিরাট সাইনবোর্ড।

ডা. সালাহউদ্দিন চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক (সাইকো)
মনোরোগ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

রোগী দেখিবার সময়
বিকাল পাঁচটা থেকে রাত নয়টা

শুক্রবার বন্ধ

তৌহিদা জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার পরনে হালকা সবুজ রঙের শাড়ি। কলাবউদের মতো সে বিরাট ঘোমটা দিয়েছে। ঘোমটার ভেতর দিয়ে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে কপালের খানিকটা চোখে পড়ছে। সে একেবারেই নড়াচড়া করছে না। তৌহিদার পাশে হাবিবুর রহমান বসেছেন। তার কপাল ঘামছে। তিনি কেন জানি ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন। ডাক্তারের এই ঝামেলা শেষ হলে বাঁচেন এমন অবস্থা। ডাক্তার এবং উকিলের

কাছে কিছু লুকানো যায় না। তাদেরকে সব সত্যি কথা বলতে হয়। হাবিবুর রহমান বুঝতে পারছেন না সব সত্যি কথা তিনি বলতে পারবেন কি-না। ডাক্তার সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে। মানুষটা কঠিন প্রকৃতির। রোগীদের সঙ্গে ধমক দিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন। ভদ্রলোক সারাক্ষণই বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে রেখেছেন।

ডাক্তার তৌহিদার দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, নাম কী?

তৌহিদা সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট স্বরে বলল, বলব না।

কেন বলবেন না?

নাম বলতে ভালো লাগে না।

কী করতে ভালো লাগে?

পান খেতে ভালো লাগে।

এই বলেই সে হাবিবুর রহমানের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ভাইজান, জর্দা দিয়ে পান খাব।

হাবিবুর রহমান বিনীত ভঙ্গিতে ডাক্তারকে বললেন, স্যার, এর পান খাবার অভ্যাস ছিল না। অসুখের পর থেকে পান খায়। আর স্যার এর নাম তৌহিদা। তৌহিদা খানম।

তৌহিদা বলল, মতিন ভাই শুধু ডাকেন তৌ।

ডাক্তার বললেন, মতিন ভাই কে?

হাবিবুর রহমান বললেন, আমার শ্যালক।

ডাক্তার বললেন, আপনার বাসায় তার যাতায়ত আছে?

জি আছে। তবে কম। মাসে দুই মাসে একবার।

ডাক্তার তৌহিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, মতিন সাহেবকে কি আপনার ভালো লাগে?

তৌহিদা বলল, আমি পান খাব। জর্দা দিয়ে পান খাব। আপনার এখানে পান নাই?

ডাক্তার হাবিবুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। জর্দা দেয়া পান কিনে আনুন। পান কিনে এনে ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করবেন। আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবেন না। আমি ততক্ষণ রোগীর সঙ্গে কথা বলব।

হাবিবুর রহমান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে ছিলেন কখন ডাক্তার জিজ্ঞেস করে বসে রোগী কি বিবাহিত? কার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে? বিবাহ কবে হয়েছে? যখন শুনবে হাবিবুর রহমানের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে তখন হুট করে জিজ্ঞেস করবে আপনার সঙ্গে কি আপনার স্ত্রীর যৌন মিলন হয়েছে? মানসিক রোগের ডাক্তারদের মুখে কোনো পর্দা থাকে না। অশ্লীল কথা তারা হুটহাট করে জিজ্ঞেস করে।

হাবিবুর রহমান চারটা জর্দা দেয়া পান কিনলেন। নিজে একটা মুখে দিলেন। বাকি তিনটা পকেটে রাখলেন। চারটা সিগারেট কিনে একটা ধরালেন। তিনি আগে সিগারেট খেতেন

না। সিগারেট খেলে টেনশন কমে এই ভেবে সিগারেট ধরিয়েছিলেন। তার টেনশন কিছুমাত্র কমে নি। মাঝখান থেকে সিগারেটের অভ্যাস হয়ে গেছে।

তৌহিদার মতো ভয়াবহ রোগী ঘরে থাকলে টেনশন কীভাবে কমে? তাকে দেখাশোনা করার তৃতীয় ব্যক্তি নেই। সালেহা পুরোপুরি শয্যাশায়ী। একটা ছুটা কাজের মেয়ে আছে, সকালে এসে হাঁড়ি বাসন মেজে ঘর ঝাট দিয়ে চলে যায়। তাকে চোখে চোখে রাখতে হয়। কারণ এই মেয়ের অভ্যাস যাবার সময় শাড়ির কোচড়ে করে চাল ডাল নিয়ে যাওয়া।

গত সাতদিন থেকে হাবিবুর রহমানের ঘরে রান্নাবান্না হচ্ছে না। তৌহিদার এই অবস্থা, কে রাঁধবে? হাবিবুর রহমানের ব্যবসা-বাণিজ্য মাথায় উঠেছে। বেশির ভাগ সময় তাকে বাসায় থাকতে হয়। যখন বাইরে যান তখন তৌহিদাকে তার ঘরে তালাবন্ধ করে যান। তৌহিদা তাতে কোনো আপত্তি করে না। সে আগে যেমন শান্ত মেয়ে ছিল এখনো তাই আছে। যত শান্তই হোক মাথা খারাপ মানুষের কোনো ঠিক নেই। কোনো একদিন দেখা যাবে কাপড়চোপড় ছাড়া রাস্তায় বের হয়ে পড়েছে। রাস্তার মানুষজন মজা পাচ্ছে। ভ্যাকভ্যাক করে হাসছে।

হাবিবুর রহমান দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরালেন। পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন বের করে মতিনের নাম্বার বের করে আবার চেষ্টা করলেন। রিং হলো না। গত পাঁচদিন ধরে তিনি মতিনের খোঁজ বের করার চেষ্টা করছেন। লাভ হচ্ছে না। একদিন তার বেঙ্গল মেসে গিয়ে দরজার নিচ দিয়ে চিরকুট ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন–

বিরাট বিপদে আছি
সাক্ষাতে কথা হবে।

বাসায় এসো। জরুরি।

তারপরেও মতিন আসে নি। বিপদের সময় আত্মীয়স্বজন না এলে কখন আসবে? জন্মদিনের অনুষ্ঠানে!

মতিনের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে কিছুদিনের জন্যে স্থায়ীভাবে বাসায় এনে রাখা যেত। তার সঙ্গে পরামর্শ করা যেত। পরামর্শ করার জন্যে নিজের লোক লাগে। যার তার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় না! পরামর্শ করার বিষয় অনেক আছে। হাবিবুর রহমান অনেক ঝামেলা করে লৌহজং-এর কবিরাজ হৃষিকেশ ভট্টাচার্য (ভৈষজ্য ধন্বন্তরী, সাহিত্য শ্রী) সাহেবের কাছ থেকে পাগলের তেল আনিয়েছেন। তেলের নাম উন্মাদ ভঞ্জন কনক তৈল। এই তেল তৌহিদার মাথায় দেয়া যাবে কি-না তা নিয়ে পরামর্শ। তেল মাথায় দেবার আগে মাথার সব চুল ফেলে দিতে হবে। এটা করা কি ঠিক হবে? তিনি সালেহার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। সালেহা বলেছেন, অসম্ভব। সালেহার পরামর্শ গ্রাহ্য না। কারণ মহাবিপদে নারীর পরামর্শ নিতে নাই। শাস্ত্রের কথা। কনক তেলের জন্যে যাওয়া আসা বাদেই তাকে এক হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। এক ফাইল পাঁচশ টাকা। তিনি দুই ফাইল কিনেছেন। কবিরাজ সাহেব বলেছেন এক ফাইল। ওষুধেই কাজ হবে। তারপরেও তিনি দুই ফাইল কিনেছেন। যে কবিরাজ নিজ থেকেই এক ফাইল ওষুধ নিতে বলে তার মধ্যে সততা আছে। অসৎ কবিরাজ হলে তিন ফাইল গছিয়ে দেবার চেষ্টা করত।

হাবিবুর রহমান সিএনজি ট্যাক্সি ক্যাবে করে তৌহিদাকে নিয়ে ফিরছেন। তৌহিদা পান চিবোচ্ছে। সে মুখ থেকে ঘোমটা খানিকটা সরিয়েছে। তাকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হচ্ছে।

ডাক্তার সাহেব ওষুধপত্র কিছু দেন নি। তৌহিদাকে ক্লিনিকে ভর্তি করতে বলেছেন। ক্লিনিক মিরপুরে, নাম নিরাময়। ডাক্তার সাহেব নিজেই ক্লিনিক চালান। ক্লিনিকে দুই ধরনের কেবিন আছে। নরমাল কেবিন এবং ডিলাক্স কেবিন। নরমাল কেবিনের ভাড়া প্রতিদিন পাঁচশ টাকা। ডিলাক্স কেবিন এক হাজার টাকা। ডিলাক্স কেবিনে এসি আছে, রঙিন টিভি আছে।

তৌহিদাকে কেবিনে ভর্তি করাবেন কি-না এটা নিয়েও মতিনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। সে গেছে কোথায়?

মতিন কোথাও যায় নি। ঢাকাতেই আছে। দিন দশেক হলো সে বাস করছে। নিশুর সঙ্গে। বাড়িওয়ালার সেজো ছেলে নিশুকে খুবই বিরক্ত করছে। রাত বিরাতে এসে দরজা ধাক্কাচ্ছে। ছেলেটা নেশাখোর। গাঁজা ফেনসিডিল নিয়ে আছে। তার বন্ধু-বান্ধবরাও তার মতোই। বন্ধু-বান্ধবরাও যন্ত্রণা করছে। পুলিশে খবর দেয়া হয়েছিল। পুলিশ এসেওছিল। বাড়িওয়ালা পুলিশকে বলেছেন–নিশু মেয়েটা খারাপ। নানান ধরনের ছেলে তার কাছে আসে। রাতে থাকে। ভদ্রপাড়ায় থেকে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। আমার ছেলে খারাপ এটা জানি। খারাপ যায় খারাপের কাছে। এখন বুঝেছেন ঘটনা?

পুলিশ হয়তো ঘটনা বুঝেছে। তারা কিছুই করে নি।

ঢাকা শহরে একা একটি অল্পবয়েসি মেয়ের ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকা প্রায়। অসম্ভব ব্যাপার। নিশু মেয়েদের কোনো হোস্টেলে চলে যেতে চাচ্ছে। তেমন কিছু পাচ্ছে না।

পল্লবীতে নিশুর আপন মামা থাকেন। নিশু তার কাছেও গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তিন বেডের এক বাড়িতে থাকি, আমাদেরই থাকার জায়গা নাই। তুই কই থাকবি?

নিশু বলেছে, আমি ড্রয়িংরুমে শুয়ে থাকব।

নিশুর মামা বলেছেন, ড্রয়িংরুমে আমার অফিসের পিয়ন ঘুমায়, তুই তার সঙ্গে ঘুমাবি?

নিশু বলেছে, হ্যাঁ।

নিশুর মামা বিরক্ত হয়ে বলেছেন, তোর বাবা যেমন পাগল ছিল তুইও পাগল। তোর যা করা উচিত তা হলো বিয়ে করে ফেলা।

নিশু বলল, আমি রাজি আছি, আমাকে বিয়ে দিয়ে দাও। আমি আজই বিয়ে করব। গুণ্ডাপাণ্ডাদের যন্ত্রণা আর নিতে পারছি না।

নিশু ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। এখন তার প্রধান কাজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত লেডিস হোস্টেলে সিট খোজা। সে ডাবলিং ট্রিপলিং সবকিছুতেই রাজি আছে। মেঝেতে শুয়ে থাকতেও তার আপত্তি নেই। সে মতিনকে আলটিমেটাম দিয়েছে। মতিন যদি সন্ধ্যার

মধ্যে তার জন্যে থাকার ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। বাড়িওয়ালার ছেলে রাতে এলে নিশু বটি দিয়ে তাকে খুন করবে।

আলটিমেটাম নিয়ে মতিন কিছু ভাবছে সেরকম মনে হচ্ছে না। সে ভোরের স্বদেশ পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকের সামনে লাজুক লাজুক মুখ করে বসে আছে। আজহার উল্লাহ সাহেব রাগে ছটফট করছেন। মতিন তাঁর রাগ কমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

আজহার উল্লাহ সাহেবের রাগের কারণ বর্তমান কালের এক তরুণ কবির পাঠানো কবিতা। কবিতার নাম জনৈক রমণীর পায়ুপথ। তিনি কবিতা হাতে নিয়ে চিড়বিড় করছেন এই নামে কবিতা হতে পারে? মতিন, তুমি বলো, এই নামে কবিতা হতে পারে?

মতিন বলল, ইউরোপ আমেরিকার কিছু কবি এ ধরনের অ্যাক্সপেরিমেন্টাল কবিতা লিখছেন।

আজহার উল্লাহ বললেন, অ্যাক্সপেরিমেন্ট! এর নাম অ্যাক্সপেরিমেন্ট? পায়ুপথ নিয়ে অ্যাক্সপেরিমেন্ট?

মতিন বলল, ঠিক এধরনের একটি কবিতা ইংরেজিতে আছে–Anus of a young lady. কবিতার মধ্যে রুচি ও অরুচির মিশ্রণ। Lady হচ্ছে রুচির প্রতীক, Anus অরুচির প্রতীক।

চুপ কর।

জি আচ্ছা স্যার চুপ করলাম।

চা খাবে?

চা খাব না, কফি খাব।

আজহার উল্লাহ সিগারেট ধরালেন। তার রাগ সামান্য কমল। তিনি মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার গল্পগুলি ভালো হয়েছে।

মতিন বলল, আমার গল্প না স্যার। নদ্দিউ নতিম সাহেবের গল্প।

আজহার উল্লাহ বললেন, আমার সঙ্গে ফাজলামি করবে না। আমি তোমার ইয়ার দোস্ত না, তোমার দুলাভাইও না। তুমি গল্পগুলি ভালো লিখেছ, তবে লাভ নাই।

লাভ নাই কেন স্যার?

লাভ নাই, কারণ বাঙালি মুসলমান লেখক জন্মে জাত সাপ হয়ে, মারা যায় হেলে সাপ হিসাবে।

মতিন বলল, নদ্দিউ নতিম সাহেব মুসলমান এটা ঠিক আছে; তবে উনি বাঙালি না, উজবেক।

আমার কাছ থেকে থাপ্পড় খেতে চাও? থাপ্পড় দিয়ে চাপার লুজ দাঁত ফেলে দেব।

মতিন হেসে ফেলল।

আজহার উল্লাহ বললেন, কোনো নতুন লেখা এনেছ?

মতিন বলল, নদ্দিউ নতিম সাহেবের একটা অ্যাক্সপেরিমেন্টাল কবিতার অনুবাদ এনেছি। চায়নিজরা যেমন উপর থেকে নিচে লেখে তিনি এইভাবে কিছু কবিতা লিখেছেন। পক্ষীবিষয়ক রচনা।

মতিন টেবিলের উপর লেখা রাখল! আজহার উল্লাহ সাহেব লেখা হাতে নিলেন–

এ কি না পা
ক ং ও খি
টি বা * কে

পা শ্যা পা মা
খি মা রে না
* * * য়

ছি কা ব না।
ল ঠ লা *

হ ঠো ক জা
য় ক ঠি নি
* রা ন *

কা হ বে না
ক তে শ *

কি পা ক কে
ং রে ঠি ন?
বা * ন।

চ আ কা
ড়ু বা ঠি
ই র ন্য

আজহার উল্লাহ বেশ কিছুক্ষণ মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আর আমার এখানে আসবে না। বিদায় হও।

কফি খেয়ে যাই স্যার?

আজহার উল্লাহ বললেন, না।

মতিন উঠে দাঁড়াল।

ভোরের স্বদেশ পত্রিকা অফিস থেকে বের হয়ে মতিন ঘড়ি দেখল, এগারোটা পঁচিশ। তার মনে হলো, বিজ্ঞান এখনো যথেষ্ট অগ্রসর হয় নি। এখনো মানুষকে ঘড়ি দেখতে হয়। সার্টের হাতা গুটিয়ে রিস্টওয়াচ চোখের সামনে ধরতে হয়। রাতে আরো সমস্যা, বাতি

জ্বালাতে হয়। বিজ্ঞান এত কিছু করেছে কিন্তু মানুষকে ঘড়ি দেখার ঝামেলা থেকে মুক্ত করতে পারছে না কেন? মানুষের শরীরের ভেতর বিজ্ঞানীরা একটা ঘড়ি ঢুকিয়ে দেবেন। সেই ঘড়ি মানুষকে সময় দিতে থাকবে। ঘড়ি বন্ধ হবে মৃত্যুর সময়।

আকাশ নীল। কড়া রোদ উঠেছে। এই রোদের নাম ছাতা-রোদ। ছাতা ছাড়া এই রোদে যাওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা মানুষকে এখনো ছাতামুক্ত করতে পারে নি। তাদের আরেক ব্যর্থতা।

বিজ্ঞানীদের উপর মেজাজ খারাপ করে মতিন হাঁটছে। সে কল্পনা করে নিচ্ছে এখন সন্ধ্যার শুরু। গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘ। বাতাসে শীতের আমেজ। দুএকটা বাড়িতে সন্ধ্যার আলো জ্বলছে–

A stranger came to the door at eve,
And he spoke the bridegroom fair.
He bore a green-white stick in his hand,
And, for all burden, care.

কবিতাটা কার লেখা? মতিন নাম মনে করতে পারছে না। কবিতা মুখস্থ অথচ কবির নাম মনে আসছে না। এই ধরনের সমস্যা মতিনের ঘনঘন হচ্ছে। কবির নাম মাথার ভেতর আছে। নামে R অক্ষরটা আছে। শুধুমাত্র R অক্ষর জ্বলজ্বল করছে, আর কিছু না। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। নিশুকে টেলিফোন করলেই অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচা যায়। সে সঙ্গে সঙ্গেই কবির নাম বলবে। নিশুকে টেলিফোন করা যাচ্ছে না, কারণ মতিনের মোবাইল কাজ করছে না। এখন কী করা যায়? কোথাও শান্তিমতো কয়েক কাপ কফি খেলে হতো।

কফিতে মস্তিষ্ক উজ্জীবক পদার্থ আছে। সেই পদার্থ শরীরে বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দিলে হয়তো R-এর সঙ্গের অন্য দুই-একটা অক্ষর ভেসে উঠবে।

মতিন একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিল। কফি খাওয়ার জন্যে সে মতিঝিল থেকে যাচ্ছে গুলশানে। সালেহ ইমরান সাহেবের অ্যাসিসটেন্ট আহমেদ ফারুকের। অফিসে। এই বিষয়টাও রহস্যময়। মতিঝিলের অনেক দোকানেই কফি পাওয়া যায়। কফির জন্যে গুলশানে যেতে হয় না। কিন্তু সে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? তার মস্তিষ্ক কি প্রোগ্রাম সেট করে রেখেছে? কফির তৃষ্ণা একটা অজুহাত ছাড়া কিছু না!

এসির কল্যাণে গাড়ির ভেতর আরামদায়ক শীতলতা। গাড়ির ড্রাইভার বলল, গান দিব স্যার? মতিন বলল, না। তার মাথায় কবিতার পরের চারটা লাইন–

He asked with the eyes more than the lips
For a shelter for the night,
And he turned and looked at the road afar
without a window light.

মতিন চোখ বন্ধ করে আছে। R অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা অক্ষর এসেছে B. এখন মনে হয় অন্য অক্ষরগুলিও আসতে শুরু করবে। এই তো আরেকটা এসেছে O. এই তিন অক্ষর নিয়ে খেলতে খেলতে অন্য অক্ষরগুলি নিশ্চয়ই চলে আসবে। খেলা শুরু হোক–

BOR, ORB, ROB, BRO, OBR, RBO...

আরো কিছু কি হয়? কমল বলতে পারত। এই ছেলে এইসব খেলায় ওস্তাদ। ঘোনা ঘুতনি নিয়ে কী বিশাল খেলা ফেঁদেছিল!

আহমেদ ফারুক অবাক হয়ে বললেন, আপনি?

মতিন বলল, কফি খেতে এসেছি। আপনার এখানে কি কফি আছে?

কফি অবশ্যই আছে। আপনি কফি খেতে আমার কাছে এসেছেন–এটা বিশ্বাসযোগ্য না।

মতিন বলল, আমার কাছেও বিশ্বাসযোগ্য না।

আমার অফিসের ঠিকানা কোথায় পেলেন?

জোগাড় করে রেখেছিলাম।

কোত্থেকে জোগাড় করেছেন?

যে হাসপাতালে কমলের চিকিৎসা হয়েছিল, তাদের কাছ থেকে জোগাড় করেছি।

কবে জোগাড় করেছেন? আজ?

আজ না।

কবে?

মতিন বলল, কবে ঠিকানা জোগাড় করেছি এটা জানা কি জরুরি?

আহমেদ ফারুক বললেন, জরুরি না। কৌতূহল।

মতিন বলল, যেদিন কমলের চিঠিটা পড়লাম, চিঠিতে তার সিক্রেট জানলাম, সেদিন।

আহমেদ ফারুক বললেন, তার মানে আপনি কমলের সিক্রেট নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন?

মতিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার কথা শুনে এখন আমারও সেরকমই মনে হচ্ছে। কফি দিতে বলুন।

কফিতে চুমুক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মতিনের মাথায় আরেকটা অক্ষর চলে এলো–T, এখন এই চারটি অক্ষরকে নানানভাবে সাজানো যায় ROBT, BORT...

আহমেদ ফারুক বললেন, শুরু করুন।

মতিন বলল, কী শুরু করব?

যে কথা বলতে এসেছেন সেই কথা।

মতিন চার অক্ষরের খেলা বাদ দিয়ে আহমেদ ফারুকের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার ঘাড়ে কি কোনো জন্মদাগ আছে?

তার মানে?

আছে কি-না সেটা বলুন।

কমলের সিক্রেটের সঙ্গে আমার ঘাড়ে জন্মদাগ আছে কি-না তার সম্পর্ক কী?

মতিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কমল একটা বইয়ে পড়েছে কিংবা ইন্টারনেট থেকে পেয়েছে, পিতার শরীরের জন্মদাগ সন্তানের শরীরে আসে। আমার ধারণা সে তার নিজের ঘাড়ের এই দাগ নিয়ে চিন্তিত ছিল বলেই পড়াশোনাটা করেছে। তারপর সে তার বাবার ঘাড় পরীক্ষা করেছে। জন্মদাগ পায় নি। সে জন্মদাগটি দেখেছে অন্য একজনের ঘাড়ে।

আহমেদ ফারুক ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কমল কি আপনাকে জানিয়েছে সেই অন্য একজনটা কে?

জানিয়েছে। জানিয়েছে বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আমি কি আরেক কাপ কফি খেতে পারি?

না। আপনি এক্ষণ বিদায় হবেন।

মতিন উঠে দাঁড়াল। সে এই মুহূর্তে খুবই আনন্দিত। কবির পুরো নাম তার মাথায় চলে এসেছে। নিশুর সাহায্য লাগে নি। কবির নাম–Robert Frost. কবিতার নাম Love and a question.

ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই নিশুর মেজাজ খারাপ ছিল। সে বারান্দায় টাওয়েল শুকাতে দিতে এসে দেখে, রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের সামনে বাড়িওয়ালার ছেলে দুই বন্ধুকে নিয়ে বসে আছে। নিশুকে দেখে বাড়িওয়ালার ছেলে উঠে দাঁড়াল এবং চেঁচিয়ে বলল, ঐ মাগি! তার দুই বন্ধুর হেসে গড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা হলো।

নিশু ঘরে ঢুকে গেল। তাকে এই যন্ত্রণা আর সহ্য করতে হবে না। মতিনকে বলা আছে, সে সন্ধ্যার মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেই। যদি কিছুই করতে না পারে সে কোনো একটা হোটেলে গিয়ে উঠবে। নিশুর ইউনিভার্সিটিতে যাবার দরকার ছিল। সে গেল না। ইউনিভার্সিটিতে যেতে হলে তিন বদের সামনে দিয়ে। যেতে হবে। তারা কুৎসিত কিছু কথা বলবে। রাস্তার লোকজনও সেই কথা শুনবে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করবে না। বরং মজা পাবে। সোসাইটি বদলাচ্ছে। খারাপের দিকে বদলাচ্ছে। বর্তমান সোসাইটির মানুষ অন্যের দুর্দশায় মজা পায়। সাহসী মানুষরা কি সব হারিয়ে যাচ্ছে?

সকাল এগারোটায় নিশু মন প্রচণ্ড ভালো হয়ে গেল। কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন থেকে চিঠি এসেছে কুরিয়ারে। চিঠির বক্তব্য, নিশুর হাউজিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে এখনই চলে আসতে পারে। নিশু যার আন্ডারে কাজ করবে সেই প্রফেসর John OHara Cosgrave-ও সুন্দর একটি চিঠি দিয়েছেন–

নিশু,

প্রথম সেমিস্টার তুমি মিস করেছ। ভালোই করেছ। আমি পুরো তিনমাস ছিলাম হাসপাতালে। তুমি নিশ্চয়ই জানো না আমি ব্যাধিগ্রস্থ মানুষ। আমার রোগের ধরন এমন যে, কিছুদিন পর পর আমাকে দীর্ঘদিনের জন্য হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তবে আমার এই ব্যাধি উপকারী। আমি আমার প্রধান কাজগুলি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে করেছি।

আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি আমাকে বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশের উপর যে প্রবন্ধটি লিখে পাঠিয়েছ তা পড়ে খুশি হয়েছি। আমি তোমার কাছ থেকে এই কবি সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী। ভালো থেকো।

ইতি–
ও হারা

অনেকদিন পর নিশুর সাজতে ইচ্ছা করল। মতিনকে চমকে দেবার ব্যবস্থা। সে সাজগোজ করে বসে থাকবে। মতিন দুপুরে খেতে আসবে। সে তাকে নিয়ে বাইরে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যালে কোনো পার্লার থেকে চুল ঠিক করে আগে কি হয়! নিশু তার জীবনে কখনো পার্লারে যায় নি। তার মাথার চুল কোকড়ানো। পার্লারের মেয়েরা সেই চুল সোজা করে দেবে। চোখে কাজল দিয়ে দেবে।

নিশু বারান্দায় এসে উঁকি দিল। বদ তিনটাকে দেখা যাচ্ছে না। চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চটা ফাকা। নিশু ঘর তালা দিয়ে বের হলো। সে একটা শাড়িও কিনবে। সাজগোজের পর নতুন শাড়ি পরতে ইচ্ছা করে।

নিশু বাড়ি ফিরল একটার দিকে। মুগ্ধ হয়ে সে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে থাকল। মনে মনে কয়েকবার বলল, নিশু মেয়েটা এত সুন্দর! এতদিন এই সৌন্দর্য চোখে পড়ল না কেন?

The wonder is I didnt see at once
I never noticed it from here before.

দরজায় টোকা পড়ছে। মতিন এসে পড়েছে। এখন নিশুর সামান্য লজ্জা লাগছে। মতিন কি ভাববে না তার জন্যেই এত সাজগোজ? ভাবলে ভাবুক। নিশু দরজা খুলল।

নিশুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হুড়মুড় করে বাড়িওয়ালার ছেলে তার দুই বন্ধু নিয়ে ঢুকে পড়ল। বাড়িওয়ালার ছেলের হাতে ক্ষুর। সে হিসহিস করে বলল, শব্দ করলে মরছস। এক পোচ দিব, গলা শেষ।

নিশু একদৃষ্টিতে ক্ষুরের দিকে তাকিয়ে আছে। পত্রিকায় এই জাতীয় ঘটনা সে অনেক পড়েছে। আজ তার জীবনে ঘটতে যাচ্ছে। বাড়িওয়ালার ছেলের বন্ধুরা দরজা-জানালা বন্ধ করে ফেলেছে। ঘর এখন অন্ধকার। এই অন্ধকার কিছুক্ষণের মধ্যেই সয়ে যাবে। নিশু তাদের তিনজনের ঘামে ভেজা মুখ দেখতে পাবে। এরা কি মদ খেয়ে এসেছে? কী বিকট গন্ধই না আসছে!

ঐ মাগি! শাড়ি তুই নিজে খুলবি? না আমরা টান দিয়া খুলব?

নিশু শব্দ করতে পারছে না, নড়তে পারছে না। কে কী বলছে তাও তার কানে ঢুকছে না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ক্ষুরের ফলার দিকে। নিশুর জগৎ ছোট হয়ে আসছে। চারদিক থেকে জমাট অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরছে। একবার তার শুধু মনে হলো, মধ্যদুপুরে এত অন্ধকার কেন?

১৮. অনেক দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে

অনেক দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছে। ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট কিন্তু তীক্ষ্ণ। শব্দ মাথার ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। এই ঘণ্টা কিসের ঘণ্টা? গীর্জার না মন্দিরের? গীর্জার ঘণ্টার সঙ্গে মন্দিরের ঘণ্টার কোনো প্রভেদ কি আছে? মন্দিরেতে কাসার ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং। ঘণ্টা কি সবসময় কাসার হয়? কাসা কোন বস্তু? তামা কাসা। তামা হলো কপার, কাসা কী?

নিশু চোখ মেলল ঘণ্টাধ্বনি শুনতে শুনতে। তার মাথায় তামা-কাসা বিষয়ক জটিলতা। সে শুয়ে আছে হাসপাতালের বিছানায়। খোলামেলা কেবিন। মাথার কাছে বড় জানালা। জানালা গলে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। রোদের কারণেই কেবিনের দেয়াল হলুদ দেখাচ্ছে। তাকে ঘিরে যারা বসে আছে তাদের মুখও হলুদাভ।

মতিন বলল, অ্যাই নিশু! অ্যাই!

নিশু মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। মতিনের পাশে একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। তাঁর গায়ে খাকি পোশাক। মাথায় টুপি। পুলিশ অফিসারের চেহারা খুব চেনা চেনা লাগছে। উনি কি নিশুর পরিচিত? পরিচিত হলে তাঁকে তামা এবং কাসার তফাত কী জিজ্ঞেস করা যায়।

মতিন বলল, নিশু, তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক।

নিশু বাধ্য মেয়ের মতো চোখ বন্ধ করল। পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি স্টেটমেন্ট দিতে চাইলে দিতে পারেন। আমার সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট আছে। আপনি কি স্টেটমেন্ট দিতে চান?

নিশু চোখ না খুলেই বলল, চাই।

এখন দেবেন?

জি।

তাড়াহুড়া কিছু নেই, ধীরেসুস্থে বলুন কী ঘটেছিল।

নিশু ক্লান্ত গলায় বলল, ঘণ্টা বাজছিল। অনেক দূরে কোথাও ঘণ্টা বাজছিল। ঘন্টাটা গীর্জার না মন্দিরের আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় গীর্জার। কারণ গীর্জার ঘণ্টা যে-কোনো সময় বাজতে পারে। কারো মৃত্যুসংবাদ গীর্জায় পৌঁছালেই ঘণ্টা বাজে। মন্দিরের ঘণ্টা বাজার নির্দিষ্ট সময় আছে। মন্দিরের ঘণ্টা হয় কাসার তৈরি। কাসা তামা না।

পুলিশ অফিসার বললেন, ম্যাডাম, আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার স্টেটমেন্ট পরে নেয়া হবে।

নিশু বলল, আচ্ছা।

তার চোখ বন্ধ। তারপরেও জানালা দিয়ে আসা হলুদ রোদ সে দেখতে পারছে। কীভাবে পারছে সেটাও এক রহস্য। আপাতত সে কোনো রহস্য নিয়ে চিন্তা করতে চাচ্ছে না। তার ঘুম দরকার। দীর্ঘ শান্তিময় ঘুম।

নিশু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পরদিন ভোরে স্টেটমেন্ট দিল। কী ঘটেছিল কিছুই বাদ দিল না। ওসি সাহেব বললেন, আপনি মামলা করবেন?

নিশু বলল, অবশ্যই।

ভালোমতো চিন্তা করে ডিসিশান নিন।

এখানে চিন্তা করার কী আছে?

রেপ কেস নিয়ে নানান লেখালেখি হবে। পত্রিকায় নানান গল্প ছাপা হবে। আপনার নিজের সামাজিক অবস্থান আছে। সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

নিশু বলল, একটা জিনিসই বিবেচনায় রাখতে হবে। দোষী যেন শাস্তি পায়।

ওসি সাহেব বললেন, রেপ কেসে বেশির ভাগ সময় দোষী শাস্তি পায় না। যে মামলা করে তার মানসম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু হয়।

নিশু বলল, আপনি ওদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন কেন?

ওসি সাহেব বললেন, আমি বাস্তবের পক্ষ নিয়ে কথা বলছি, কারো পক্ষ নিয়ে কথা বলছি না। আপনি মামলা করলে আমি অপরাধীদের গ্রেফতার করব। এই বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন।

নিশ্চিত থাকব?

হ্যাঁ নিশ্চিত থাকবেন। আপনার বাবা আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি বেশ অনেকবার আপনাদের বাসায় গিয়েছি। একবার আপনি নাশতা হিসেবে আমাকে এক বাটি নুডুলস দিয়েছিলেন। নুডুলসে লবণ ছিল না বলে স্যার আপনার সঙ্গে রাগারাগিও করেছিলেন। এখন কি আপনার সন্দেহ দূর হয়েছে?

জি।

আমরা মামলা ঠিকমতোই চালাব, কিন্তু আপনার সামনে মহাসঙ্কট।

ভোরের স্বদেশ পত্রিকায় নিশুকে নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনের শিরোনাম–

মক্ষিরানীর বিপদ

স্টাফ রিপোর্টার জানাচ্ছেন, নিশু নামের জনৈকা উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা তরুণী একাকী একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে বাস করতেন। সন্ধ্যার পর ফ্ল্যাটে সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষদের আগমন ঘটত। লীলাখেলা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। মধুলোভী কিছু পুরুষ রাতে থেকেও যেত। এই বিষয় নিয়ে অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা অনেক দেন-দরবার করেছেন। বাড়িওয়ালাও মক্ষিরানীকে বিদায় করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তাতে লাভ হয় নি। এখন মক্ষিরানী নিজের কাটা খালের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। পাড়ার কিছু বেয়াড়া ছেলেপুলেও

মধুর লোভে মক্ষিরানীর ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছে। সবাই মজা লুটবে, তারা কেন বাদ পড়বে? ফলাফল?

মক্ষিরানী গুরুতর আহত। তার জীবন সংশয়। মতিন ভোরের স্বদেশ পত্রিকা অফিসে বসে আছে। তার সামনে আজহার উল্লাহ। আজহার উল্লাহ আজ নানাবিধ কারণে বিরক্ত। তাঁর শরীরও খারাপ। জ্বর এসেছে। তিনি জ্বর নিয়েই অফিসে এসেছেন। কারণ আজ সাহিত্য পাতার পেস্টিং।

আজহার উল্লাহ মতিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোনো কথা থাকলে বলো। কথা না থাকলে বিদায় হও। ভোতা মুখে অকারণে আমার সামনে বসে থাকবে না।

কথা ছিল স্যার।

কথা থাকলে বলো।

আপনার হাতের কাজ শেষ করুন। তারপর বলি।

আজহার উল্লাহ বিরক্ত গলায় বললেন, আমার সব কাজই মাথার কাজ। আমার হাতের কোনো কাজ নেই। মাথার কাজ কখনো শেষ হয় না। কাজেই তোমার যা বলার এখনই বলো।

মতিন বলল, স্যার, আপনাদের পত্রিকার প্রথম পাতায় একটা খবর বের হয়েছে–মক্ষিরানীর বিপদ। খবরটা কি আপনি পড়েছেন?

আজহার উল্লাহ বললেন, ধর্ষণের খবর আমি পড়ি না।

খবরটা পড়া থাকলে আমার ব্যাখ্যা করতে সুবিধা হতো। খবরটা বানোয়াট। একটা মেয়ে রেপড়া হয়েছে। সে মামলা করেছে। পুলিশ আসামিদের খুঁজছে। এই সময় একটা মিথ্যা খবর খুবই ক্ষতিকর।

আজহার উল্লাহ বললেন, পত্রিকার খবর নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কাজেই তুমি এসব নিয়ে মোটেই চিন্তা করবে না। ক্লিয়ার?

জি ক্লিয়ার।

এখন বিদায় হবে?

জি-না স্যার। আপনার কাজ শেষ হলে কিছুক্ষণ গল্প করব, তারপর চলে যাব।

গল্প এখনই শেষ করে বিদায় হও। আজ আমার শরীর ভালো না। জ্বর।

মতিন বলল, গল্পটা রবীন্দ্রনাথের গানবিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে, গীতবিতানে বর্ষার গান অংশে। কথাগুলি হচ্ছে–

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল কলকল ছলছল
ভেদ করি কঠিনের ক্রুর বক্ষতল কলকল ছলছল
এসো এসো উৎস স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে?
মরুদৈত্য কোন মায়াবলে করেছে বন্দি পাষাণ শৃঙ্খলে।

আজহার উল্লাহর চোখ তীক্ষ্ণ। ভুরু কুঁচকে আছে। তিনি মন দিয়েই শুনছেন।

গানের কথাগুলি কেমন লাগছে স্যার?

রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়ে কোনো প্রশ্নই থাকে না।

মতিন সামান্য ঝুঁকে এসে বলল, শান্তিনিকেতনে প্রথম যখন টিউবওয়েল বসানো হয় গানটা তখন লেখা। টিউবওয়েল বসানো উপলক্ষে গান। এটা বর্ষার গান না। স্যার, ইন্টারেস্টিং না?

অবশ্যই ইন্টারেস্টিং! আমি জানতাম না। গল্পটা হঠাৎ আমাকে বলার উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। আছে না?

জি আছে। মক্ষিরানী নামে যে মেয়েটির কথা আপনার পত্রিকায় ছাপা হয়েছে গল্পটা সেই মেয়েটির কাছে আমি শুনেছি। তার মতো পড়ুয়া মেয়ে দেশে বিদেশে কোথাও পাওয়া যাবে না। মেয়েটি জীবনে কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নি। সে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে পিএইচডি করতে যাচ্ছে। তাকে নিয়ে একটি পত্রিকা নোংরা গল্প ছাপবে এটা কি ঠিক?

ঠিক না। আমি ব্যবস্থা করব।

স্যার যাই?

যাও। চা খেয়ে যাও।

রমনা থানার ওসি সাহেব আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। জরুরি কী কথা বলবেন। তাঁর কাছে যাব।

আজহার উল্লাহ বললেন, মেয়েটা কি তোমার প্রণয়িনী?

মতিন বলল, জি-না। আমার এত সৌভাগ্য না।

রমনা থানার ওসি সাজ্জাদ সাহেব মতিনের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। চা-বিসকিট খাওয়ালেন। দেশের রাজনীতি কোন পথে চলছে তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। পুলিশ কখনো রাজনীতি নিয়ে আলাপ করে না। কেউ যখন করে তখন বুঝতে হয় ঝামেলা আছে। মতিন ঝামেলাটা ধরতে চেষ্টা করছে, পারছে না।

মতিন বলল, স্যার, আমাকে ডেকেছেন কী জন্যে? (থানার ওসি সাহেবকে স্যার বলা ঠিক হচ্ছে কি-না এটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবেছে মতিন। সমাধানে আসাতে পারে নি। তবে সে লক্ষ করল, স্যার ডাকতে তার তেমন অস্বস্তি হচ্ছে না।)

ওসি সাহেব বললেন, আপনাকে ডেকেছি দুটি খবর দেবার জন্যে। দুটি খবরই খারাপ।

বলুন শুনি।

তিনজন আসামির দুজন ধরা পড়েছে, পুলিশ কাস্টডিতে আছে।

এটা তো ভালো খবর। খারাপ হবে কেন?

এদের পক্ষে একজন মন্ত্রী দুজন বিরোধী দলের এমপি সুপারিশ করছেন। সুপারিশ এমন পর্যায়ের যে সন্ধ্যার মধ্যেই তাদের ছেড়ে দিতে হবে। যদি ছেড়ে না দেই তাহলে আগামীকাল তাদের কোর্টে নিতে হবে। কোর্টে সঙ্গে সঙ্গে জামিন হয়ে যাবে। টাকার খেলা।

মতিন বলল, স্যার, আপনার এখানে সিগারেট খাওয়া যায়?

ওসি সাহেব বললেন, অবশ্যই খাওয়া যায়। সিগারেট ধরান।

মতিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, দ্বিতীয় খারাপ খবরটা কী?

ওসি সাহেব হতাশ গলায় বললেন, দ্বিতীয় খারাপ খবরটা হচ্ছে নিশু মেয়েটির বাড়িওয়ালা থানায় একটা জেনারেল ডায়েরি করে রেখেছেন। জেনারেল ডায়েরির বিষয়বস্তু হচ্ছে–নিশু মেয়েটি চরিত্রহীনা। তার কাছে নানান ধরনের লোক আনাগোনা করে।

মতিন বলল, এ ধরনের মিথ্যা ডায়েরির গুরুত্ব কী?

কোর্টে যখন মামলা উঠবে তখন ডায়েরিটা গুরুত্ব পাবে। আসামি পক্ষের লইয়ার বিষয়টি কোর্টে তুলে প্রমাণ করবে নিশু খারাপ মেয়ে।

মতিন বলল, আমাদের কী করা উচিত?

ওসি সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

মতিন আবার বলল, আমাদের কী করা উচিত?

ওসি সাহেব বললেন, আমি পরামর্শ দিব না। আমি ঘটনা বললাম। আপনারা বিচার বিবেচনা করবেন। আমাদের দেশটা ছোট, সবাই সবার আত্মীয়। ভয়ঙ্কর যে-কোনো অপরাধীরও খালাতো ফুপাতো চাচাতো ভাই থাকেন প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠজন। বুঝতে পারছেন ঘটনা?

পারছি।

মমাটেই পারছেন না। এই ঘটনা বাইরের কেউ বুঝবে না। আমরা পুলিশের লোকরা বুঝি। কাউকে কিছু বলতে পারি না। আর বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। আমরা খারাপ। মার্কামারা খারাপ।

মতিন বলল, আপনারা কি আসামি ছেড়ে দিবেন?

দিতেও পারি।

কাজটা ঠিক হবে?

আসামি পক্ষের আত্মীয়স্বজনরা বলবে কাজটা সঠিক হয়েছে। আপনারা বলবেন কাজটা বেঠিক হয়েছে।

আপনি নিজে কী বলবেন?

আমি কিছুই বলব না। আমরা পুলিশ, বলাবলির মধ্যে আমরা নাই। আরেক কাপ চা খাবেন?

খেতে পারি।

চা খেতে খেতেই মন্ত্রী সাহেবের টেলিফোন চলে এলো! ওসি সাহেব টেলিফোনে বিগলিত গলায় বললেন, স্যার, কেমন আছেন? আপনার টেলিফোনের দরকার ছিল না। আপনার পিএস করলেই হতো।

মন্ত্রী বললেন, কাজটা কি হয়েছে?

ওসি সাহেব বিনয়ে গলে গিয়ে বললেন, আপনি নিজে বলবে আর কাজ হবে না এটা কেমন কথা।

থ্যাংক য়্যু। ওরা ছাড়া পেয়েছে?

এখনো পায় নাই। সামান্য একটু ঝামেলা হয়েছে। পত্রিকার লোকজন জেনে গিয়েছে। আসামি ছেড়ে দিলে এরা নিউজ করে ফেলবে—মন্ত্রীর নির্দেশে ধর্ষক আসামি খালাস।

আমার কথা এখানে আসবে কেন?

অবশ্যই আসবে না। আমি কথার কথা বললাম। আপনি স্যার একটা লিখিত অর্ডার দিলে আমার জন্য সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আসামি খালাস করে দিতে পারি।

আমার মুখের কথা কোনো কথা না?

স্যার, এটা আপনি কী বলেন! আপনার মুখের কথার উপরে কোনো কথা আছে? তবে স্যার একবার পূর্তমন্ত্রীর টেলিফোনে আসামি থানা হাজত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে এমন ক্যাচাল লেগে গেল। পূর্তমন্ত্রী বললেন, টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয় নি। আমার চাকরি যায় যায় অবস্থা।

ওসি সাহেব।

জি স্যার।

আপনি ভালো ত্যাঁদড় আছেন। তবে আমার কাছে ত্যাঁদড় ঠিক করার মন্ত্র আছে।

ওসি সাহেব টেলিফোন রাখতে রাখতে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নিশুর বাবা আমার ডাইরেক্ট টিচার ছিলেন। অনেকদিন স্যারের বাসায় গিয়েছি। দুপুরে স্যারের বাসায় গিয়েছি আর না খেয়ে ফেরত এসেছি এরকম কখনো হয়। নি। স্যারের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, উনি নিজেই রান্না করতেন। একবার কচুর লতি দিয়ে মুরগি রান্না করলেন। আপনি কি কচুর লতি দিয়ে মুরগি কখনো খেয়েছেন?

জি-না।

আমিও খাই নি। এই প্রথম, এই শেষ।

খেতে কেমন ছিল?

খেতে কেমন ছিল মনে নেই। ভালো কথা মনে করেছেন, একদিন আমার স্ত্রীকে বলব রান্না করতে। রাজি হবে কি-না জানি না। মেয়েরা ট্র্যাডিশনের বাইরে যেতে পারে না।

মতিন উঠে দাঁড়াল। তাকে কিছু কাজকর্ম করতে হবে। দুএকদিনের মধ্যেই নিশু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। নিশুর থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরনো ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবে নিশুর রগ ত্যাড়া। সে হয়তো পুরনো জায়গাতেই ফিরে যেতে চাইবে। দুএকজন ভালো উকিলের সঙ্গেও পরামর্শ করা দরকার। রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চলতে পারে না। মামলা একটা রোগ, উকিল রোগের চিকিৎসক।

নিশু হাসপাতালের বিছানায় আধশোয়া হয়ে আছে। তার হাতে স্যুপের বাটি। দীর্ঘ সময় পর পর সে চামচে করে খানিকটা স্যুপ মুখে দিচ্ছে। তার ঘর খালি, তবে দরজার বাইরে চেয়ার পেতে একজন পুলিশ বসা। রমনা থানার ওসি সাহেব পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছেন।

মতিনকে ঢুকতে দেখেই নিশু হাসল। মতিনের কাছে মনে হলোঁ, দশ এগারো বছরের একটা বালিকা হাসছে। অল্প কয়েক দিনেই নিশু খুব রোগা হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠার হাড় বের

হয়েছে। গাল ভেঙে গেছে। তরুণী মেয়ে হঠাৎ রোগা হয়ে গেলে তার চেহারায় প্রবল বালিকা ভাব আসে। নিশুর ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

মতিন হাসিমুখে বলল, লোহ্যা।

নিশু বলল, লোহ্যা কী?

হ্যালোটা উল্টো করে বললাম। আছিস কেমন?

নিশু বলল, লোভা। অর্থাৎ ভালো।

মাথার যন্ত্রণা আছে না গেছে?

হালকাভাবে আছে।

ততাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়বে কবে?

আগামীকাল সন্ধ্যায়।

মতিন বলল, গুড। এর মধ্যে আমি তোর থাকার ব্যবস্থা করে ফেলব।

নিশু বলল, থাকার ব্যবস্থা করে ফেলব মানে কী?

মতিন বলল, তুই নিশ্চয়ই আগের জায়গায় ফিরে যেতে চাচ্ছিস না?

নিশু বলল, চাচ্ছি।

মতিন বলল, অবশ্যই না। জায়গাটা তোর জন্যে রিস্কি। তার উপর ঐ ফ্ল্যাটে তোর খারাপ স্মৃতি আছে। ফিরে যাওয়া অবশ্যই ঠিক হবে না।

আমি যাবটা কোথায়?

আপাতত কিছুদিন আমার দুলাভাইয়ের বাড়িতে।

উনার সঙ্গে কথা হয়েছে?

এখনো হয় নি। হবে।

উনি যদি না বলেন তখন?

আমার দুলাভাই জীবনে কখনো কোনো কিছুতে না বলেন নি। তুই যদি দুলাভাইকে বলিস, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, উনি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলবেন, আচ্ছা দেখি কী করা যায়।

নিশু শব্দ করে হাসছে। মতিন হাসছে। দরজার বাইরে চেয়ারে বসে থাকা পুলিশ বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। পুলিশরা কাউকে শব্দ করে হাসতে দেখলে খুব বিস্মিত হয়।

হাবিবুর রহমান নিউ সালেহা ফার্মেসিতে মন খারাপ করে বসে আছেন। রাত বাজে আটটা। ফার্মেসি রাত এগারোটা পর্যন্ত খোলা থাকার কথা। রাতে রোগের প্রকোপ বাড়ে। ফার্মেসিগুলিতে ওষুধ বিক্রি বাড়ে সন্ধ্যার পর। তার দোকানের দুজন কর্মচারীই গতকাল থেকে অনুপস্থিত। একজনের ডেঙ্গু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। অন্য একজনের কী হয়েছে কেউ জানে না। সে নাকি বাসায়ও ফিরে নাই।

রাত এগারোটা পর্যন্ত হাবিবুর রহমান ফার্মেসিতে বসে থাকতে পারেন না। বসে থেকে লাভও কিছু নেই। কোথায় কোন ওষুধ থাকে তিনি জানেন না। দামও জানেন না। তারপরেও দোকান খোলা রাখতে হয়। দোকান বন্ধ থাকলেই লোকজনের মলে ধারণা ঢুকে যাবে নিউ সালেহা ফার্মেসি সন্ধ্যার পর পর বন্ধ। হয়ে যায়। রাতে ওষুধের দরকার পড়লে তারা প্রথমেই নিউ সালেহা ফার্মেসি বাদ দিবে। ধরেই নেবে এই ফার্মেসি বন্ধ।

হাবিবুর রহমান আবার ঘড়ি দেখলেন। আটটা পাঁচ বাজে। মাত্র পাঁচ মিনিট পার হয়েছে, অথচ তার কাছে মনে হয়েছে খুব কম করে হলেও আধাঘণ্টা পার হয়েছে। তিনি ঠিক করে রেখেছেন রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। নটার সময় ফার্মেসি বন্ধ করে যাবেন নিরাময় ক্লিনিকে। তৌহিদাকে দেখে আসবেন। গতকাল যেতে পারেন নি। তৌহিদা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছে। আজকে যেতেই হবে।

দুলাভাই, ঘুমাচ্ছেন নাকি?

হাবিবুর রহমান জেগেই ছিলেন। ফার্মেসির দরজার দিকে তাকিয়েও ছিলেন, তারপরেও তিনি কেন মতিনকে ঢুকতে দেখেন নি এটা ভেবে বিস্মিত বোধ করলেন। মতিনকে দেখে তার ভালো লাগছে। ভালো লাগাটা তিনি প্রকাশ করলেন না।

দুলাভাইয়ের শরীর খারাপ না-কি?

না।

দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ।

হাবিবুর রহমান জবাব দিলেন না। মতিন বলল, তৌহিদাকে না-কি ক্লিনিকে ভর্তি করেছেন, এটা কি সত্যি?

হাবিবুর রহমান বললেন, হুঁ।

বুবুকেও ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যান। থাকবেন আমার সঙ্গে মেসে। ঠিক আছে?

হাবিবুর রহমান বললেন, তুমি কতক্ষণ থাকবে?

মতিন বলল, যতক্ষণ বলবেন ততক্ষণ থাকব।

রাতে আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কর।

আচ্ছা।

বাসায় ফেরার পথে তৌহিদাকে দেখে যাব। তুমিও সঙ্গে চল। তোমাকে দেখলে সে খুশি হবে।

আচ্ছা।

হাবিবুর রহমান ঘড়ি দেখলেন না। আটটা পনেরো বাজে। নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করছে না। মতিনকে নিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফেরাই ভালো। তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। ঘরে কিছুই নেই। এক কেজি খাসির মাংস কিনে ফিরতে হবে।

মতিন।

জি দুলাভাই।

তুমি সারাক্ষণ ডুব দিয়ে থাক, এটা অন্যায়।

মতিন হাই তুলতে তুলতে বলল, সারাক্ষণ ভেসে থাকাও অন্যায়।

হাবিবুর রহমান বিরক্ত মুখে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলাও অন্যায়। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বাকি জীবন তোমার সঙ্গে কথা বলব না। তোমার বোনও এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মতিন সিগারেট ধরিয়েছে। মুরব্বিদের সামনে সিগারেট ধরানোটা বেয়াদবি। হাবিবুর রহমান মতিনের এই বেয়াদবি উপেক্ষা করলেন। সবসময় সবকিছু ধরতে নেই।

মতিনকে দেখে হাবিবুর রহমানের ভালো লাগছে। বিপদের সময় একজন কেউ পাশে থাকলে ভালো লাগে। ভরসা পাওয়া যায়।

দুলাভাই, আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি।

বলো।

আপনি যেরকম রাগী রাগী ভঙ্গিতে কথা বলছেন, ভরসা পাচ্ছি না। একটু সহজভাবে তাকাবেন আমার দিকে?

আগডুম বাগডুম না করে কী বলবে বলো।

একটা মেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে আছে। কয়েকটা দিন তাকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিতে হবে। অসুবিধা আছে?

অসুবিধার কী আছে? নাম কী মেয়ের?

নাম জানা কি দরকার? তার পরিচয় সে একজন বিপদগ্রস্ত মেয়ে। দুলাভাই, চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনার এখানে চায়ের ব্যবস্থা আছে?

না। সামনে টি-স্টল আছে, ওখান থেকে খেয়ে আস।

আপনিও চলুন।

দোকান বন্ধ করে যাই।

মতিন বলল, দোকান বন্ধ করার দরকার কী? আপনার তো আর সোনার দোকান না যে লুট করে নিয়ে যাবে। ওষুধ কে নিবে?

হাবিবুর রহমান কঠিন গলায় বললেন, আমার সঙ্গে পাগলের আলাপ করবে না। তুমি পাগল হতে পার, আমি পাগল না। তুমি চায়ের অর্ডার দাও। আমি দোকান বন্ধ করে আসছি।

নিরাময় ক্লিনিকের কেয়ারটেকারের চেহারা সিনেমার নায়কদের মতো। তার কথাবার্তা পোশাক-আশাকও সেরকম। সিনেমার নায়করা যেমন নায়িকা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই ভুরু কুঁচকে কথা বলে এও সেরকম। সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে আছে। তার হাতে চা বা কফির মগ। কথা বলছে চোখের দিকে না তাকিয়ে।

রোগীর সঙ্গে দেখা হবে না। আপনারা চলে যান।

হাবিবুর রহমান বললেন, দেখা হবে না কেন?

রোগীকে নটার সময় ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। সে ঘুমাচ্ছে।

হাবিবুর রহমান বললেন, ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন রাত দশটা পর্যন্ত দেখা করা যাবে।

কেয়ারটেকার বলল, আমার প্রতি সেরকম নির্দেশ নেই। খামাখা তর্ক করবেন না। বাসায় চলে যান।

হাবিবুর রহমান মতিনের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললেন, কী করব?

মতিন বলল, এসেছি যখন দেখা করে যাব।

কীভাবে?

ব্যবস্থা করছি। আপনি ক্লিনিকের গেটের বাইরে গিয়ে সিগারেট ধরান।

মতিন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। কেয়ারটেকারের পাশে একজন নার্স এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে ফাইল। নার্সটার চেহারা সুন্দর। কেয়ারটেকারের ভুরু এখন সহজ হয়েছে। মুখ হাসি হাসি। নায়ক সিনড্রম। মতিন নিজেও হাসি হাসি মুখ করে বলল, ভাই, আপনার নাম জানতে পারি?

কেয়ারটেকারের ভুরু আবার কুঁচকে গেল। গলার স্বর কঠিন।

নাম জেনে কী করবেন?

কী করব সেটা পরের ব্যাপার। আপনার কি নাম বলতে অসুবিধা আছে?

নাজমুল হাসান।

মতিন শান্তগলায় বলল, হাসান সাহেব, কী বলছি মন দিয়ে শুনুন। আমার নাম মতিন! আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পলিটিক্যাল পিএস। আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চান?

নাজমুল হাসান শুকনো গলায় বলল, কী সমস্যা বলুন তো?

সমস্যা আপনাকে বলব না। ক্লিনিকের যিনি পরিচালক তাকে বলব। আপনি টেলিফোনে উনাকে ধরে দিল।

স্যারকে এখন পাওয়া যাবে না। তিনি সিঙ্গাপুর গিয়েছেন। আঠারো তারিখ ফিরবেন।

উনার নেক্সটম্যান কে?

আপনারা কী চাচ্ছেন বলুন, আমি ব্যবস্থা করি। পেসেন্ট তৌহিদার সঙ্গে কথা বলবেন তো? নার্স, পেসেন্টকে নিয়ে এসো।

কাউন্টারে বড় বড় করে লেখা NO SMOKING. সেদিকে তাকিয়েই মতিন সিগারেট ধরিয়ে আয়োজন করে ধোয়া ছাড়তে লাগল। কেয়ারটেকার নাজমুল তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না।

তৌহিদা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে মতিনকে দেখল। তার চেহারা ঝলমল করে উঠল। সে কিশোরীর আনন্দময় গলায় বলল, আমাকে নিতে এসেছ?

মতিন বলল, হুঁ।

তৌহিদা বলল, ব্যাগ নিয়ে আসি?

মতিন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

তৌহিদা উল্কার মতোই ছুটে গেল। মতিন কেয়ারটেকারের দিকে তাকিয়ে শান্তগলায় বলল, আপনারা ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। রোগী ঘুমাচ্ছে। রোগী তো দিব্যি জেগে আছে। আপনার সমস্যাটা কী?

নাজমুল হাসান কিছু বলল না। তাকে হঠাৎ করেই খুব বিচলিত মনে হলো। মতিন বলল, পেসেন্টের রিলিজের ব্যবস্থা করুন। আমরা পেসেন্ট এখানে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না।

পেসেন্ট কীভাবে রিলিজ করব?

যেভাবে রিলিজ করা হয় সেভাবে করবেন। আপনাদের কর্তাব্যক্তি যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি কথা বলব, প্রয়োজনে মাননীয় মন্ত্রী সাহেব কথা বলবেন। আমি ব্যবস্থা করে দেব। পেসেন্ট মন্ত্রী সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। উনি চান না বিষয়টা সবাই জানুক। সে কারণেই গোপন।

ভাই সাহেব, আমি তো বিরাট যন্ত্রণায় পড়লাম। স্যারও দেশে নাই।

সিঙ্গাপুরে উনি যে হোটেলে আছেন সেখানে টেলিফোন করুন। কমুনিকেশন বিপ্লবের যুগে এটা কোনো ব্যাপার না। রেইন ফরেস্টের গাছের উপর কেউ বসে থাকলে ও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

কেয়ারটেকার নাজমুলকে দেখে মনে হচ্ছে সে পুরোপুরি বিপর্যস্ত। মতিন। আরেকটা সিগারেট ধরাল।

রাত সাড়ে দশটায় তৌহিদাকে নিয়ে মতিন ক্লিনিকের গেট দিয়ে বের হলো। তৌহিদার হাতে কাপড়ের একটা ব্যাগ। মতিনের হাতে বিশাল এক স্যুটকেস। হাবিবুর রহমান গেটের বাইরে চিন্তিত মুখে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। দুজনকে বেরুতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ-কী! মতিন বলল, দুলাভাই, একটা ট্যাক্সি ক্যাব দেখুন। ঘটনা পরে ব্যাখ্যা করব।

তৌহিদার খুবই আনন্দ হচ্ছে। তার মাথায় অনেক কিছু মিলিয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে সব জট খুলে গেছে। তার বিয়ে হয়েছে মতিনের সঙ্গেই। বিয়ের পর অসুস্থ হয়ে সে হাসপাতালে ছিল। অসুখ সেরে গেছে বলে তার স্বামী তাকে নিতে এসেছে।

তৌহিদা মতিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি স্যুটকেস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভার লাগে না? স্যুটকেস নামিয়ে রাখ।

মতিন স্যুটকেস নামিয়ে রাখল।

তৌহিদা বলল, রাতের খাবার খেয়েছ?

মতিন বলল, না। বাসায় গিয়ে খাব।

বাসায় রান্না কী?

জানি না কী রান্না।

তৌহিদা বলল, কী রান্না সেটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি গিয়ে রাঁধব।

মতিন বলল, ঠিক আছে।

তৌহিদা মতিনের দিকে এগিয়ে এসে সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মতিনের হাত ধরল। তার মোটেও লজ্জা লাগছে না। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরবে এতে লজ্জার কী আছে? তাছাড়া রাস্তায় লোকজনও নেই। কেউ দেখছেও না।

তৌহিদা বলল, অ্যাই, তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?

মতিন বলল, জানি না কেন?

তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি আজ রাতে ঘুমাবার সময় তোমার হাতে আর পায়ে তেল মালিশ করে দেব।

আচ্ছা।

শুধু আজ না, আমি রোজ রাতে তেল মালিশ করে দেব।

আচ্ছা।

আমি এতদিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছি, তুমি আজ প্রথম আমাকে দেখতে এসেছ। সরি বলো।

সরি।

হাবিবুর রহমান ইয়েলো ক্যাব নিয়ে ফিরেছেন। দরজা খুলে নামার সময় দেখলেন, তৌহিদা মতিনের গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

১৯. সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ

হ্যালো মতিন!

সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ। হো হা হা হা হো হো! কী ভাবছিস? পাগল হয়ে গেছি? ঠিক ধরেছিস। পাগলই হয়েছি। পাগল হবার মতো ঘটনা ঘটেছে।

ক্যামব্রিজের নাসির ভাই দারুণ কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তোর লেখা (থুরি নদ্দিউ নতিম সাহেবের লেখা) Autobiography of a Fictitious Poet–পেঙ্গুইন নিয়েছে। বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ সিরিজে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে। অতি দ্রুতই হচ্ছে। নাসির ভাই লেগে আছেন পেছনে। উনার লেগে থাকার অবশ্যি আলাদা কারণও আছে। তোর বইটির অনুবাদ আমি করলেও অনুবাদক হিসেবে নাসির ভাইকে তার নাম দিতে বলেছি। উনি মহানন্দে এই অন্যায় কাজটি করেছেন। এখন তিনি অনুবাদক হিসেবে ৩০% রয়েলটি মানি পাবেন। তার মতো মহাকৃপণের কাছে অনুবাদের রয়েলটির পাউন্ডগুলি অতি মূল্যবান।

সে যা পাওয়ার পাক, তুই যা পেতে যাচ্ছিস সেটাই ইম্পোর্টেন্ট। মতিন শোন, তুই যে অনেক দূর যাবি তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কবে বুঝতে পেরেছিলাম মনে করিয়ে দেই। আমরা রমিজের বিয়েতে জয়দেবপুর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা নাগাদ বিয়ে হয়ে গেল। রাতের খাবার দিতে দেরি হবে। আমরা দুজন গ্রাম দেখতে বের হলাম। একটা পুকুরঘাটে গিয়ে বসেছি। আকাশে মস্ত চাঁদ। চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে পুকুরের পানিতে। দেখতে ভালো লাগছে। এই সময় একজন বুড়োমানুষ বাশের লম্বা কঞ্চি নিয়ে পুকুরঘাটে উপস্থিত হলেন। তিনি কঞ্চি দিয়ে পুকুরের পানিতে কী যেন করছেন। এই সময় তুই হঠাৎ উত্তেজিত

গলায় বললি, চাঁদটা কী রকম লাজুক দেখেছিস? বুড়ো চাঁদটাকে কঞ্চি দিয়ে যখনই ছুঁয়ে দিচ্ছে তখনি চাঁদটা লজ্জায় শতখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। আবার নিজেকে জড় করছে আবার সে শতখণ্ড হচ্ছে।

পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব স্পর্শ মাত্র শতখণ্ড হবে এটা আমরা জানি। জানি না এই ব্যাখ্যা। একজন বড় মাপের সৃষ্টিশীল মানুষের কাজ সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা। এই কাজটি তুই কী চমৎকারভাবেই না করলি! তার পরপরই তুই বিষয়টি নিয়ে কবিতা লিখলি। কবিতার শিরোনাম অদ্ভুত–বৃদ্ধ রমিজ মিয়ার হাতে চন্দ্র নিগৃহীত।

কবিতার লাইনগুলি তোর কি মনে আছে? আমার মনে আছে–

বৃদ্ধ রমিজ মিয়া ইনসমনিয়ার রোগী
দিনে কিছুক্ষণ ঘুমুলেও রাত নির্ঘুম
তার কাছে রজনীও দিবসের মতোই নিঝুম॥

আচ্ছা থাক কবিতা থাক, আমরা এখন থেকে কথা বলব মহান নদ্দিউ নতিম সাহেবের গদ্য নিয়ে। জয় গদ্য।

কুহক লেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে

বল দেখি কার লাইন? বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের। তিনিও কিন্তু ইনসমনিয়ার রোগী বুদ্ধ রমিজ মিয়ার মতো চন্দ্রশাসন। করেছিলেন। এই বিষয়ে আমারও এখন একটা প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করছে। প্রবন্ধের নাম চন্দ্রশাসন। তোকে দেখে উৎসাহ পাচ্ছি।

তুই কি আমার আনন্দ বুঝতে পারছিস? খবরটা পেয়ে এত আনন্দ হলো–ইচ্ছা করল এক বোতল শ্যাম্পেন একাই খেয়ে ফেলি। জঙ্গলে শ্যাম্পেন কোথায় পাব? শেষে কী করলাম শোন, সব কাপড় খুলে নেংটো হয়ে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করলাম।

প্রবল আনন্দের সময় মানুষ গায়ের বসন খুলে ফেলতে চায়, এই বিষয়টি কি তুই জানিস?

না জানলে নাই। আমি জানি তাতেই চলবে।

আজ এই পর্যন্তই।

তোর অনুরাগী পাঠক–
নঠিক ধাগা

(কঠিন গাধা উল্টো করে লিখলাম নঠিক ধাগা। তোর মতো হবার ব্যর্থ চেষ্টা।)

২০. কমল ছাদে

কমল ছাদে। সে বসেছে বেতের চেয়ারে। তাকে একটু দূর থেকে লক্ষ করছে। রহমত। কমলের উপর চোখ রাখার দায়িত্ব রহমতের। চোখ রাখার কাজটা এমনভাবে করতে হয় যেন কমল বুঝতে না পারে। রহমত সিঁড়িঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন। সে যেতে পারছে না।

কমল তাকিয়ে আছে লিফটরুমের ছাদের দিকে। ছাদে উঠার লোহার সিঁড়ি আছে। কয়েকটা কাক লোহার সিঁড়িতে বসে আছে। একটা কাক বসেছে তিন ধাপ সিঁড়িতে। দুটা কাক বসেছে চার ধাপে। তিন ধাপে বসেছে একটা কাক। তিন ধাপ সিঁড়ি আর একটা কাক হলো চার। জোড় সংখ্যা। চার ধাপে বসেছে। দুটা কাক। চার ধাপ যোগ দুটা কাক হলো ছয়। আবার জোড় সংখ্যা। একটা কাক রেলিং-এ বসে আছে। এই কাকটা যদি উড়ে আসে তাহলে কী হবে? সে কোথায় বসবে? তার বসা উচিত প্রথম ধাপে। কিংবা পঞ্চম ধাপে। কমল প্রবল উত্তেজনা বোধ করছে। একটা সমস্যাও আছে। সিঁড়ির ধাপের সঙ্গে কাক কি যোগ করা যায়? সিঁড়ির ধাপ এক জিনিস কাক অন্য জিনিস।

রেলিং-এ বসা কাকটা সিঁড়িতে বসল না, তবে সিঁড়ি থেকে একটা কাক উড়ে গেল। কী আশ্চর্য, তারপরেও জোড় সংখ্যা বজায় রইল। কারণ চতুর্থ ধাপ থেকে একটা কাক উড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ ধাপের কাকটা বসেছে পঞ্চম ধাপে। তাহলে এমন কি হতে পারে, কাকরা অঙ্ক জানে? বিষয়টা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। কমল তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, আঙ্কেল। ফলিয়া!

রহমত সিঁড়িঘরের দরজার আড়াল থেকে বের হলো। কমল বলল, আঙ্কেল ফলিয়া! কাক কি অঙ্ক জানে?

জানে না।

কমল বলল, তুমি কীভাবে জানো যে কাকরা অঙ্ক জানে না? তুমি তো কাকদের সঙ্গে কথা বলতে পার না।

রহমত সঙ্গে সঙ্গে বলল, তাও ঠিক।

তাহলে কীভাবে বললে কাকরা অঙ্ক জানে না?

ভুল হয়েছে ছোটবাবু। কাক অঙ্ক জানে। যোগ, বিয়োগ, গুণ-ভাগ সবই জানে!

কমল বলল, কাক যে অস্ক জানে সেটাই বা তুমি কীভাবে বললে?

রহমত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। এই ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলা খুবই বিপদজনক। সে কীভাবে কীভাবে যেন প্যাচ বাঁধিয়ে ফেলে। প্যাচ থেকে বের হবার কোনো উপায় থাকে না। আবার ডাকে আঙ্কেল ফলিয়া। এর মানে কী আল্লাখোদা জানেন।

আঙ্কেল ফলিয়া!

জি ছোটবাবু বলেন। ফুট জুস খাবেন? আনব?

ফ্রুট জুস আনতে হবে না। আপনি কাগজ-কলম আর স্টপওয়াচ নিয়ে আসুন। আমার ঘরের প্রথম ড্রয়ারে একটা ডিজিটাল স্টপওয়াচ আছে।

স্টপওয়াচ দিয়ে কী করবেন? কাকরা লিফটঘরের লোহার সিঁড়িতে বসছে। এটার হিসাব রাখব।

রহমত বলল, পশুপক্ষী কখন কোনখানে বসব তার হিসাব রাখনের কি দরকার আছে?

আছে, দরকার আছে।

রহমত স্টপওয়াচ আনতে গেল। তার যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ছোটবাবুকে কখনো একা রাখা ঠিক না। ছাদের মতো একটা খোলামেলা জায়গায় তো কখনো না। ছোট ভাইজানের মাথার উপর দিয়ে কোনো অ্যারোপ্লেন কিংবা হেলিকপ্টার উড়ে গেলে বিরাট সমস্যা হবে। শব্দ সমস্যা করবে। বড় সাহেব যদি শুনেন সে ছোটবাবুকে একা ছাদে রেখে গেছে, তাহলে খুবই রাগ করবেন।

সালেহ ইমরান লাইব্রেরি ঘরে বসে আছেন। মিনিট দশেক আগে তিনি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকেছেন। কী জন্যে ঢুকেছেন এখন মনে করতে পারছেন না। নিশ্চয়ই কোনো বইয়ের খোঁজে এসেছেন। সে বইটা কী? আজ ছুটির দিন। তার হাতে কোনো কাজ নেই। ছুটির দিনগুলিতে শরীরে আরামদায়ক আলস্য থাকে। তিনি সেই আলস্য বোধ করছেন না, বরং সারাক্ষণই মনে হচ্ছে, আজ কিছু করার নেই। মুনা বাড়িতে নেই। সে আলাদা বাস করতে

শুরু করেছে। মুনার অনুপস্থিতিতে তিনি এখনো অভ্যস্ত হন নি। খাটে ঘুমুতে যাবার সময় এখনো একপাশে জায়গা রেখে শুচ্ছেন। একটা সময় আসবে যখন তিনি খাটের মাঝখানে ঘুমুতে শুরু করবেন। তখন বুঝতে হবে তিনি মুনার অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মানুষ অতি দ্রুত অভ্যস্ত হয়, এটাই ভরসার কথা।

সালেহ ইমরান চোখ বন্ধ করে লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিলেন। তিনি ঠিক করেছেন, হাতে যে বই উঠে আসবে সেটাই তিনি পড়বেন। পুরো বই পড়ার ধৈর্য তাঁর নেই, কাজেই পড়বেন একটা পৃষ্ঠা। চোখ বন্ধ করে বইটা মেলবেন, যে পৃষ্ঠা উঠে আসে সেটাই পড়বেন। একধরনের খেলা। বয়স্ক মানুষরাও গোপনে শিশুদের মতো কিছু খেলা খেলে।

সালেহ ইমরানের হাতে একটা কবিতার বই উঠে এলো। 100 Poems by 100 Poets. তিনি ভুরু কুঁচকালেন। কবিতা তাঁর বিষয় না। তিনি কখনো। কবিতা পড়েন না। বইটি রেখে কি আরেকটি বই নেবেন? না-কি আগে যেভাবে ঠিক করা ছিল সেইভাবেই এগুবেন? চোখ বন্ধ করে পাতা উল্টাবেন, যে কবিতাটি উঠে আসে সেটাই পড়বেন। তিনি পাতা উল্টালেন। একটা কবিতা বের হলো, যার শিরোনাম–Ecce Puer, এর মানে কী? কবির নাম জেমস। জয়েস। অতি বিখ্যাত নাম। কিন্তু ইক্কি পিউ-এর মানে কী?

Of the dark past
A child is born;
With joy and grief
My heart is torn.

এই কবিতারই বা মানে কী? অন্ধকার অতীত থেকে একটি শিশুর জন্ম হলো। আমি তাতে আনন্দিত এবং দুঃখিত। প্রবল আনন্দ এবং শোকে আমার কলিজা ছিঁড়ে আছে।

একটা কবিতা একই সঙ্গে আনন্দের এবং শোকের হবে কীভাবে? Born এর সঙ্গে মিল দেবার জন্যেই কি torn শব্দটা এসেছে?

সালেহ ইমরান কবিতার বই জায়গামতো রেখে দিলেন। গলা উঁচিয়ে রহমতকে ডাকলেন। তখন মনে পড়ল, রহমত কমলকে নিয়ে ছাদে গেছে।

তিনি কি এখন ছাদে যাবেন? কমলের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা হবে? তাদের অবশ্যি আজ রাতে ছবি দেখার প্রোগ্রাম আছে। ছবির নাম Stalker. সায়েন্সফিকশান।

সালেহ ইমরান ছাদের দিকে রওনা হলেন। ছাদি পর্যন্ত লিফট নেই। লিফট তিনতলা পর্যন্ত। তাকে কিছু সিঁড়ি ভাঙতে হলো। তাঁর মাথায় এখনো কবিতাটা ঘুরছে–Of the dark past a child is born, কবি কি শিশুর মাতৃগর্ভের অন্ধকারের কথা বলছেন?

কমল স্টপ ওয়াচ হাতে মূর্তির মতো বসে। তার দৃষ্টি কাকগুলির দিকে। কোনো একটা পরীক্ষা হচ্ছে–এই বিষয়টা মনে হচ্ছে কাকরা টের পেয়েছে। তারা এখন আর নড়াচড়া করছে না। স্থির হয়ে আছে।

সালেহ ইমরান ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না। কি রে?

কমল হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। সালেহ ইমরান বললেন, কী পরীক্ষা?

কমল বাবার দিকে না তাকিয়েই বলল, এখন বলব না।

এখন বললে তোমার পরীক্ষায় আমি সাহায্য করতে পারতাম। যে-কোনো পরীক্ষায় একজন অ্যাসিসটেন্ট লাগে। শার্লক হোমসের সঙ্গে থাকেন ওয়াটসন।

রহমত স্যারের জন্যে চেয়ার নিয়ে এসেছে। গার্ডেন ছাতা এনেছে। মাথার উপর ছাতা ধরবে।

সালেহ ইমরান বললেন, আমার মাথার উপর ছাতা ধরতে হবে না। তুমি, চা নিয়ে এসো। চা খাব।

কমল বলল, আমিও চা খাব।

সালেহ ইমরান বললেন, তুমি চা খাও নাকি?

কমল বলল, যখন আমি বড় হয়ে যাই তখন চা খেতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে আমি বড় হয়ে যাই।

সালেহ ইমরান বললেন, বড় হয়ে যাই কথাটা ঠিক বলছ না। তোমার বলা। উচিত–মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি বড় হয়ে গেছি। তখন চা খাই।

কমল বলল, তুমি ঠিক বলেছ।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার অ্যাক্সপেরিমেন্ট কি শেষ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ফলাফল কী?

ফলাফল ভালো না।

অ্যাক্সপেরিমেন্ট ফেল করেছে?

হুঁ।

তোমার মন খারাপ লাগছে?

না।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ

মন খারাপ না।

চল নিচে যাই, একটা ছবি দেখি।

এখন তো ছবি দেখার সময় না।

সালেহ ইমরান ছেলের পিঠে হাত রাখলেন। কমল সেই হাত সরিয়ে দিল। এটা বিস্ময়কর ঘটনা। সালেহ ইমরান নরম গলায় বললেন, চল একটা ছবি দেখি।

কমল বলল, আজ ছবি দেখার তারিখ না।

সালেহ ইমরান বললেন, সবকিছু দিন-ক্ষণ দেখে হয় না। কঠিন নিয়মকানুনে মানুষ চলতে পারে না। মাঝে মাঝে তাকে নিয়মের বাইরে যেতে হয়।

কেন?

কারণ মানুষ যন্ত্র না। যন্ত্রই নিয়মের ভেতর থাকে। মানুষ থাকে না।

আমার নিয়মের ভেতর থাকতে ভালো লাগে। আমি এখন ছবি দেখব না। ছাদে বসে থাকব। কাক দেখব।

সালেহ ইমরান বললেন, নিয়মের ভেতর থাকতে তোমার ভালো লাগে কিন্তু তুমিও সবসময় নিয়মের ভেতর থাক না। তোমার নিয়ম ঘরে বসে থাকা। তুমি বসে আছ ছাদে। ঠিক বলেছি?

হুঁ।

কেউ তোমার গায়ে হাত দিলে তুমি হাত সরিয়ে দাও। আমি অনেকক্ষণ তোমার পিঠে হাত দিয়ে আছি, তুমি হাত সরিয়ে নাও নি।

কমল গা ঝকাল। সালেহ ইমরান হাত সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, তুমি কি তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

না।

যাও ঘুরে এসো। ছাদে একা একা বসে না থেকে মার সঙ্গে দেখা করে আসি।

কমল বলল, না। একা ছাদে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে।

এখন তো তুমি একা না। আমি আছি তোমার সঙ্গে।

কমল আকাশের দিকে তাকাল। তার শরীর সামান্য কাঁপছে। উত্তর দিক থেকে হেলিকপটারের শব্দ আসছে। ঢাকা শহরের ছাদের উপর দিয়ে আজকাল প্রায়ই হেলিকপ্টার উড়ে। কমলের মুখ ফ্যাকাশে। সে দুহাত দিয়ে তার কান চেপে ধরল। তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখ ভিজে আসছে। সালেহ ইমরান ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। প্রচণ্ড শব্দ করে হেলিকপ্টার প্রায় তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

কমল ক্ষীণ গলায় ডাকল, বাবা!

সালেহ ইমরান বললেন, বলো শুনছি। এখন তুমি কান থেকে হাত সরাতে পার, হেলিকপ্টার উড়ে চলে গেছে।

থ্যাংক য়্যু।

আমাকে থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। আমি কিছু করি নি।

তুমি আমার মাথায় হাত রেখেছ। আমার ভয় কমেছে। বাবা, মানুষ ভয় পায় কেন?

সালেহ ইমরান ছেলের সামনে রাখা বেতের টেবিলে সাবধানে বসলেন। মানুষ ভয় পায় কেন এই জটিল বিষয় ছেলেকে বুঝিয়ে বলতে হবে। বোঝাতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি নিজে কখনো এই বিষয় নিয়ে ভাবেন নি। ভেবে ভেবে বলতে হবে। যুক্তি দুর্বল হলে চলবে না।

মানুষ ভয় পায়, কারণ সে নিজেকে খুবই ভালোবাসে। তার নিজের কোনো ক্ষতি হবে ভাবলেই সে ভয় পায়। মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়, কারণ তার ধারণা সাপ তার ক্ষতি করবে। মানুষ প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি দেখলে ভয় পায়, কারণ তার ধারণা ঝড় তার ক্ষতি করবে। তুমি হেলিকপ্টার দেখে ভয় পেয়েছ, কারণ তোমার ধারণা, হেলিকপ্টারের শব্দ তোমার ক্ষতি করবে।

কমল বলল, এখন উল্টো করে বলো।

সালেহ ইমরান বললেন, উল্টো করে কী বলব বুঝতে পারছি না।

কমল বলল, ভয়ের উল্টো হলো আনন্দ। মানুষ আনন্দ পায় কখন? যখন সে মনে করে এই জিনিসটা তার ক্ষতি করবে না তখন সে আনন্দ পায়?

হতে পারে।

আমি যখন অঙ্ক করি তখন আনন্দ পাই। অঙ্ক আমার ক্ষতি করবে না এইজন্যে কি আনন্দ পাই?

সালেহ ইমরান কী বলবেন ভেবে পেলেন না, বিষয়টা যথেষ্ট জটিল হয়ে যাচ্ছে।

বাবা!

বলো।

তুমি এখন নিচে চলে যাও। আমি ভয় এবং আনন্দ নিয়ে ভাবব।

আমি সামনে বসে থাকি, তুমি ভাব।

না।

সালেহ ইমরান উঠে দাঁড়ালেন। কমল বাবার দিকে না তাকিয়ে বলল, তুমি মতিনকে জিজ্ঞেস করো–মানুষ কেন ভয় পায়, কেন আনন্দ পায়। সে বলতে পারবে।

সালেহ ইমরান বললেন, বয়স্ক মানুষকে নাম ধরে ডাকা ঠিক না। তুমি তাকে মতিন চাচা বলবে।

উনি তো আমার চাচা না। তাকে কেন চাচা ডাকব!

চাচা ডাকতে না চাইলে স্যার বলো।

স্যার বলব না। উনি আমার টিচার না। উনি আমার বন্ধু। বন্ধুকে আমি নাম ধরে ডাকি।

আচ্ছা ডেকো।

তুমি আজই তাকে জিজ্ঞেস করবে, মানুষ কেন ভয় পায় মানুষ কেন আনন্দ পায়।

আচ্ছা।

আর মাকেও জিজ্ঞেস করবে।

আচ্ছা।

এখনই জিজ্ঞেস করবে। কে কী বলল কাগজে লিখে ফেলবে।

Ok.

কমলের চোখ ঝলমল করছে। নতুন এই খেলায় সে আনন্দ পাচ্ছে। সালেহ ইমরান ছাদ থেকে নেমে যাওয়া মাত্রই সে ডাকল–আঙ্কেল ফলিয়া!

রহমত সিঁড়ি ঘরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। কমল বলল, তুমি কি বাবাকে ভয় পাও?

রহমত বলল, অবশ্যই ভয় পাই, যমের মতো ভয় পাই। কেন ভয় পাও? উনি আমার রুটিরুজির মালিক এইজন্যে ভয় পাই। আমাকেও ভয় পাও? অবশ্যই পাই।

রহমত যুতসই জবাবের জন্য মাথা চুলকাচ্ছে। জবাব মাথায় আসছে না। কমল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

সালেহ ইমরান অনেকবার চেষ্টা করেও মুনাকে ধরতে পারলেন না। টেলিফোনে রিং হয়, কেউ ধরে না। সে হয়তো এখনো ঘুমুচ্ছে। মাঝে মাঝে মুনা অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকে। আবার মাঝে মাঝে কাকডাকা ভোরে জেগে উঠে মিউজিক সিস্টেম চালু করে। অদ্ভুত অদ্ভুত বাজনা বেজে উঠে। মুনার কল্যাণে পৃথিবীর নানান দেশের বিচিত্র সব বাজনা তিনি শুনেছেন। একবার শুনলেন পাথরভাঙা মিউজিক। একদল মানুষ তালে তালে হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙে। সেই পাথর গড়িয়ে দেয়। বিচিত্র বাজনা। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। মানুষ উড়ে চলে গেলেও সঙ্গে করে সবকিছু নিয়ে যেতে। পারে না। তাকে স্মৃতি ফেলে রেখে যেতে হয়।

মুনাকে পাওয়া না গেলেও প্রথমবারেই তিনি মতিনকে মোবাইল টেলিফোনে পেয়ে গেলেন। মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, স্যার, আপনি আমার টেলিফোন নাম্বার কোথায় পেলেন?

সালেহ ইমরান বললেন, আমার টেলিফোন বইয়ে তোমার নামে তোমার নাম্বার এন্ট্রি করা আছে।

এন্ট্রি কে করেছে? আপনি?

এটা কি ইম্পোর্টেন্ট?

জি স্যার, ইম্পোর্টেন্ট। আমার মতো অভাজনের টেলিফোন নাম্বার আপনি আপনার টেলিফোন বুকে নিজের হাতে এন্ট্রি করেছেন, এটা কি ইম্পোর্টেন্ট না?

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই। টেলিফোনে আলাপটা ভালো হবে না। তুমি কি আসতে পারবে।

অবশ্যই পারব। জরুরি বিষয়টা কী?

মানুষ ভয় পায় কেন? আবার আনন্দই বা পায় কেন?

বিষয়টা আপনি জানতে চাচ্ছেন, না কমল জানতে চাচ্ছে?

কমল। তবে আমি নিজেও জানতে চাচ্ছি।

স্যার আমি যে-কোনো একদিন চলে আসব। আমার নিজের মতামতটা বলব, আবার নদ্দিউ নতিম সাহেবের মতামতটাও জেনে আসব।

আজ আসতে পারবে না?

জি-না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মামলাটা কোর্টে উঠবে। আমার যদিও কিছু করার নেই, তারপরেও থাকা দরকার।

তোমার কিসের মামলা?

মামলাটা ঠিক আমারও না। নিশুর মামলা। একটা রেপ কেস। পত্রিকায় এই নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে।

সালেহ ইমরান বললেন, আমি দেশী কোনো পত্রিকা পড়ি না। টাইম পড়ি, নিউজ উইক পড়ি। দেশী পত্রিকা মানে খুন-খারাবি, ধর্ষণ।

ঠিক বলেছেন। তবে স্যার আমাদের দেশের পত্রিকাগুলি রেপ কেইস নিয়ে যেমন মাতামাতি করে টাইম, নিউজ উইকের মতো দামি পত্রিকা তারচেয়ে বেশি মাতামাতি করে। তারপরেও সাহেবদের পত্রিকা বলে কথা।

সালেহ ইমরান বললেন, তোমার কথায় সত্যতা আছে। টাইম, নিউজ উইকও খুন ধর্ষণ নিয়ে বিরাট হৈচৈ করে। দেশী পত্রিকা নিয়ে আমি যে কমেন্ট করেছি তার জন্যে সরি।

স্যার, সরি হবার কিছু নেই।

আছে। অবশ্যই আছে।

স্যার, আমি এখন কোর্ট রুমে ঢুকে যাব। আপনার সঙ্গে পরে কথা হবে।

সালেহ ইমরান বললেন, গুড লাক।

জজ সাহেবের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে আছে। তার বিরক্তির কারণ দুটি মাছি। মাছি দুটি যুক্তি করে কাজে নেমেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। এদের একটি যখন তাঁর সামনে রাখা কাগজপত্রে বসে অন্যটি তখন তাঁর নাকে বসার চেষ্টা করে। জজ সাহেব কঠিন দৃষ্টিতে মাছি দুটিকে দেখছেন মাথা নেড়ে নাকের মাছি সরাতেই সে উড়ে যাচ্ছে আবার সঙ্গে সঙ্গেই নথিপত্রে বসা মাছি উড়ে আসছে। জজ সাহেব চেয়ারে বসেও তেমন আরাম পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। তিনি একবার চেয়ারের ডান দিকের হাতলে কাত হয়ে বসছেন আবার কিছুক্ষণ পরেই বাম দিকের হাতলে কাত হয়ে বসছেন।

মতিন তাকিয়ে আছে জজ সাহেবের দিকে। যদিও তার তাকিয়ে থাকা উচিত নিশুর দিকে। নিশুকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। আসামিপক্ষের উকিল তাকে প্রশ্ন করা শুরু করেছেন। আসামিপক্ষের উকিলের ভাবভঙ্গি এমন যে সে কোনো প্যাকেজ নাটকে মহাজ্ঞানী ব্যারিস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করছে। কঠিন কঠিন যুক্তি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। একেকটা প্রশ্ন করে সে, আবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মিচকা খালি হাসে। সেই হাসির অর্থ–কেমন, বুঝতেই কিছু প্যাকেজ নাটক হলে এই হাসিগুলি ক্লোজ-আপে ধরা হতো।

উকিল : আপনার নাম নিশু?

নিশু : জি।

উকিল : আপনি অবিবাহিতা?

নিশু : জি!

উকিল : কুমারী? [মিচকা হাসি]

নিশু : তার মানে? আমি তো একবার বলেছি আমি অবিবাহিতা।

উকিল : (মিচকা হাসি এখনো চলছে) অবিবাহিতা এক কথা, কুমারী ভিন্ন কথা। জগৎ সংসারে অনেক মেয়ে আছে যারা অবিবাহিতা, কিন্তু কুমারী না।

নিশু : আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

উকিল : ম্যাডাম, তেমন কিছু বলতে চাচ্ছি না। আপনি যে ফ্ল্যাটে থাকেন সেখানে আপনার সঙ্গে কে থাকেন?

নিশু : কেউ থাকে না, আমি একা থাকি। আগে বাবা থাকতেন, বাবার মৃত্যুর পর একা থাকি।

উকিল : (মিচকা হাসির পর) একা থাকতে ভয় লাগে না?

নিশু : ভয় লাগবে কেন?

উকিল : ভয় লাগবে নাইবা কেন? ঢাকা শহর ভালো জায়গা না। চোর আছে, ডাকাত আছে, সন্ন্যাসী আছে, রেপিস্ট আছে। অনেকে বলে ভূত-প্রেতও আছে। রাতে যখন একা ঘুমাতে যান তখন ভয় লাগে না?

নিশু : না।

উকিল : তাহলে কি আমরা ধরে নেব রাতে কেউ না কেউ আপনার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে বলেই আপনি ভয় পান না?

[নিশুর পক্ষের উকিল এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—]

নিশুর উকিল : মাননীয় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি–আমার মক্কেলকে অবান্তর প্রশ্ন করা হচ্ছে।

জজ সাহেব ফিরেও তাকালেন না।

তার সমস্ত মনোযোগ এই মুহূর্তে মাছি দুটিতে সীমাবদ্ধ। কারণ দুটি মাছিই এখন তার চেয়ারের ডান হাতলে বসে আছে। তিনি ইচ্ছা করলেই তার সামনে রাখা ফাইলটা দিয়ে একটা মোক্ষম বাড়ি দিয়ে মাছি দুটির অবস্থা কাহিল করে ফেলতে পারেন। এটা করা ঠিক হবে কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না।

উকিল : ম্যাডাম, আমি সরাসরি মূল বিষয়ে চলে যাই। আপনি ফ্ল্যাটবাড়িতে একা বাস করতেন, কারণ দেহব্যবসার জন্যে একা থাকাই উত্তম।

নিশু : এইসব কী বলছেন!

উকিল : দীর্ঘ দিন আপনি ঐ ফ্ল্যাটে দেহব্যবসা চালাতেন, এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনাকে উচ্ছেদ করার জন্যে থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে, এটা তো আপনি জানেন?

নিশু : পরে শুনেছি। জিডি এন্ট্রির বিষয়টা সাজানো।

উকিল : ম্যাডাম, আপনাকে কোনো ব্যাখ্যায় যেতে হবে না। আপনি শুধু হা-না বলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। Yes or No। আপনি কি সম্পূর্ণ একা। থাকেন?

নিশু : ইয়েস।

উকিল : আপনার খোঁজখবর করার জন্যে আত্মীয়স্বজনরা কখনো এসেছেন?

নিশু : না। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না।

উকিল : ভালো না থাকার কারণ কি এটা যে, তারা আপনার দেহব্যবসা সমর্থন করতেন না?

নিশু জবাব দিল না। তার চোখ-মুখ লাল। ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখের দৃষ্টিতে হতাশা। সে তাকাল মতিনের দিকে। মতিন মনে মনে বলল, নিশু এটা একটা খেলা। প্রশ্ন প্রশ্ন খেলা। খেলাতে রেগে যেতে নেই, ধৈর্য হারাতে নেই। খেলায় রেগে যাওয়া মানেই হেরে যাওয়া।

আসামিপক্ষের উকিল কালো কোটের পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন–

আসামি পক্ষের উকিল : মিস নিশু, আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। তার মানে কি এই যে, আপনার দেহব্যবসার প্রতি আপনার আত্মীয়স্বজনদের পরোক্ষ সম্মতি ছিল?

[নিশু কাঠগড়ার হাতল শক্ত করে চেপে ধরল। তার হাত কাঁপছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।]

আসামীপক্ষের উকিল : আপনি আমার কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না। শেষ প্রশ্নটির জবাব কি দেবেন? আপনার ফি কত? অর্থাৎ কাস্টমারদের কাছ থেকে আপনি কত টাকা নিতেন?

নিশু মাথা ঘুরে কাঠগড়ার ভেতর পড়ে গেল। উকিল সাহেব দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন। রাজনীতিবিদদের মতো এই হাসি অনেকক্ষণ ধরে রাখলেন। কেউ যদি ছবি তুলতে চায় তাহলে যেন তুলতে পারে। ক্যামেরাম্যান জুম করতে চাইলে সে সুযোগও আছে।

২১. সালেহার বুক থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে

সালেহার বুক থেকে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। রাত বারোটা দশ। হাবিবুর রহমান এত রাত পর্যন্ত জাগেন না। দশটা বাজতে না বাজতেই ঘুমিয়ে পড়েন। আজ জেগে বসে আছেন, তাঁর হাই উঠছে। তিনি হাই চেপে আছেন। সালেহা যদি দেখে তার এমন জটিল অবস্থাতেও একজন পাশে বসে হাই তুলছে তাহলে বিরাট ক্যাচাল বেঁধে যাবে। হাবিবুর রহমান তৌহিদার জন্য অপেক্ষা করছেন। তৌহিদা সরিষার তেলে রসুন দিয়ে চুলায় গরম করছে। রসুন-সরিষার তেল বুকে ডলা হবে। এতে যদি কিছু আরাম হয়। তৌহিদা এত দেরি করছে কেন কে জানে!

তৌহিদা ওষুধপত্র ছাড়াই এখন স্বাভাবিক আছে। মানসিক অসুস্থতার একটি মাত্র লক্ষণ তার ভেতর আছে। মতিনকে সে তার স্বামী হিসেবে জানে। তাকে সেই ভাবেই দেখে। মতিন তাঁর সঙ্গে বাস করছে না, মেসবাড়িতে থাকছে, এই বিষয়টিও সে সহজভাবে নিয়েছে। বেচারা কী করবে? এই বাসায় থাকার জায়গা কোথায়! নিশু নামের মেয়েটা বিপদে পড়ে থাকতে এসেছে। ছোট বাসা, বাড়তি রুম নেই। নিশু রাতে তার সঙ্গে এক খাটে ঘুমায়। মতিন তো আর দুজনের মাঝখানে ঘুমুতে পারে না। তৌহিদাকে কিছুদিন কষ্ট করতেই হবে। সব মানুষকেই জীবনের শুরুতে কিছুদিন কষ্ট করতে হয়। কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে। সে কিছুদিন কষ্ট করবে, তারপর মতিনের সঙ্গে বাস শুরু হবে। আলাদা সংসার। নয়-দশ বছর বয়সের একটা কাজের মেয়ে রাখবে। মেয়েটা ঘরের টুকটাক কাজ করবে। তৌহিদা রান্নাবান্না করবে। একবছর পার না হতেই সে বাবু নিয়ে নিবে। স্বামী-স্ত্রীর সংসার কোনো সংসার না। সংসারে বাবু থাকতে হয়।

তৌহিদা তেলের বাটি নিয়ে সালেহার পাশে দাঁড়াতেই সালেহা কঠিন ধমক দিলেন, তেল আনতে এতক্ষণ লাগল? তেল এনেছে এক বালতি। আমি কি তেলে গোসল করব? জিনিস নষ্ট করতে গায়ে লাগে না!

হাবিবুর রহমান বললেন, আহা, বাদ দাও তো। চুপ করে থাক, তেলটা মালিশ করে দিক।

সালেহা বললেন, বাবারে বাবা! ছোট বৌ-এর উপর দ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। এতই যদি দরদ তাহলে আমার সামনে বসে আছ কেন? ছোট বৌকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে যাও। ঘরও তো খালি নাই যে কোনো ঘরে ঢুকবে। আরেক মাগি এসে চেপে বসেছে। এক কাজ কর, ঐ মাগিটাকেও বিয়ে করে ফেল। মাগিকে ডেকে আন, আমি সুপারিশ করব।

তৌহিদা সালেহার ছোট বৌ বিষয়ক কথাবার্তা ঠিক বুঝতে পারে না। বুবু কেন তাকে ভাইজানের ছোট বৌ বলে খোঁটা দেয়? এটা ঠিক না। ভাই হলো ভাই। ভাইয়ের সম্মান নষ্ট হয় এই ধরনের কোনো কথা বলা ঠিক না। তৌহিদার উচিত প্রতিবাদ করা। সে করে না। অসুস্থ মানুষের কথা ধরতে হয় না। বুবুর। শরীর অতিরিক্ত খারাপ।

তৌহিদা হাতে তেল মাখিয়ে বিছানার দিকে ঝুঁকে এলো। সালেহা ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বললেন, তুই তেলের বাটি নিয়ে বিদায় হ। তোর স্বামীর ... (মুদ্রণযোগ্য না) তেল মাখিয়ে দে।

হাবিবুর রহমান তৌহিদার দিকে তাকিয়ে চোখ ইশারা করলেন সে যেন চলে যায়। তৌহিদা তাই করল। সালেহা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বসে আছ কেন? ছোট বৌ-এর কাছে যাও। ছোট বৌ-এর সঙ্গে লটরপটর কর। নিজের বৌ, বাইরের কেউ তো না।

হাবিবুর রহমান হতাশ গলায় বললেন, নোংরা কথাগুলি না বললে হয় না?

সালেহা বললেন, তুমি নোংরা কাজ করতে পারবে, আমি নোংরা কথা বলতে পারব না?

হাবিবুর রহমান দুঃখিত গলায় বললেন, তুমি খুব ভালো করে জানো নোংরা কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি অতীতে কোনোদিন কোনো নোংরা কাজ করি নি, ভবিষ্যতেও করব না।

সালেহা সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বললেন, ওরে বাবারে, এত বড় মহা মানব আমার সামনে বসে আছে। তুমি কষ্ট করে তোমার বাম পা-টা এগিয়ে দাও। আমি তোমার শ্রী চরণ চেটে দেই।

হাবিবুর রহমান কিছু বললেন না। তিনি এখন অনেক স্বস্তি বোধ করছেন, কারণ সালেহার বুক থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। ঝামেলাটা সেরে গেছে। তাঁর মন বলছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সালেহা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তিনিও ঘুমাতে পারবেন। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেবেন। হাবিবুর রহমান স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, বুকের ব্যথাটা কি কমেছে?

সালেহা বললেন, কমলে তোমার কী?

একগ্লাস পানি খাও। পানি খেয়ে ঘুমাবার চেষ্টা কর।

পানি তুমি খাও] একগ্লাস না, এক বালতি খাও। পানি খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা কর। তৌহিদাকে দেখে তোমার শরীর গরম হয়ে গেছে। শরীর ঠাণ্ডা করা দরকার।

হাবিবুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সালেহা এরকম ছিল না। রোগে শশাকে সে বদলে যাচ্ছে। রোগটা যে কী তাও ধরা যাচ্ছে না। যে রোগ ধরা যায় সে রোগের চিকিৎসা হয়। রোগই ধরা যায় না, চিকিৎসা কী হবে? একটা সন্তান যদি তার পেটে আসত সব ঠিক হয়ে যেত। সেই চেষ্টাও কম করা হয় নি। চেষ্টা যে এখন বন্ধ হয়ে গেছে তাও না গোপনে গোপনে চলছে। তিনি নবীনগরের এক পীর সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। পীর সাহেব তাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। চিল্লায় বসে এই দোয়া পড়তে হবে। সাতদিনের চিল্লা। এই সাতদিনে গায়ে তেল মাখা যাবে না, মাংস খাওয়া যাবে না। সময় সুযোগ হচ্ছে না বলে চিল্লায় যাওয়া যাচ্ছে না।

হাবিবুর রহমান খাট থেকে নামলেন। সালেহা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, যাও কোথায়?

বারান্দায় যাই। একটা সিগারেট খাব।

সিগারেট খাবে না-কি ছোট বৌ-এর সঙ্গে ঘষাঘষি করবে? কোথাও যেতে পারবে না। যেখানে বসে ছিলে সেখানে বসে থাক।

হাবিবুর রহমান বাধ্য ছেলের মতো খাটে উঠে বসতে বসতে বললেন, সালেহা, আমি সাতদিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যাব।

সালেহা বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললেন, কেন?

একটা জরুরি কাজ আছে।

কাজটা কী?

কাজটা কী তোমাকে বলা যাবে না। শুধু তোমাকে না, কাউকেই বলা যাবে। বললে কাজটা হবে না।

হলে না হবে। কী কাজ বলো।

সাতদিনের জন্যে চিল্লায় বসব।

চিল্লা কী?

মসজিদে বসে এক মনে আল্লাহপাককে ডাকব।

উনাকে ডাকাডাকি করে বিরক্ত করার দরকার কী?

চিল্লায় বসে উনার কাছে কিছু চাইলে উনি দেন। সন্তান চাব। দেখি উনার দয়া হয় কি-না।

সালেহা কঠিন কোনো কথা বলতে গিয়েও বললেন না। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, যাও, সিগারেট খেয়ে আস।

হাবিবুর রহমান বললেন, থাক শুয়ে পড়ি।

হাবিবুর রহমান বাতি নিভালেন। বিছানায় শুতে এলেন। সালেহা নিজের মনে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, আমার যদি একটা মেয়ে হতো এমন নাম রাখতাম যে নাম কেউ কোনোদিন রাখে না।

কী নাম?

আচার।

মেয়ের নাম রাখবে আচার?

হুঁ।

ঘর অন্ধকার। সালেহা হাসতে শুরু করেছেন। শব্দ করেই হাসছেন। আচার নামটা তিনি এই মুহূর্তেই ঠিক করেছেন। নামটা তার খুবই মনে ধরেছে। তার ইচ্ছা করছে তৌহিদাকে ডেকে আচার নামটা নিয়ে আলোচনা করতে। রাত এমন কিছু বেশি হয় নি। ইচ্ছা করলেই তৌহিদাকে ডাকা যায়। নিশু নামের মাগিটাকেও ডাকা যায়। সে আবার বিরাট জ্ঞানী। আচার নামটা কি এত বড় জ্ঞানীর পছন্দ হবে? সালেহা স্বামীর গায়ে ধাক্কা দিলেন। হাবিবুর রহমান ঘুম। ঘুম গলায় বললেন, কী?

তোমার ছোট বৌকে ডাক দিয়ে আন। তার সঙ্গে আমার কথা আছে।

আচ্ছা।

আচ্ছা কী? যাও।

হাবিবুর রহমান হু বলে শব্দ করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। সালেহা চেষ্টা করেও স্বামীর ঘুম ভাঙাতে পারলেন না।

নিশু ঘুমুচ্ছিল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন। তার গা ঘেঁষে কুকুরের মতো চেহারার কুৎসিত একটা জন্তু বসে আছে। জন্তুটার হাত মানুষের হাতের মতো। তবে হাতে অনেকগুলি করে সরু সরু আঙুল। জন্তুটা ত হাতভর্তি আঙুল দিয়ে নিশুর গা হাতাপিতা করছে। ভয়ে আতঙ্কে নিশু ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখে ঘরে বাতি জ্বলছে। তার পাশে তৌহিদা বসে আছে। তৌহিদা তার গায়ে কী যেন মাখাচ্ছে। এই মহিলার মাথার ঠিক নেই, সে কী করছে কে জানে। নিশু হতভম্ব গলায় বলল, কী হচ্ছে?

তৌহিদা বলল, আপনার শরীরে তেল মাখাই।

কেন?

তৌহিদা সহজ গলায় বলল, বুবুর জন্যে তেল গরম করেছিলাম। বুবু তেল মাখবে না। তেল খামাখা নষ্ট হবে।

নিশু বলল, তেল নষ্ট হলে হবে। আমি গায়ে তেল মাখব না।

একটু দিয়ে দেই, আরাম লাগবে।

আমার আরামের দরকার নেই।

চুলে বিলি দিয়ে দেই?

চুলে বিলি দিতে হবে না। কয়টা বাজে?

একটা পাঁচ।

এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন? তুমি ঘুমাও।

তৌহিদা বলল, আমার ঘুমাতে ভালো লাগে না। জেগে থাকতে ভালো লাগে। জেগে থাকার মজা আছে। ঘুমের মধ্যে কোনো মজা নেই।

কী মজা?

জেগে থাকলে ভালো ভালো চিন্তা করা যায়। ঘুমের সময় নিজের মতো চিন্তা করা যায় না।

ভালো ভালো চিন্তাটা কী?

তৌহিদা লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, আমি চিন্তা করি–বিয়ে করেছি, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারি না। এখন আমার দিন যায় কষ্টে। এই দিন থাকবে না। আমরা আলাদা বাসা ভাড়া

করব। একটা কাজের মেয়ে রাখব। সে আমার বাবুর দেখাশোনা করবে। এখন আমার অনেক কষ্ট। তবে কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে। ঠিক না আপা?

নিশু হাই তুলতে তুলতে বলল, ঠিক।

তৌহিদা বলল, কেষ্ট জিনিসটা কী আপা?

নিশু বলল, কেষ্ট হলো কৃষ্ণ। কষ্ট করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আনন্দ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ কে তুমি জানো না?

তৌহিদা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। নিশু বলল, রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তোমার ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কথা না?

তৌহিদা বলল, হ্যাঁ, দুটা করে নীল রঙের ট্যাবলেট। ঘুমের ওষুধ।

আজ খেয়েছ?

না।

গতকাল খেয়েছিলে?

না।

গত পরশু?

এখন থেকে ওষুধ থেমে ঘুমাবে। আমি নিজের হাতে তোমাকে ওষুধ খাওয়াব। যাও ওষুধ নিয়ে আস।

আচ্ছা।

তিনটা ট্যাবলেট আনবে। আমি একটা খাব। আমার ভালো ঘুম দরকার।

রাতে একবার ঘুম ভাঙলে নিশুর আর ঘুম আসে না। নীল রঙের ঘুমের ওষুধ খাবার জন্যেই হয়তো সে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছে। আরামের কোনো ঘুম না। কষ্টের ঘুম। ঘুমের মধ্যে সে দৌড়াচ্ছে। পুরনো ঢাকার চিপা গলির ভেতর। ছুটছে। গলি জনশূন্য। কয়েকটা কুকুর শুধু ঘোরাফেরা করছে। কুকুরগুলি সাইজে অনেক বড়। রঙ মিশমিশে কালো। অনেক রাত। নিশু ছুটছে, নিশুর পেছনে পেছনে কালো গাউন পরা উকিল দৌড়াচ্ছে। উকিলটা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে আঙুল উঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে মিস নিশু, আমার কথা শুনুন। কাস্টমারদের কাছ থেকে আপনি কত করে নেন, এটা আমার জানা দরকার। কারণ আপনার স্বামী বিষয়টা জানতে চাচ্ছে।

উকিলটা যখন থমকে দাঁড়ায় তখন নিশুও থমকে দাঁড়ায়। তাকে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয়, কারণ দৌড়াতে দৌড়াতে সে ক্লান্ত। তার পা ভেঙে আসে। সে বিশ্রাম নেবার জন্যে দাঁড়ায়। উকিলটার কথা বাধ্য হয়ে শুনতে হয়। তার কথার জবাব দেয়া অর্থহীন। এটা জেনেও সে জবাব দেয়।

হ্যালো মিস নিশু–হ্যালো!

কী চান?

আপনার স্বামীর মোবাইল নাম্বারটা বলুন তো?

আমি বিয়ে করি নি। আমার স্বামী নেই।

তাহলে মতিন সাহেবের নাম্বারটা দিন।

ওর নাম্বার আমার জানা নেই।

আপনি সত্যি বলার শপথ নিয়েছেন। এখন মিথ্যা বলতে পারেন না। মিথ্যা বললে আপনাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

কী শাস্তি?

ঐ তিনজনকে লেলিয়ে দেয়া হবে।

কোন তিনজন?

যারা আপনাকে রেপ করেছে। রেপ—ধর্ষণ। রেডি হয়ে যান। যাচ্ছে, ওরা যাচ্ছে। যাচ্ছে। গেট সেট রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি ...

নিশু আবার দৌড়াতে শুরু করেছে। নিশুর পেছনে ঐ তিনজনও দৌড়াচ্ছে। নিশু চেষ্টা করছে জেগে উঠার। তার ঘুম ভাঙছে না। কী কষ্ট! কী কষ্ট! নিশু ঘুমের ঘোরে ডাকলো, মতিন, বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। মতিন! মতিন!

রাত দুটা বাজে। মতিন জেগে আছে। তার টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। সে চিঠি লিখতে বসেছে।

কঠিন গাধা!

হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

অনেক দিন পর তোকে লিখতে বসেছি। শুরুতে কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করে নিলাম। হ্যালো হ্যালো করার সুবিধা হচ্ছে–হ্যালো মানে কথা বলা। তোর কি মনে হচ্ছে আমি তোর সঙ্গে কথা বলছি?

ভুলে যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষ ভয় পায় কেন? মানুষ আনন্দ পায় কেন?

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাচ্ছি না। অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এই বিষয়ে এখন গবেষণা চলছে।

তারপর বল, তোর হাতির বাচ্চা কেমন আছে? হাতির আরেক নাম যে জলপশু এটা জানিস? হাতি একমাত্র প্রাণী যে জানে মাটির নিচে কোথায় মিষ্টি-পানি আছে।

আফ্রিকানদের বিশ্বাস হাতি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামাতে পারে। হাতি বিষয়ে আরেকটা কথা একটা হাতি আট মাইল দূরের আরেকটা হাতির সঙ্গে Ultrasound-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে।

হাতি সম্পর্কে এত কথা বলছি কেন? কারণ নদ্দিউ নতিম সাহেব ঠিক করেছেন হারিয়ে যাওয়া একটি হাতির বাচ্চা নিয়ে গল্প লিখবেন। গল্পটা বাচ্চাদের জন্যে। গল্পের নাম ইরকু। ইরকু হলো হাতির বাচ্চাটার নাম। গল্প লিখতে হবে এইজন্যেই পড়াশোনা।

পেঙ্গুইনের বইগুলি পেয়েছি। বই হাতে নিয়ে লজ্জা লজ্জা লাগল। প্রথম সন্তান হবার পর বাবা যেমন লজ্জা পান সেরকম লজ্জা। মায়েরা মোটেই লজ্জা পায় না। তারা অহঙ্কার করে বাচ্চা সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায়। বাবা বেচারা লজ্জায় মুখ নিচু করে থাকে। পিতৃসুলভ লজ্জায় এখন পর্যন্ত বইটা কাউকে দেখাই নি। নিশুকেও না।

নিশুর অবশ্যি বই দেখার মতো মানসিক অবস্থা নেই। সে তার মামলা নিয়েই বিপর্যস্ত। মামলার অবস্থা অবশ্যি ভালো। অপরাধীদের ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত তাদের স্কুলে কাটাতে হবে। মন্দ কী? ঝুলন্ত মৃত্যু।

মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না। একধরনের ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করছে। ক্লান্তি বিষয়ে নদ্দিউ নতিমের একটা কবিতা–

ক্লান্তি ও ক্লান্ত
শান্তি ও শান্ত।
ক্লান্ত ও ক্লান্তি

শান্ত ও শান্তি।
এইখানেই Stop
Drag and Mop
Drag and Mop।

তোর কাছে আবোলতাবোল মনে হচ্ছে? কবিতাটা আবোলতাবোেল না। ভেতরে অর্থ আছে। তুই কি ভেতরের অর্থ খুঁজে বের করতে পারবি? পারলে তোর জন্যে পুরস্কার, না পারলে তিরস্কার।

কি পারবি?

জানি পারবি না। কারণ এতক্ষণ তোর সঙ্গে ফাজলামি করেছি। ছড়াটা অর্থহীন। ননসেন্স রাইমেও কিছু সেন্স থাকে। এখানে কিছুই নেই। আবোলতাবোল লিখেছি। চিঠিটাও আবোলতাবোল। চিঠিতে লিখেছি নিশুর মামলার অবস্থা ভালো। তা কিন্তু না। মামলার অবস্থা খারাপ। খুবই খারাপ। আসামিপক্ষের উকিল যেভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় নিশুই দোষী। গৃহস্থ পল্লীতে বাস করে মাদক এবং দেহব্যবসা চালাচ্ছিল। সুশীল নাগরিকদের স্বার্থে তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া প্রয়োজন। সে একা না, আমিও মক্ষীরানীর দালাল হিসেবে জেলে চলে যাব। আমার জন্যে ভালোই হবে। জেল জীবনের অভিজ্ঞতাটা দরকার। আচ্ছা, তুই কি মানুষের বন্দিদশা নিয়ে কখনো ভেবেছিস?

মানব শিশু শুরুতে থাকে মায়ের পেটে। এখানেই সে অতি ক্ষুদ্র কারাগারে বন্দি। সেই কারাগার কঠিন কারাগার আলো নেই বাতাস নেই। এই ভয়ঙ্কর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সে আসে পৃথিবী নামক কারাগারে। এই কারাগারটা আগের চেয়ে ভালো। আলো

বাতাস আছে। অনেক বড়। পৃথিবী নামক কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সে যাবে অন্য এক কারাগারে। (লজিক তাই বলে) সেই কারাগারটা হবে পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড়। অনেক সুন্দর। সেই কারাগারের পরেও কি কোনো কারাগার আছে?

ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা করছে। নির্জন কোনো দ্বীপে। যেখানে আমি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। অন্যের সমস্যা নিয়ে এখন আর ভাবতে ইচ্ছা করছে না। আমি এমন একটা জগতে চলে যেতে চাচ্ছি যেখানে... আচ্ছা থাক এসব। নিজের সমস্যা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেবার মানে হয় না।

চিঠি শেষ করার আগে আমার একটা দুঃস্বপ্নের কথা তোকে বলি। এই দুঃস্বপ্নটা বেশ কয়েকবার দেখেছি। আরো মনে হয় দেখব।

দুঃস্বপ্নটা এরকম–ছায়াঘেরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমি যাচ্ছি। যতই যাচ্ছি ততই ছায়ার অংশ বাড়ছে। গাছপালা ঘন হচ্ছে। এক পর্যায়ে শোনা গেল প্রবল কোলাহল! যেন ভয়ঙ্কর কিছু হচ্ছে। ভয়ে আমি উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছি। যে দিকে যাচ্ছি সেদিকেই জঙ্গল ঘন হচ্ছে। একসময় দেখা যায় আমি আগের মতো দৌড়াতে পারছি না। পা বেঁধে বেঁধে যাচ্ছে। পায়ের নিচের মাটি জলজ শ্যাওলায় ঢাকা। আমি দৌড়াচ্ছি চোরাবালির উপর দিয়ে, এই সত্যটা একসময় টের পেয়ে আমি ভয়ে ও আতঙ্কে থমকে দাঁড়াই। আর তখনই আমার পা ডেবে যেতে থাকে। আমি চিৎকার করে ডাকি কেউ কি আছে আশেপাশে? আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও।

বেশিরভাগ সময় স্বপ্নের এই পর্যায়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়। যখন ভাঙে না তখন স্বপ্নটা নতুন একদিকে মোড় নেয়। আমি অপরূপ রূপবতী এক তরুণীকে আসতে দেখি। সে

এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। খুব কাছে না। আমি হাত বাড়ালে তাকে ছুঁতে পারি না, এমন দূরত্বে। তরুণী আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আপনার কী হয়েছে?

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচান।

তরুণী হাসতে হাসতে বলে, চোরাবালির ইংরেজি কী?

আমি বলি, কুইক স্যান্ড।

জাপানি ভাষায় চোরাবালিকে কী বলে বলতে পারলে আপনাকে বাঁচাব।

জাপানি ভাষায় কী বলে জানি না।

তাহলে তো আপনার খুবই ব্যাড লাক। রুশ ভাষায় কী বলে বললেও হবে। জানেন?

আমি হতাশ গলায় বলি, না।

তরুণী হাসতে থাকে, আমি ডুবে যেতে থাকি। এই হলো স্বপ্ন।

তুই কি জানিস জাপানি কিংবা রুশ ভাষায় চোরাবালিকে কী বলে? জানলে আমাকে অতি দ্রুত জানাবি। যাতে পরের বার যখন এই স্বপ্ন দেখব তখন যেন তরুণীকে চোরাবালির জাপানি কিংবা রুশ পরিভাষা বলে উদ্ধার পেতে পারি।

ভালো কথা, এই তরুণী কিন্তু আমার পরিচিত। উনার নাম মুনা। উনি কমলের মা। আমি আমার জীবনে এই মহিলার মতো রূপবতী কোনো মহিলা দেখি নি। কিছুক্ষণ মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকলে একধরনের ঘোর তৈরি হয়। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার মতো বলতে ইচ্ছা করে–

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা
পদনখে পড়ে আছে তার কতগুলা।

তুই একবার বলেছিলি আমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে পারব না। আমার ভেতর সেই জিনিস নেই। এখন দেখলি তো ঘটনা কী?

আজ আর না। তুই ভালো থাকিস। তোর হস্তীশাবক ভালো থাকুক। পৃথিবীর সর্বপ্রাণী ভালো থাকুক।

নদ্দিউ নতিম

২২. মুনা অবাক

মুনা অবাক হয়ে বলল, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

মতিন বলল, জি।

মুনা বলল, Why me?

মতিন জবাব দিল না। মুনার হাতে ধবধবে সাদা রঙের সিগারেটের প্যাকেট। সিগারেটের নাম নিউ অর্লিন্স। মনে হচ্ছে মেয়েদের সিগারেট। মেয়েদের জন্যে প্রস্তুত সমস্ত পণ্যেই ডিজাইনের ব্যাপার থাকে। সিগারেটের প্যাকেটে বিশেষ ডিজাইন আছে। মুনার হাতের লাইটারটির রঙ টকটকে লাল। লাইটারের ডিজাইনও সুন্দর, ছোট্ট একটা কিউব। মুনা সিগারেট ধরাল। লাইটারে চাপ দেবার পর সুন্দর বাজনা বাজা শুরু হয়েছে। সামান্য সিগারেট ধরানোর মধ্যেও বিপুল আয়োজন।

মুনা বলল, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন এই প্রশ্নের জবাব দেন নি।

মতিন বলল, চোরাবালির জাপানি কিংবা রুশ প্রতিশব্দ জানতে এসেছি।

উত্তর শুনে মুনা চমকাল না। সে মনে হয় উদ্ভট কোনো উত্তর শুনবে তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, জাপানি প্রতিশব্দ আমি জানি না, তবে রুশটা জানি। রুশ ভাষায় চোরাবালি হচ্ছে–জিবুচি পেসুক।

মতিন ডায়েরি খুলে প্রতিশব্দ লিখতে লিখতে বলল, ধন্যবাদ।

মুনা বলল, চা খাবেন?

মতিন বলল, জি-না।

মুনা বলল, জাপানি ভাষার প্রতিশব্দ জানতে চাইলে জেনে দিতে পারি। দশ মিনিটের ব্যাপার।

মতিন বলল, একটা হলেই চলবে।

আপনি কি শুধু এটা জানার জন্যেই এসেছেন?

জি।

যা জানার জন্যে এসেছিলেন তা জানা হয়েছে, এখন চলে যাবেন?

জি। আপনি অনুমতি দিলে উঠব।

যখন এসেছিলেন তখন আমার অনুমতি নিয়ে আসেন নি। হুট করে এসেছেন। যাবার সময় অনুমতি চাচ্ছেন কেন?

ভদ্রতা।

আমার সিগারেট শেষ হোক, তারপর যাবেন।

জি আচ্ছা।

আপনি শুধুমাত্র চোরাবালির রুশ এবং জাপানি প্রতিশব্দ জানতে আমার কাছে এসেছেন, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না

মতিন বলল, আমি সত্যি কথাই বলছি। আরেকটা প্রশ্ন ছিল, মানুষ কেন ভয় পায়? কেন আনন্দ পায়? আপাতত চোরাবালিই যথেষ্ট।

মুনা বলল, ধরে নিলাম আপনার চোরাবালির প্রতিশব্দ জানা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু আমার কথা মনে হলো কেন? কেন আপনার ধারণা হলো আমি এই দুই ভাষা জানি? আমার চেহারায় কি রুশ ভাব আছে, না জাপানি ভাব আছে?

মতিন চুপ করে রইল।

মুনা বলল, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি সময় নষ্ট করব না। কী জন্যে আপনি আমার কাছে এসেছেন জানতে চাচ্ছি না। আমার সিগারেটও শেষ হয়েছে। আপনি এখন যেতে পারেন।

মতিন উঠে দাঁড়াল। তার কাঁধে ঝুলানো কাপড়ের ব্যাগ থেকে–Autobiography of a Fictitious Poet বইটা বের করে মুনার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনার জন্যে আমি আমার লেখা একটা বইয়ের অনুবাদ এনেছি। বইটা পেঙ্গুইন বের করেছে।

মুনা বিস্মিত গলায় বলল, পেঙ্গুইন বের করেছে?

মতিন বলল, জি।

আশ্চর্য ব্যাপার! ভোরবেলায় বেশ বড় চমক খেলাম। আপনাকে আমার কখনোই কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখক মনে হয় নি। লেখালেখি ফাজলামি মনে করে এমন একজন মনে হয়েছে।

আপনার ধারণা ঠিক আছে, আমি একজন ফাজিল লেখক।

আমার জন্যে বই এনেছেন, আমার নাম লিখে দেবেন না! লেখকের অটোগ্রাফসহ বই পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।

ম্যাডাম, আপনার নাম লেখা আছে।

কই লক্ষ করি নি তো?

মুনা আগ্রহের সঙ্গে বই-এর পাতা উল্টে এক জায়গায় থমকে গেল। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—

মুনাকে
যার সঙ্গে প্রায় রাতেই
গহীন এক জঙ্গলে দেখা হয়।
নদ্দিউ নতিম

মুনা গম্ভীর গলায় বলল, এই লেখাটার মানে কী? আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করবেন না। স্পষ্টভাবে বলবেন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বসুন। আমি চা। দিতে বলছি। চা খান। সিগারেট খান। তারপর পুরো বিষয়টা ব্যাখ্যা করুন। প্রথমে বলুন, রূপবতী মেয়ে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ার বদঅভ্যাস কি আপনার আছে?

মতিন বলল, আমার নেই, তবে নদ্দিউ নতিম সাহেবের আছে। উনি বিরাট প্রেমিক পুরুষ। একজীবনে তিনি অনেক মেয়ের প্রেমে পড়েছেন।

মুনা বলল, খুকখুক কাশি আমার সামনে কাশবেন না। আমার সঙ্গে ঝেড়ে কাশবেন।

মতিন বলল, জি আচ্ছা। চা দিতে বলুন। চা খেয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ঝেড়ে কাশব।

মতিন পরপর দুকাপ চা খেল। এক পিস কেক খেল। ঘরে তৈরি পনিরের সমুচা খেয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে তার স্বপ্নের কথাটা বেশ গুছিয়ে বলল। মুনা একবারও তাকে থামাল না। কথার মাঝখানে কোনো ব্যাখ্যা চাইল না। মতিন কথা শেষ করে বলল, আপনার সঙ্গে গহীন জঙ্গলে আমার দেখা হয় কথাটা এইজন্যেই লিখেছি। আপনি কি আমার গল্পটা বিশ্বাস করেছেন?

মুনা বলল, বিশ্বাস করলাম। সর্বশেষ স্বপ্ন কবে দেখেছেন?

গতরাতে দেখেছি।

স্বপ্নে আমার পোশাক কী ছিল?

মতিন জবাব দিল না।

আপনার কি মনে আছে, কী পোশাক ছিল? না-কি মনে নেই?

আমার মনে আছে।

মুনা বলল, আপনার মনে আছে কিন্তু আপনি বলতে চাচ্ছেন না, তাই তো?

জি।

মুনা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে বিদায়। আমি আপনার বই পড়ে দেখব। বইটা যদি ভালো লাগে আপনাকে জানাব। আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেলে বুঝবেন বই আমার পছন্দ হয় নি।

জি আচ্ছা।

আপনার বান্ধবী নিশুকে নিয়ে মামলা চলছে। পত্রিকায় খুব লেখালেখি হচ্ছে। আমি কিছু কিছু পড়েছি। মামলার অবস্থা কী?

অবস্থা ভালো না।

আসামিরা সব ছাড়া পেয়ে যাবে?

জি।

রেপ কেইসের সমাপ্তি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরকম হয়। আপনারা ভালো কোনো লইয়ার দিচ্ছেন না কেন? কমলের বাবাকে নিন।

উনি এ ধরনের মামলা করবেন না।

বলে দেখেছেন?

জি-না।

আমি কি বলে দেব?

মতিন বলল, আমার লেখা বইটা যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে আপনি বলে দেবেন, আর যদি পছন্দ না হয় তাহলে কিছু বলতে হবে না।

মুনা শান্ত গলায় বলল, It is a deal.

মতিন এখন যাচ্ছে আজহার উল্লাহর কাছে। তাঁকে একটা বই দেবে। আজ মতিনের বই বিতরণ দিবস। সেখান থেকে যাবে সালেহ ইমরানের কাছে। তাঁকে দেবে একটা। তাঁর পুত্র কমলকে দেবে একটা। তিনটা বই চলে যাচ্ছে। এক পরিবারের কাছে। মুনা পাচ্ছে একটা। পাঁচ বই পাঁচ জায়গায়। তার কাছে শূন্য। এই ভালো। এত কাল নদী কূলে যাহা লয়ে ছিনু ভুলে সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে–টাইপ ব্যবস্থা। বিথরে শব্দের মানে কী?

ডিকশনারিতে কি এই শব্দ আছে? বিথারা বলে একটা শব্দ আছে। বিথর বলে কিছু কি আছে? নিশুকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

আকাশ মেঘলা। আকাশ মেঘলা হলে হাঁটতে ভালো লাগে। মাথায় রোদ। কিংবা বৃষ্টি নিয়ে হাঁটা যায় না। তখন রিকশার খোঁজ পড়ে। মতিনের হাঁটতে ভালো লাগছে। রাস্তায় যানজট নেই। থাকলে ভালো হতো। যখন প্রচণ্ড যানজটে আন্ধা গিট্টু লেগে যায় তখন হাটতে বড়ই আরাম। মনে আলাদা। আনন্দ–তোমরা আটকা পড়ে গেছ, আমি মুক্ত বিহঙ্গ।

আজহার উল্লাহকে পাওয়া গেল না। অফিস থেকে জানা গেল তিনি গুরুতর অসুস্থ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তিনশ এগারো নম্বর কেবিনে আছেন। অবস্থা ভালো না। লোকজন চিনতে পারেন না।

ভরদুপুরে মতিন ঢাকা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হলো। আজহার উল্লাহ চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তার নাকে অক্সিজেনের নল। রোগীরা সাধারণত কাত হয়ে শুয়ে থাকে। তিনি সরলরেখার মতো সোজা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর বিছানার চাদর সাদা। গায়ে যে চাদর দেয়া আছে তার রঙ গাঢ় সবুজ। মতিনের পায়ের শব্দে আজহার উল্লাহ চোখ মেললেন। ঘাড় ফিরিয়ে মতিনকে দেখলেন এবং অস্পষ্ট গলায় বললেন, কেমন আছ?

মতিন বলল, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

আজহার উল্লাহ বললেন, কেন চিনব না! তুমি বিখ্যাত উজবেক মরমী কবি। নদ্দিউ নতিম। আমি পনেরো দিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছি। প্রতিদিন ভাবি, সবাই দেখতে এলো– উজবেক কবি কেন আসল না?

আপনি একা কেন?

কিছুক্ষণ আগেও আমার মেয়েটা আমার সঙ্গে ছিল। আজ তার ইউনিভার্সিটিতে খুবই জরুরি কাজ, প্রজেক্ট সাবমিশন। সে চলে আসবে।

মতিন আজহার উল্লাহর বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, শুনেছিলাম আপনার শরীর খুবই খারাপ। কাউকে চিনতে পারেন না।

আজ সকাল থেকে শরীরটা ভালো। নেভার আগে প্রদীপ জ্বলে উঠে। আমারটা জ্বলেছে। আমার সময় শেষ। উজবেক কবির মৃত্যু-বিষয়ক কোনো রচনা আছে?

আছে।

শোনাও তো!

শিশু পুত্র আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
শ্যামল, সুন্দর স্নিগ্ধ, গীত গন্ধ-ভরা;
বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়
আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিয়ো।

আজহার উল্লাহ বললেন, মারহাবা। খুবই সুন্দর। শিশু তার চারপাশের জগতকে বলছে– আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিও। তাই তো থাকে। যখন কেউ চলে যায় জগৎ সংসারও চলে যায়। এটা নদ্দিউ নতিম সাহেবের লেখা?

মতিন বলল, জি-না স্যার। এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা। নদ্দিউ নতিম সাহেবের সমস্যা হচ্ছে অনেকের অনেক বিখ্যাত কবিতাকে উনি তার নিজের মনে করেন।

মতিন, তুমি দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে। জি আচ্ছা।

হাসপাতালের খাবার না। আমার মেয়ে আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসবে। দুজনের জন্যে খাবার আনবে, আমরা তিনজন ভাগ করে খাবো।

জি আচ্ছা।

মতিন!

জি স্যার।

আমার একটা ছেলে ছিল, আট বছর বয়সে ছেলেটা মারা যায়। সে বড় হলে তোমার মতো রূপবান হতো। তোমার চেহারা যে রাজপুত্রের মতো এটা নিশ্চয়ই তুমি জানো। আয়নায় মুখ দেখো না?

দেখি।

কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে তোমার বন্ধুরা তোমাকে কী ডাকত? প্রিন্স ডাকত না? আমাদের সময় সুন্দর ছেলের নাম হয়ে যেত প্রিন্স।

আমাকে সবাই ডাকত মাকাল বাবু।

মাকাল ডাকত? হা হা হা। এই নামটাও তো খারাপ না। মাকাল বাবু, এক কাজ কর। আমাকে ধরাধরি করে আধশোয়া করে দাও। হাসপাতালের কাউকে ডাক, নাক থেকে যেন যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে।

শরীর ভালো লাগছে?

খুব ভালো লাগছে না, কিন্তু আমার স্বাভাবিকভাবে বসতে ইচ্ছা করছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমি চাই আমার মেয়ে এই দৃশ্য দেখে চমকে উঠুক। একটা হাসির গল্প বলো তো।

হাসির গল্প?

হ্যাঁ জোকস। এখন তো খবরের কাগজে জোকস ছাপা হয়। কোনোটা পড়ে হাসি আসে না। তুমি একটা বলো যাতে হাসি আসে।

মতিন বলল, আপনার মন আজ ভালো, যে গল্পই শুনবেন আপনার হাসি আসবে।

একটা বলো দেখি হাসি আসে কি-না।

দাঁড়ান মনে করি।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। রাজনৈতিক জোকস। প্রেসিডেন্ট বুশকে নিয়ে রসিকতা। প্রেসিডেন্ট বুশ তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইসকে বললেন, ইরাকের মানুষ মরল না বাঁচল এটা নিয়ে কারোরই কোনো মাথাব্যথা নেই। আগামী সাংবাদিক সম্মেলনে আমি এটা প্রমাণ করে দেব।

সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হলো। জর্জ বুশ বললেন, আমি ঠিক করেছি ইরাকে সবকিছু নতুন করে হবে। প্রথমে আমি ইরাকের সব মানুষকে মেরে ফেলব। তারপর একটা রাজহাঁস মারব।

সব সাংবাদিক একসঙ্গে প্রশ্ন করল, রাজহাঁস কেন?

জর্জ বুশ কন্ডোলিসা রাইসের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে তো ইরাকিদের নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। সবার মাথাব্যথা রাজহাঁস নিয়ে।

আজহার উল্লাহ সাহেবের মেয়ে মৃন্ময়ী দুপুর দুটায় টিফিন কেরিয়ার করে খাবার নিয়ে এসে কেবিনের দরজার পাশে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার গুরুতর অসুস্থ বাবা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো নেই। তার বাবার সামনে সিনেমার নায়কের মতো চেহারার এক যুবক। বসে আছে। দুজনেই গলা ছেড়ে হাসছে। এ-কী কাণ্ড!

আজহার উল্লাহ মেয়েকে দেখে হাসি থামিয়ে বললেন, মৃন্ময়ী মা, এ হলো। বিখ্যাত উজবেক কবি নদ্দিউ নতিম। তার আরেকটা নাম আছে, মাকাল বাবু। হা হা হা।

মতিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে মায়া মায়া চেহারার শ্যামলা একটা মেয়ে। নাক চাপা। বড় বড় চোখ। চোখভর্তি বিস্ময়।

মৃন্ময়ী মতিনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, আপনার মন্ত্রটা কী বলুন তো? কোন মন্ত্র দিয়ে আপনি আমার বাবাকে ভালো করে ফেলেছেন? আপনি এত দেরিতে এসেছেন কেন? আগে আসতে পারলেন না?

আজহার উল্লাহ বললেন, উজবেকিস্তান থাকে। আসবে কী করে? হা হা হা।

মৃন্ময়ী বলল, বাবা, হাসি বন্ধ কর তো। তোমার হাসির ধরন ভালো লাগছে না।

তুই সুন্দর করে হেসে আমাদের দেখা। হা হা হা। কী বলো কবি সাহেব, ও হেসে দেখাক কী করে হাসতে হয়।

মতিন দুপুরে হাসপাতালে খাওয়া-দাওয়া করল। আজহার উল্লাহ সামান্য কিছু মুখে দিয়েই শুয়ে পড়লেন। তার জ্বর আসছে। জ্বর নিয়েই কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। মতিন মৃন্ময়ীর হাতে তার বইটা দিয়ে বলল, ঘুম ভাঙলে স্যারের হাতে দেবেন।

মৃন্ময়ী চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার বই পেঙ্গুইন বের করেছে!

মতিন বলল, আমার বই না। নদ্দিউ নতিম সাহেবের বই। আমি কেউ না।

মৃন্ময়ী বলল, আবার কবে আসবেন?

জানি না।

বাবা যে আপনাকে কী পছন্দ করে! বাবা ঠিক করে রেখেছেন, সুস্থ হলেই তিনি আপনাকে নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাবেন। আপনি কি যাবেন?

অবশ্যই যাব।

আপনি কাউকে না বলতে পারেন না। তাই না?

ঠিক বলেছেন। কাউকে না বলতে পারি না।

মৃন্ময়ী বলল, যারা কাউকে না বলতে পারে না তারা আবার কাউকে হ্যাঁও বলতে পারে না।

মতিন ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই কথাও সত্যি। মৃন্ময়ী, যাই।

মৃন্ময়ী সামান্য চমকাল। কেন চমকাল সে নিজেই জানে না।

আজহার উল্লাহ সেদিনই রাত এগারোটায় মারা গেলেন। শ্বাসকষ্ট শুরু হবার আগ পর্যন্ত তার হাতে ছিল মতিনের বই। তিনি বই পড়তে পড়তে বেশ কয়েকবার বললেন–মারহাবা। মৃন্ময়ী বলল, বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে। তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক।

আজহার উল্লাহ বললেন, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে না মতিনের সঙ্গে আবার দেখা হবে। যদি দেখা না হয় তুই আমার হয়ে মতিনের মাথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিবি। পারবি না?

মৃন্ময়ী বলল, পারব। অবশ্যই পারব।

আমার দেখা দশটা ভালো ছেলের মধ্যে সে একটা।

একবার তুমি বলেছিলে পাঁচটা ভালো ছেলের মধ্যে সে একটা।

তাহলে সেটাই ঠিক।

বাবা, আর কথা না। চুপ করে শুয়ে থাক।

আজহার উল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, দেখ তো কটা বাজে?

দশটা চল্লিশ।

মা, তুই আমার হাত ধরে বসে থাক। একটুও নড়বি না।

মৃন্ময়ী বাবার হাত ধরে বসে রইল।

আজহার উল্লাহ ভাগ্যবান একজন মানুষ। অতি প্রিয় একটি মুখের দিকে তাকিয়ে অজানার উদ্দেশে যাত্রার সৌভাগ্য বেশি মানুষের হয় না।

২৩. চিঠিটা পড়ে ধাক্কার মতো

মতিন,

তোর সবশেষ চিঠিটা পড়ে ধাক্কার মতো খেয়েছি। তোর কী হচ্ছে বল তো? আজহার উল্লাহ নামের একজন বুড়োমানুষ মারা গেছেন তাতে কী হয়েছে? বুড়োরা মরবে। স্বাভাবিকভাবেই মরবে। এই বুড়োর সঙ্গে তোর কখন এমন গভীর সম্পর্কে হলো সেটাও তো জানি না।

তোর চরিত্রে স্যাঁতস্যাঁতে ব্যাপার কখনোই ছিল না। তুই হঠাৎ স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেলি কেন? প্রবলেমটা কোথায়?

এত বড় একটা চিঠি লিখলি, সেখানে নিশুর কোনো উল্লেখ নেই। মামলার কী হলো জানাবি না?

তৌ নামের আরেকটা মেয়ে ছিল না? সে মানসিকভাবে অসুস্থ। তাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে এইটুকু জানি। আর কিছু কিন্তু জানি না।

আমি পড়ে থাকি জঙ্গলে, কিন্তু আমার চেতনার একটি অংশ নগরবাসী। নগরবাসী মানুষদের কথা জঙ্গলে বসে পড়তে ভালো লাগে। এখন অবশ্যি বিজ্ঞানের বইপত্র পড়া শুরু করেছি। এই মুহর্তে পড়ছি–The Holographic Universe. লেখকের নাম টেলবট। তিনি ভালো থিওরি ফেঁদেছেন। পড়লে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। বিজ্ঞান যে ক্রমেই গাঁজাখুরির দিকে এগুচ্ছে, এটা জানিস?

এইসব বৈজ্ঞানিক গাঁজাখুরি নিয়ে নদ্দিউ নতিম সাহেবকে একটা সায়েন্সফিকশান লিখতে বল না! গল্পের প্রাথমিক আইডিয়া তোকে দিচ্ছি। মনে কর দশ এগারো বছরের ছেলে। একটা ট্রেনে করে তার নানার বাড়িতে যাচ্ছে। মডেল হিসেবে তুই তোর পরিচিত ছেলেটাকেই নে। কমল না নাম?

কমল একা যাচ্ছে তার নানার বাড়ি। রাতের ট্রেন। কোন স্টেশনে সে নামবে তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রেন থামল, সে নেমে পড়ল। নেমেই হতভম্ব! কোথায় সে নেমেছে? এটা তো পৃথিবীর কোনো জায়গা না। সম্পূর্ণ অন্য এক ভুবন।

ব্যাপারটা হয়েছে কী, সে চলে এসেছে প্যারালাল ইউনিভার্সে।

নদ্দিন নতিম সাহেবকে বল তিনি যেন তার কল্পনার সাত দরজা খুলে দেন। যা লিখতে ইচ্ছা করে লিখতে থাকুন। আমরা তার কল্পনার দৌড় দেখি।

মতিন, তোকে লিখতে বলছি কারণ আমি চাই তুই কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাক।

ভালো কথা, তোর নিশ্চয়ই টাকা পয়সা দরকার? মামলা চলছে। মামলার খরচ আছে। আমি টাকা পাঠাতে পারি। তোর বইটা থেকেও তুই টাকা পাবি। তবে সময়। লাগবে।

প্রতি রাতে যে দুঃস্বপ্ন দেখতি তার অবস্থা কী? দুঃস্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়েছে? না-কি স্বপ্নগুলি আরো জটিল

দুঃস্বপ্ন থেকে বাঁচার একটি আফ্রিকান ব্যবস্থা আছে। জুলু সম্প্রদায় এই কাজটা করে। পরীক্ষা করে দেখতে পারিস। ঘুমুবার আগে আগে মাথা থেকে একগোছা চুল কেটে বলের মতো গুটলি পাকাবি। সেই গুটলি মুখে নিয়ে ঘুমাবি। সামান্য হা করে ঘুমাতে হবে। দুঃস্বপ্ন মুখের ভেতর দিয়ে ঢোকার সময় চুলের জালে আটকা পড়বে। পরদিন সেই চুলের বল আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। চুলের জালে আটকা পড়া দুঃস্বপ্ন জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। ইহজীবনে তুই আর দুঃস্বপ্ন দেখবি না।

দেখবি না-কি ট্রাই করে? দুই লাইন কবিতা শোন–

If you can dream-and not make dreams your master,
If you can think, and not make thoughts your aim.

বল দেখি কার লেখা? বলতে না পারলে বইপত্র ঘাঁটতে থাক। শুধু নিশুকে জিজ্ঞেস করবি না।

কার কবিতা বলতে পারলে Special gift আছে। কী গিফট শুনলে চমকে উঠবি।

ইতি
তোর কঠিন গাধা

২৪. একটা কবিতার লাইন

মতিন বলল, নিশু, আমি একটা কবিতার লাইন বলব, তুমি বলবে কার লেখা। নিশু বিরক্ত গলায় বলল, কবিতা কবিতা খেলা খেলব না।

না খেললে নাই। আমি কবিতার লাইনটা বলি।

প্লিজ স্টপ।

If you can dream and not make dreams your master.

নিশু বলল, রুডইয়ার্ড কিপলিং।

তুমি কি নিশ্চিত?

হুঁ।

তারা দুজন রিকশায়। সকাল আটটা। কোর্ট শুরু হবে দশটায়। তাদের মামলা আজ উঠবে কি-না নিশ্চিত না। উঠার কথা আছে। যতবার মামলা হিয়ারিং-এর জন্যে উঠছে ততবারই উকিলকে তিনহাজার করে টাকা দিতে হচ্ছে। তাঁর ফি, মুহুরির ফি। এছাড়াও খরচ আছে। সারাক্ষণ একে তাকে পান খাওয়ার খরচ দিতে হচ্ছে।

মতিন বলল, নিশু! মামলা মামলা খেলাটা কি তোমার ভালো লাগছে?

নিশু বলল, না।

মতিন বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয়? মামলার বিষয়টা মাথা থেকে দূর করে দাও। পড়াশোনা করতে চলে যাও।

নিশু বলল, রিকশা থামাতে বলো।

মতিন দেখল, নিশু কাঁদছে। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। তার শরীর কাঁপছে। মতিন বলল, কী হয়েছে?

নিশু বলল, রিকশা থামাতে বলো।

মতিন রিকশা থামাল। সেও কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে। নিশু শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে শান্ত গলায় বলল, তুমি নেমে যাও।

মতিন বলল, কেন?

নিশু বলল, মামলা নিয়ে তুমি বিরক্ত হয়ে পড়েছ। ক্লান্ত এবং বিরক্ত। আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। তোমাকে মামলা বিষয়ে আর কিছু করতে হবে না।

মতিন বলল, আমি নিজের কথা ভেবে কিছু বলি নি। তোমার কথা ভেবে বলেছি।

নিশু বলল, নামো রিকশা থেকে। নামো। আমার এই মামলায় কারোর সাহায্য লাগবে না।

কোর্টের এই ঝামেলা তুমি একা কী করে সামলাবে?

দেখি পারি কি-না।

নিশু, I am sorry. I apologize. অ্যা

পলজি অ্যাকসেপটেড। এখন রিকশা থেকে নামো।

নিশুর চোখের দৃষ্টি কঠিন, গলার স্বর কঠিন। মতিন রিকশা থেকে নেমে পড়ল।

নিশুর উকিলের নাম সোবাহান খন্দকার। ভদ্রলোক কুঁজো হয়ে হাঁটেন। সারাক্ষণ পান খান। কথা বলার সময় চোখ পিটপিট করেন। একসময় ভালো ক্রিমিন্যাল লইয়ার ছিলেন, এখন বাজার পড়ে গেছে।

সোবাহান খন্দকার নিশুকে বললেন, বারোটার দিকে মামলা উঠবে। টাকা এনেছেন?

নিশু বলল, টাকা তো কাল রাতে মতিন আপনাকে দিয়ে এসেছে।

সোবাহান খন্দকার বললেন, আমার টাকার কথা বলছি না। মামলা উঠবে। তার খরচ। মতিন সাহেব কোথায়? তাঁকে দরকার ছিল।

উনি আসতে পারেন নি। কী দরকার আমাকে বলুন।

টাকা লাগবে।

টাকা লাগবে সেটা তো একবার বলেছেন। কত টাকা লাগবে?

ভালো অ্যামাউন্টই লাগবে।

কেন ভালো অ্যামাউন্ট লাগবে বলুন?

আপনি মেয়েমানুষ, সবকিছু আপনার সঙ্গে ডিসকাস করা সম্ভব না।

নিশু বলল, মামলাটা আমার। এখন থেকে কোর্টে আমিই আসব। কথাবার্তা যা বলার আমার সঙ্গেই বলতে হবে। টাকা-পয়সার লেনদেন আমিই করব। কত দিতে হবে?

পাঁচ।

পাঁচ কি শ?

আরে না, হাজার।

এত টাকা কেন?

একটা কাগজের কপি বের করতে হবে। আপনার যে মেডিক্যাল অ্যাকজামিনেশন করা হয়েছে তার কপি।

কপি তো দেয়া আছে।

যেটা দেয়া আছে সেখানে কিছু সমস্যা আছে। আমাদের আরেকটা কপি লাগবে।

কী সমস্যা আমাকে বুঝিয়ে বলেন।

সোবাহান খন্দকার বিরক্ত হয়ে বললেন, এত কিছু আপনাকে বুঝাতে গেলে আমি আমার নিজের কাজটা কখন করব? বারোটার সময় মামলা উঠবে। এখন বাজে এগারোটা। আমার নিজের তো একটা প্রিপারেশন আছে। টাকাটা দিয়ে চুপ করে থাকেন। মামলা কোর্ট থেকে নামুক, যা বুঝবার তখন বুঝবেন।

নিশু বলল, এত টাকা তো সঙ্গে আনি নি।

কত এনেছেন?

তিন হাজার।

তিন হাজারই দিন। বাকি টাকাটা আমার পকেট থেকে দিয়ে দিচ্ছি। মতিন সাহেবকে দিয়ে বাকি দুই হাজার আজ সন্ধ্যায় আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিবেন। মামলায় রেজাল্ট পেতে হলে পয়সা খরচ করতে হবে।

মামলা উঠেছে। মামলার একনম্বর আসামিকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। সে তার নিজের বক্তব্য পাখি পড়ার মতো বলল।

প্রফেসর সাহেবের মেয়ে নিশু তার বাবার মৃত্যুর পর উচ্ছৃখল জীবনযাপন শুরু করে। তার ফ্ল্যাটে সন্ধ্যার পর নানান ধরনের পুরুষ মানুষের আনাগোনা। গান-বাজনা। উনি দরজা জানালা সন্ধ্যার পর সবসময় বন্ধ করে রাখেন।

একদিন আমি উনাকে বললাম, নিশু আপা, ভদ্র অঞ্চলে আপনি বাস করেন। আপনার পিতা ছিলেন একজন সম্মানীত শিক্ষক। আপনি এইসব কী শুরু করেছেন?

উনি আমার কথায় খুবই রেগে গেলেন। আমাকে দেখে নিবেন, পুলিশে দিবেন, হেনতেন নানান কথা। তাতে আমার একটু রাগ উঠে গেল। আমি খারাপভাবেই বললাম, ভদ্র পল্লীতে আপনি কীভাবে নারী ব্যবসা করেন আমি দেখে নেব।

এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। উনার বাড়ি থেকে রাত দুইটার সময় এক স্যুট-টাই পরা ভদ্রলোক বের হয়েছে। মুখ দিয়ে মদের গন্ধ। ঠিকমতো পা ফেলতে পারে না এমন অবস্থা। আমি আমার দুই বন্ধুসহ তাকে আটকালাম। মেজাজ খুবই খারাপ ছিল। চড় থাপ্পড় দিয়ে বললাম, তোর ঘরে মা-বোন নাই?

এই ঘটনার পরে নিশু আপা আমার কাছে এসে আপোসের প্রস্তাব দিল। আমাকে দুপুরে তার বাসায় খানা খেতে বলল।

আমি একা না গিয়ে আমার দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিলাম। আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম। উনার জোরাজুরিতে সেক্স ও করলাম। উনি যে আমাদের তিনজনকে ফাঁসাবার জন্যে এই নাটক করেছেন–এইটা জানতাম না। এর বেশি আমার কিছু বলার নাই।

কোর্ট অ্যাডজর্নড হয়ে গেল। সোবাহান খন্দকার কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিশুকে বললেন, জেরা শুরু হলে তার অবস্থা কী হবে সে চিন্তাও করতে পারছে না। মোরব্বা বানিয়ে ফেলব।

নিশু বলল, পারবেন?

সোবাহান খন্দকার উচ্ছাসের হাসি দিয়ে হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, আসামিপক্ষ থেকে একটা আপোসের প্রস্তাব আছে। বিবেচনা করবেন কি-না দেখেন।

নিশু অবাক হয়ে বলল, কিসের আপোস?

মামলায় এ পর্যন্ত আপনার যা খরচ হয়েছে আসামিপক্ষ সব খরচ দিয়ে দিবে, আপনারা মামলা তুলে নিবেন।

আপনার কাছে প্রস্তাব দিয়েছে?

জি। সিদ্ধান্ত আপনাদের। আমার কাজ সব কিছু জানানো।

আপনার কি ধারণা আমাদের আপোসে যাওয়া উচিত? মামলার অবস্থা কী।

অবস্থা ভালো। কনভিকশন হবেই, তারপরেও...

তারপরেও কী?

আরেক দিন কথা বলি। আমি খুবই টায়ার্ড! মতিন সাহেবকে দিয়ে দুই হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

মতিন হাঁটতে হাঁটতে কোর্টভবন পর্যন্ত চলে এলো। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল কোর্ট এলাকায়। কোর্ট কাচারি করা লোকজন মনে হয় ডাবের ভক্ত। চারদিকে কাটা ডাবের ছড়াছড়ি। সে বিশ টাকায় একটা ডাব কিনে খেল। স্ট্যাম্পের এক ভেন্ডরের পাশের টুলে কিছুক্ষণ বসে রইল। তার কাছে কেন জানি শান্তি শান্তি লাগছে। যদিও শান্তি শান্তি লাগার কারণ স্পষ্ট না। শান্তির কারণ কি এই যে, নিশুর ঝামেলা আর তাকে নিতে হচ্ছে না? দুএকদিন পরেই নিশুর রাগ পড়ে যাবে, তখন মতিন আগের মতো মামলা মোকাদ্দমা নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারবে–এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই। নিশু একবার যেটা বলবে। সেটাই।

স্ট্যাম্পের ভেন্ডর মতিনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কী কেইস?

মতিন বলল, রেপ কেইস।

আসামি আপনের কে হয়?

অতি দূরসম্পর্কের আত্মীয়। যখন আমরা মানুষ ছিলাম না, বাঁদর ছিলাম, তখন একই গাছের ডালে লাফালাফি করেছি।

আপনের কথা বুঝলাম না।

মতিন বলল, বাঁদর থেকে মানুষ হবার পর এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাদর হয়ে যখন আমরা কিচকিচ করতাম তখন একজন আরেকজনের কথা বুঝতাম। মানুষ হয়ে ভাষা শেখার পর কেউ কারো কথা বুঝি না।

স্ট্যাম্প ভেন্ডর বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে। মতিন উঠে পড়ল। হঠাৎ মনে হলো, তার যাবার কোনো জায়গা নেই। যাদের যাবার কোনো জায়গা নেই তারা। কোথায় যায়? নৌকায় করে বুড়িগঙ্গায় কিছুক্ষণ হাওয়া খেলে কেমন হয়? বুড়িগঙ্গা তেমন দূরেও না।

ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা হিসেবে মতিন একটা ছইওয়ালা নৌকা ভাড়া করে ফেলল। নৌকার মাঝি বুড়ো। ধবধবে সাদা দাড়ি। বাবড়ি চুল। চেহারায় কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ভাব আছে। অনায়াসে কল্পনা করা যায় বুড়ো রবীন্দ্রনাথ তার সোনার তরী নিয়ে বুড়িগঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছেন।

মতিন বলল, বুড়ো মিয়া, আপনার নাম কী?

কুদ্দুস।

আপনি নৌকা নিয়ে আশেপাশেই সামান্য ঘোরাঘুরি করবেন।

আর কেউ আছে আপনের সাথে? না-কি আপনি একলা?

আমি একলা।

অনেকেই মেয়েছেলে নিয়া নৌকায় উঠে। নৌকার পর্দা ফালায়া রঙ ঢঙ করে, এইজন্যে জিগাইলাম।

আপনের নৌকায় পর্দা আছে?

জি আছে।

দুই দিকেই পর্দা আছে। নৌকা ছাড়ব?

ছাড়েন।

নৌকা বুড়িগঙ্গার মাঝামাঝি আসতেই মাঝি বলল, আর কিছু লাগব?

মতিন অবাক হয়ে বলল, আর কিছু লাগব মানে কী?

বিয়ার আছে। টাইগার বিয়ার। দুইশ টেকা কইরা কৌটা। রাখতে হয়। অনেকেই চায়।

আর কী আছে?

পুরিয়া আছে। পঞ্চাশ টেকারটাও আছে, আবার একশ টেকারও আছে। সুই নাই।

ফেনসিডিল নিশ্চয়ই আছে?

আমার কাছে নাই। চাইলে আইন্যা দিতে পারব।

আপনি কখনো খেয়েছেন?

তওবা! আমি কেন খাব?

নিজে খাবেন না, অন্যকে খাওয়াবেন।

বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কেউ কাউরে কিছু খাওয়ায় না। প্রত্যেকে তার খানা নিজে খায়।

মতিন বলল, বালিশ আছে আপনের কাছে?

বালিশ দিয়া কী করবেন?

শুয়ে ঘুমাব। অনেক দিন পানির উপর ঘুমানো হয় না।

বুড়ো পাটাতনের নিচ থেকে বালিশ চাদর বের করে দিল। বালিশ চাদর দুটোই পরিষ্কার।

বুড়ো বলল, আপনের কিছুই লাগব না?

মতিন বলল, না।

একটা বিয়ার খাইয়া শুইতেন, আরামের ঘুম হইত। বিয়ার হইল ঘুমের ওষুধ। ঠাণ্ডা ছিল। বরফের বালতিতে রাখা।

মতিন বলল, এমনিতেই ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুমের ওষুধ লাগবে। কুদ্দস ভাই শুনেন, ঘুমিয়ে পড়লে জাগাবেন না। আমার পরিকল্পনা একটা লম্বা ঘুম দেয়।

মতিনের ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায়। নৌকা প্রবল দুলছে। শোঁ শোঁ বাতাস, মুষলধারে বৃষ্টি। নৌকা বুড়িগঙ্গার অন্যপাশে থেমে আছে। মাঝি কুদ্দুস ছইয়ের ভেতর বসা। সে কাঁপছে। মতিনকে উঠে বসতে দেখে সে বলল, এমন এক ঘুম আপনে দিছেন যার হিসাব নাই। একবার ভাবলাম লোকটার কি মৃত্যু হয়ে গেছে? দিনের অবস্থা দেখছেন? তুফান ছাড়ছে।

মতিন বলল, চা খেতে পারলে হতো।

কুদ্দুস বলল, চা নাই। বিয়ার আছে। বিয়ার দেই?

মতিন বলল, বিয়ার আরেক দিন এসে খাব। নৌকায় কতক্ষণ আছি বলেন তো?

সাড়ে চাইর ঘণ্টা। হেই পারে যাইতে লাগবে এক ঘণ্টা। পাঁচ ঘণ্টায় আপনে আমারে দিবেন আড়াই শ। দিনের যে অবস্থা পঞ্চাশ টেকা বখশিস ধইরা তিনশ টাকা মিল কইরা দিয়েন।

আচ্ছা। চলেন রওনা দেই।

কী পাগলের কথা কন! বাতাস কেমন ছাড়ছে দেখেন না! বাতাস কমুক। ভাইজান করেন কী?

আমি একজন কবি।

আপনের দেশের বাড়ি কোনখানে?

উজবেকিস্তান। পাহাড়ি অঞ্চল।

আপনেরে দেইখা মনে হয় বাঙালি।

মানুষ দেখে কি কিছু বুঝা যায় বুড়ো মিয়া? মানুষ দেখে কিছু বুঝা যায় না।

এইটা সত্য কথাই বলছেন, মানুষ দেইখা কিছু বুঝার উপায় নাই।

বাতাসের জোর আরো বেড়েছে। নৌকা টালমাটাল করছে। মতিন বলল, বুড়ো মিয়া, নৌকা ডুবে যাবে না তো?

কুদ্দুস চিন্তিত গলায় বলল, গতিক তো সুবিধার দেখি না।

নৌকার দুলুনির সঙ্গে মিলিয়ে কবিতা তৈরি করা যায় না?

নদ্দিউ নতিম সাহেব এই অবস্থায় কী করতেন? কবিতা তৈরির চেষ্টা নিশ্চয়ই করতেন।

দুলছে হাওয়া
দুলছে নদী
এখন যদি
তলিয়ে যায় জলে
অপূর্ব কৌশলে...

নৌকা এখন খাবি খাওয়ার মতো করছে। ছইয়ের এক অংশ খুলে গেছে। কুদ্দুস বলল, ভাইজান, শক্ত কইরা ধরেন, ছই উইড়া গেলে নৌকা ডুবব।

ছই উড়ে গেল না, কিন্তু নৌকা পানিতে কাত হয়ে ডুবে গেল। কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে মতিন ডাঙ্গায় উঠল। কুদ্দুস বলল, দুই হাত দিয়া মাথা চাইপা ধরেন। শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

অনেকক্ষণ ধরেই কলিংবেল বাজছে। বৃষ্টি এবং বাতাসের শব্দে কলিংবেলের রিনঝিন ঢাকা পড়ে গেছে। কলিংবেলের শব্দটাকে বৃষ্টির শব্দের অংশ বলে মনে হচ্ছে। তারপরেও কী মনে করে মৃন্ময়ী দরজা খুলল।

মতিন বলল, আপনি কি আমাকে চিনেছেন? আমার নাম মতিন।

মৃন্ময়ী বলল, আপনার এই অবস্থা কেন?

মতিন বলল, বুড়িগঙ্গায় নৌকাডুবি। সাঁতরে উঠেছি। সাঁতারটা শেখা না থাকলে আজ আমার খবর ছিল।

হাত মনে হয় কেটেছে। রক্ত পড়ছে। আসুন ভেতরে আসুন।

মতিন ভেতরে ঢুকল। মৃন্ময়ী বলল, বাবার একসেট কাপড় যদি দেই, আপনি পরবেন?

পরব।

সরাসরি বাথরুমে চলে যান। আমাদের গিজার ফিজার নেই। পানি গরম করে দিচ্ছি। সাবান ডলে ভালোমতো গোসল করুন! বাথরুমে নতুন সাবান আছে।

আমার গরম পানি লাগবে না।

লাগবে। আপনি শীতে থরথর করে কাঁপছেন। বাথরুমে ঢোকার আগে কি এককাপ গরম চা খাবেন? চায়ের পানি গরম আছে। আমি এক্ষুনি দিতে পারব।

দিন।

বড় একটা কাপ ভর্তি চা এনে মতিনের হাতে দিতে দিতে মৃন্ময়ী বলল, রাত কটা বাজে জানেন?

না।

এগারোটা দশ। রাতের খাবার নিশ্চয়ই খান নি?

না।

আমি খেয়ে নিয়েছি, আপনাকে একা খেতে হবে। আমার ধারণা একা ভাত খেয়ে আপনার অভ্যাস আছে।

জি অভ্যাস আছে। বাড়িতে লোকজন নেই?

আছে। আমার ছোটখালা আছেন। আমার এক মামাতো ভাই আছে। তারা শুয়ে পড়েছে। আপনার অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণ নেই। আপনি যে কোনো একদিন যে আসবেন তা আমি যেমন জানি অন্যরাও জানে।

তাহলে তো ভালোই।

আপনি বাবার অফিসে গিয়ে যেসব কাণ্ডকারখানা করেছেন, বাবা সব গল্পই আমার সঙ্গে করেছেন।

আমি তেমন কোনো কাণ্ডকারখানা করি নি।

করেছেন। বাবাকে বই উৎসর্গ করে এমন সব কথা লিখেছেন যে, তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন।

উনি কাঁদেন নি।

বাবা কাঁদলে তার চোখে পানি আসে না। তাঁর গলা খসখসে হয়ে যায়। আপনি এত বড় লেখক, কিন্তু আপনার Observation দুর্বল।

আমি বড় লেখক?

না, আপনি না। নদ্দিউ নতিম।

মতিন খেতে বসেছে। মৃন্ময়ী হাসিমুখে তার সামনে বসে আছে। মতিন বলল, আমি মনে হয় বিরাট এক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি।

কিছুটা তো ফেলেছেনই। হঠাৎ যদি ছোটখালার ঘুম ভাঙে, তিনি এই দৃশ্য দেখলে খাবি খাবেন।

মতিন বলল, হঠাৎ গভীর রাতে এই বাড়িতে উপস্থিত হলাম কেন জিজ্ঞেস করলেন না?

আপনি মানুষকে চমকে দিতে পছন্দ করেন এইজন্যেই কাজটা করেছেন।

মতিন বলল, ভুল বলেছেন। অনেকদিন আগে আপনার বাবা আমাকে তার মেয়ের জন্মদিনে আসার জন্যে দাওয়াত দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একসঙ্গে রাতে খাওয়া-দাওয়া করবেন। সিমের বিচি দিয়ে গরুর মাংস রান্না হবে। আজ সেই দিন। আজ আপনার জন্মদিন না?

মৃন্ময়ী হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মতিন তাকিয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিতে মৃন্ময়ীর কতক্ষণ লাগে তা তার দেখার ইচ্ছা। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলায়। যেমন–নিশু। আবার কেউ কেউ আছে একবার কাঁদতে শুরু করলে কাঁদতেই থাকে। যেমন–তৌহিদা। এই বিষয়ে কি গিনিজ বুকে রেকর্ডের ব্যবস্থা আছে? থাকলে তৌহিদা নিজের জায়গা করে নিতে পারত।

মৃন্ময়ী নিশুর মতোই দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, সরি। আপনার কথা চট করে মনের ভেতরে গিয়ে লাগল। আপনাকে যে বাবা নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেটা আমাকে বলেছিলেন। সিমের বিচি দিয়ে গরুর মাংস রাঁধতেও বলেছিলেন।

কই আজ তো সিমের বিচি দিয়ে মাংস রান্না হয় নি!

মৃন্ময়ী চোখ মুছতে মুছতে বলল, এই রান্নাটা বাবার খুব পছন্দের। আমি ঠিক করেছি যতদিন বেঁচে থাকব এই জিনিস খাব না।

আমি হলে উল্টোটা করতাম, উনাকে মনে করার জন্যেই বেশি বেশি খেতাম।

একেক মানুষ একেক রকম। কেউ মতিন উদ্দিন আবার কেউ নদ্দিউ নতিম। ভালো কথা, বাবা আপনার বই পড়েছেন। অল্প কয়েক পৃষ্ঠাই বাকি ছিল।

কিছু কি বলেছেন?

বলেছেন, তাঁর হয়ে আমি যেন আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেই। আপনি খাওয়া শেষ করুন, আমি ঠিক বাবার মতো আপনার মাথায় হাত রাখব।

মতিনের মাথায় হাত রেখে মৃন্ময়ী আবারো ফুঁপিয়ে উঠল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার মনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। একটু পর পর কাঁদি। আপনি কি আমার মনটা ঠিক করে দিতে পারবেন?

মতিন বলল, আমি পারব না। আমার এক বন্ধু আছে। জঙ্গলে থাকে, সে পারবে। যাবেন তার কাছে?

আপনি বললে যাব। আপনি কি যেতে বলছেন?

হ্যাঁ।

২৫. নিশু ব্যাগ গোছাচ্ছে

নিশু ব্যাগ গোছাচ্ছে। একটি গোছানো হয়েছে। অন্যটিতে বই তোলা হচ্ছে। গাদা গাদা বই সে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, একটাও পড়া হয় নি। মনে হয় ইহজীবনে আর পড়া হবে না। একটু দূরে খাটে পা ঝুলিয়ে তৌহিদা বসে আছে। সে নিশুর ব্যাগ গোছানো দেখে অবাক হয়েছে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছে না। কোনো কারণ ছাড়াই সে নিশুকে ভয় পায়। একটি প্রচ্ছন্ন কারণ অবশ্যি আছে। নিশু ধমক দিয়ে তৌহিদাকে ওষুধ খাওয়ায়।

তৌহিদা ক্ষীণ গলায় বলল, ব্যাগ গোছান কী জন্যে?

নিশু বলল, আমি চলে যাচ্ছি এইজন্যে।

কোথায় যাবেন?

মহিলা হোস্টেলে সিট পেয়েছি। সেখানে চলে যাব।

আর আসবেন না?

দেখা সাক্ষাতের জন্যে আসতে পারি। থাকার জন্যে আসব না। এখন থেকে তুমি হাত-পা ছড়িয়ে একা তোমার ঘরে ঘুমাবে।

আপনার মামলা কি শেষ?

মামলা শেষ না। মামলা চলছে। চলতেই থাকবে। একদিন সব আসামি খালাস পাবে। হাসিমুখে বাড়ি চলে যাবে। আরেকটা মেয়েকে রেপ করবে।

তৌহিদা বলল, সেই মেয়েটার নাম কী?

নিশু তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকাল। তৌহিদা কয়েক দিন হলো মন দিয়ে কিছুই। শুনছে না। তার রোগটা কি আরো বেড়েছে? নিশু বলল, পরের মেয়েটার নাম তো আমি জানি না। যে-কেউ হতে পারে। তুমিও হতে পার।

তৌহিদা উঠে দাঁড়াল। নিশুর চলে যাওয়ার খবরটা বুবুকে দিতে হবে। নিশু বলল, তৌহিদা, তুমি কি আমাকে এককাপ চা খাওয়াতে পারবে?

দুধ চা?

হুঁ, দুধ চা। কড়া হয় যেন। চা খেতে খেতে তোমার সঙ্গেও কিছু কড়া কড়া কথা বলব।

সালেহা গম্ভীর মুখে তৌহিদার কাছ থেকে নিশুর চলে যাবার খবর শুনলেন। বিরক্তমুখে বললেন, কাউকে কিছু না বলে চলে যাচ্ছে। বিরাট নিমকহারাম মেয়ে। যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়। তার ব্যাগ চেকিং হবে। টাকাপয়সা গয়না-টয়না নিয়ে চলে যেতে পারে। এই ধরনের মেয়েদের কোনো বিশ্বাস নাই।

তৌহিদা ক্ষীণ স্বরে বলল, নিশু আপা সেইরকম মেয়ে না।

সালেহা ধমক দিলেন, যা জানো না তা নিয়ে কথা বলবে না। এই মাগি কেমন মেয়ে সবাই জানে। এরকম একটা মেয়ে ঘরে এনে তুলেছে! মতিনকে আমি তার জন্যে একদিন ধরব। জন্মের শিক্ষা দিয়ে দিব।

নিশু চা খাচ্ছে। তৌহিদা তার সামনে বসেছে। তার সামান্য ভয় ভয় লাগছে। নিশু আপা না-কি কড়া কড়া কথা বলবে। না-জানি সেইসব কড়া কথায় কী আছে! জটিল কিছু আছে নিশ্চয়ই। ইদানীং সে জটিল কথা বুঝতে পারে না। জটিল কথা শুনলেই মাথা ঝিমঝিম করে।

তৌহিদা!

জি আপা।

আমি যে হোস্টেলে যাচ্ছি তুমিও ইচ্ছা করলে সেখানে যেতে পার। আমার সঙ্গেই যেতে পার। প্রথম কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকবে। তারপর সিট খালি হলে তুমি তোমার মতো থাকবে। এ বাড়িতে থাকা তোমার জন্যে ঠিক না।

কেন ঠিক না?

কারণ এই বাড়ির মানুষগুলো অসুস্থ। তোমার বুবু একজন মানসিক রোগী। তোমার ভাইজান ভ্যাবদা মানুষ। কিছু দেখেও দেখে না। কিছু বুঝেও বুঝে না। এটাও এক ধরনের

রোগ। রোগীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন থাকলে রোগ সংক্রমণ হবেই। তুমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাও না?

চাই।

এখানে থেকে সেটা সম্ভব হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বুঝতে পারছ?

হুঁ।

এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইলে বলতে পার। কোনো কিছু গোপন করতে হবে না। তোমার যা মনে আসে তুমি বলো।

তৌহিদা ক্ষীণ গলায় বলল, আমরা তো আলাদা সংসার করবই, তখন নতুন বাসা নিব।

নিশু বলল, তোমরা আলাদা বাসা করবে মানে কী? তুমি আর কে? মতিন?

হুঁ।

তৌহিদা শোন, তোমাকে আগেও কয়েকবার বলেছি, এখনো বলছি মতিনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি। তোমার বিয়ে হয়েছে হাবিবুর রহমান নামের লোকটার সঙ্গে। ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় হয়েছে। সব অন্যায়ের প্রতিকার আছে। এই অন্যায়েরও আছে। প্রথমে আইনের মাধ্যমে এই বিয়ে ভাঙতে হবে, তারপর যদি তুমি মতিনকে বিয়ে করতে চাও এবং মতিন যদি রাজি থাকে তোমরা বিয়ে করবে। আলাদা বাসা করে থাকবে। বুঝতে পারছ?

জি। তবে আমরা একটা কাজের মেয়ে রাখব। সব কাজ আমি একা করতে পারব না। ও যেমন মানুষ সংসারের কিছুই দেখবে না।

কে এরকম মানুষ? তুমি কি মতিনের কথা বলছ?

হুঁ।

আমার মনে হয় না তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ।

আপা, মন দিয়ে শুনছি।

ঠিক করে বলো তো, মতিনের সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হয়েছে?

না।

তোমার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে?

তৌহিদা ফোঁপাতে শুরু করল। নিশু বলল, কাঁদবে না প্লিজ। নাকি কান্না আমার অসহ্য। আমি আমার হোস্টেলের ঠিকানা লিখে রেখে যাচ্ছি। যদি কখনো মনে কর এই বাড়ি ছেড়ে দেবে–ঠিকানা থাকল। ঠিক আছে?

জি।

তোমার চা ভালো হয়েছে। আরেক কাপ চা খাওয়াও।

জি আচ্ছা।

খাটের উপর দেয়ালটার দিকে তাকাও। একটা কাগজ দেয়ালে সেঁটে দিয়েছি। কোন ওষুধ কখন খাবে সব লেখা। ওষুধ খেতে যেন ভুল না হয়। ভুল হবে না তো?

জি-না, হবে না।

নিশু বলল, তৌহিদা, তুমি আমাকে ভয় পাও এটা আমি জানি। কিন্তু তোমাকে আমি খুবই আদর করি। আমার কোনো ছোট বোন থাকলে তাকে তোমার চেয়ে বেশি আদর করতাম না। আমি তোমার ভালো চাই। এতে কোনো ভুল নেই। Plese believe me.

হাবিবুর রহমান রাত করে বাড়ি ফিরলেন। সালেহা হাসিমুখে বললেন, অ্যাই শোন, চিড়িয়া উড়ে গেছে।

হাবিবুর রহমান অবাক হয়ে বললেন, চিড়িয়া উড়ে গেছে মানে?

মহাজ্ঞানী নিশু ম্যাডাম চলে গেছে।

কোথায় গেছে?

কোথায় গেছে আমি কী জানি! যেখানে ইচ্ছা যাক। আমাদের কী! না-কি তোমার কোনো বিষয় আছে?

আমার কী বিষয় থাকবে?

পুরুষ মানুষদের তলে তলে অনেক বিষয় থাকে। মেয়েদের হলো ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচ আর পুরুষদের হলো পাঞ্জাবির নিচে ঝামটা নাচ। বুঝেছ?

হুঁ।

নিশু ম্যাডাম যাবার সময় আমার কাছ থেকে ছোট একটা ট্রিটমেন্ট পেয়েছে। এরকম ট্রিটমেন্ট পাবে চিন্তাই করে নাই। চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে নাই।

কী ট্রিটমেন্ট দিয়েছ?

সালেহা আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে, আমি বললাম, তোমার ব্যাগ খুলে আমাকে দেখাও, চেকিং হবে। আমার অনেক জিনিস মিসিং। ইচ্ছা করে যে কিছু নিয়েছ তা বলছি না। ভুলেও তো নিতে পার। ভালো ট্রিটমেন্ট না?

হাবিবুর রহমান হতাশ চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। সালেহা বললেন, আজ তো তোমার ঈদ। রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

ঈদ কী জন্যে?

ছোট বউয়ের ঘর খালি। ছোট বউয়ের সঙ্গে থাকতে পারবে। আজ তোমাকে পারমিশান দিলাম। এতদিন বিয়ে হয়েছে, এখনো তুমি এক জায়গায় বউ আরেক জায়গায়, এটা ঠিক না।

বাদ দেও তো এইসব।

সালেহা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, বাদ দিব কেন? বিয়ে করেছ স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে, এতে সমস্যা কী? অবশ্যই আজ রাতে তুমি ঐ ঘরে থাকবে। অবশ্যই অবশ্যই।

হাবিবুর রহমান বিড়বিড় করে বললেন, মেয়েটা অসুস্থ।

সালেহা বললেন, এইজন্যেই তো একসঙ্গে থাকবে। কয়েক মত এক বিছানায় ঘুমালে সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাত সাড়ে দশটার দিকে হাবিবুর রহমান শুকনা মুখে তৌহিদার ঘরে ঢুকলেন। তৌহিদা বলল, ভাইজান কী?

হাবিবুর রহমান জবাব না দিয়ে খাটের একপাশে শুয়ে পড়লেন।

তৌহিদা ভোরবেলা ঘর থেকে বের হলো। ঘড়ি দেখল। ঘড়িতে তিনটা বাজে। ঘড়ি নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে আছে। জানালা দিয়ে দিনের হালকা আলো আসছে। রাত তিনটায় নিশ্চয়ই ভোর

হয় না। সে সাবধানে দরজা খুলেছে। সালেহার ঘুম পাতলা, একটু শব্দ হলেই জেগে উঠতে পারেন। তিনি জেগে উঠলে তৌহিদার কোথাও যাওয়া হবে না। তৌহিদার একটা জায়গায় যেতে হবে। এক্ষুনি যেতে হবে।

রাস্তাঘাটে লোকজন নেই, তবে কিছু রিকশা চলছে। ইয়েলো ক্যাব দেখা যাচ্ছে। একটা খালি রিকশা এগিয়ে আসছে।

আফা কই যাবেন?

তৌহিদা কোথায় যাবে না বলেই রিকশায় উঠে পড়ল। রিকশা চলতে শুরু করুক, তারপর সে চিন্তা করবে কোথায় যাবে। মতিনের মেসে যাওয়া যায়। মতিনকে ঘুম থেকে তুলে বলতে পারে, অ্যাই, তোমার সঙ্গে নাশতা খেতে এসেছি। কিংবা সে নিশুর হোস্টেলেও যেতে পারে। নিশুর ঠিকানা তার সঙ্গে আছে। নিশুকে সে বলবে, আপা, আপনি যে কোন ওষুধ কখন খেতে হবে তালিকাটা করেছেন, সেখানে ভুল আছে। আপনি লিখেছেন–নীল ট্যাবলেট রাতে একটা করে। রাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হবে দুটা। একটা করে খাচ্ছি বলেই আমার রোগ সারছে না।

রিকশাওয়ালা বলল, আফা যাইবেন কই?

তৌহিদা জবাব দিল না। সে এখনো ঠিক করতে পারছে না কোথায় যাবে। তার গ্রামের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে। কীভাবে যেতে হয় কিছুই মনে নেই। তবে লঞ্চে যেতে হয় এটা মনে আছে। সে কি সদরঘাটে চলে যাবে? সেখান থেকে লঞ্চে উঠবে?

কে কথা কয় উপন্যাসে তৌহিদার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ। তাকে পরে আর কোথাও পাওয়া যায় নি। ঢাকা শহরে একবার কেউ হারিয়ে গেলে তাকে আর পাওয়া যায় না।

যে নেই তার গল্প ও নেই।

২৬. কম্পিউটারে কমলের গোপনীয় ডায়েরি

কম্পিউটারে কমলের
গোপনীয় ডায়েরি

আমার নাম কমল।

এটা একটা ফুলের নাম। ফুলটির ইংরেজি নাম Lotus. বাংলায় কমলের আরেক নাম পদ্ম। পদ্ম আবার দুরকম–

জলপদ্ম

স্থলপদ্ম

জলপদ্মের বোটানিক্যাল নাম Hibiscus mutabilis, স্থলপদ্মের বোটানিক্যাল নাম Nelumbo nucifera Gaertn. জলপদ্মের আবার অনেক ভাগ আছে। যেমন–

শ্বেতপদ্ম

রক্তপদ্ম

নীলপদ্ম

ফুলের রঙে নাম। যেমন লালপদ্ম হলো রক্তপদ্ম। রক্তলাল বলেই রক্তপদ্ম হলো লালপদ্ম।

এদের আলাদা কোনো বোটানিক্যাল নাম নেই। আমাকে এইসব তথ্য দিয়েছেন ফারুক। আগে আমি তাঁকে ডাকতাম আঙ্কেল ফারুক। এখন ডাকি ফারুক। কারণ তিনি আমার আঙ্কেল না। আঙ্কেল হলো বাবার ভাই কিংবা মায়ের ভাই। ফারুক বাবার ভাই না, আবার মায়েরও ভাই না।

আমার কাছে মনে হয় সম্পর্ক খুব জরুরি। সম্পর্ক দিয়ে ফ্যামিলি ট্রি তৈরি হয়। আমি একটি ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করেছি।

আবদুল করিম

↓

সালাউদ্দিন জলিল

↓

সালেহ ইমরান

↓

কমল

ফ্যামিলি ট্রি তৈরি করতে মায়ের ফ্যামিলি ও প্রয়োজন হয়। আমার মায়ের নাম মুনা। তার মায়ের নাম আকিলা বেগম। আকিলা বেগমের মায়ের নাম আমি জানি না। মাকে জিজ্ঞেস

করেছিলাম। মা বলল, এখন মনে নাই, পরে জেনে দেব। মা পরে আর দেয় নি। এটা হচ্ছে মার স্বভাব।

ফারুক এরকম না। তাকে যা বলা হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে করে দেন। তিনি একজন অ্যামেচার ম্যাজিসিয়ান। Ameteur শব্দের অর্থ হচ্ছে–

A person who takes part in a sport or other
activity for enjoyment, not as a job.

এই শব্দের আরেকটি অর্থ আছে–

A person who is not skilled.

ফারুক Skilled ম্যাজিশিয়ান। কাজেই তাঁর জন্যে প্রথম অর্থটা ঠিক। দ্বিতীয়টা না। অর্থাৎ সে হচ্ছে–A person who takes part in a sport or other activity for enjoyment, not as a job.

আমি অর্থ দুটা পেয়েছি Oxford Advanced Learners Dictionary থেকে। ডিকশনারিটা আমাকে ফারুক উপহার দিয়েছেন। তিনি আমাকে অনেক বই উপহার দিয়েছেন। একটি বইয়ের নাম Easy Coin Tricks. এটা একটা ম্যাজিকের বই। এই বইটা আমি পড়ি নি। কারণ আমার ম্যাজিক ভালো লাগে না।

ম্যাজিকে মিথ্যাকে সত্য করে দেখানো হয়। মিথ্যা কখনো সত্য হয় না। মিথ্যা সবসময় মিথ্যাই থাকে।

মিথ্যা আমার পছন্দ না। কেউ মিথ্যা বললে আমার রাগ লাগে। যখন আমার রাগ লাগে, তখন আমার মাথা ভার ভার লাগে। তখন আমি পরিষ্কার কিছু দেখতে পাই না। মাথা যখন খুব বেশি ভার ভার লাগে তখন আমার Epileptic Seizure হয়।

Epileptic Seizure শব্দটির অর্থ হলো–A Sudden attack of an illness, especially one that affects the brain.

আমার এই সমস্যার কথা সবাই জানে বলেই কেউ আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে না।

কয়েকদিন আগে আমি একটা বই পড়ে শেষ করেছি। বইটিতে একটা আমার মতো ছেলের কথা লেখা। তার নাম ক্রিস্টোফার। মিথ্যা কথা সেই ছেলেটিও সহ্য করতে পারে না। তবে ছেলেটির বাবা তাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। ছেলেটি ডিটেকটিভের মতো মিথ্যাটা ধরে ফেলে। তখন তার খুব কষ্ট হয়। ক্রিস্টোফারের বাবা একটা কুকুরকে বর্শা দিয়ে মারেন। খুব অন্যায়।

আমিও ক্রিস্টোফারের মতো ডিটেকটিভের কাজ করছি। কারণ আমার ধারণা ফারুক আমার বাবা। আমার পিঠে যেমন লাল দাগ আছে, ফারুকের পিঠেও আছে। আমি আয়নায় দেখেছি। একে বলে Heredity.

এই শব্দটার অর্থ হলো–

The process by which mental and physical characteristics are passed by parents to their children.

বিষয়টা নিয়ে আমি কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি। শুধু মতিনকে বলেছি। মতিন আমার বন্ধু। সে এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবে।

ফারুক যদি আমার বাবা হয়, তাহলে তাকে আমার বাবা ডাকতে হবে এবং সালেহ ইমরানকে তার নাম ধরে ডাকতে হবে। এটা সহজ কাজ। যে-কেউকে যে-কোনো কিছু ডাকা যায়। তবে ফারুক যদি আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে চান, তাহলে সমস্যা হবে। কারণ তখন আমাকে আমার ঘর ছেড়ে যেতে হবে। আমি পরিচিত জায়গা ছাড়া থাকতে পারি না। পরিচিত জায়গার সব গন্ধ আমার চেনা। অপরিচিত জায়গার সব গন্ধ চেনা না।

টেলিফোনে কাল রাতে আমি মার সঙ্গে কথা বলেছি। মা টেলিফোন করেছিলেন, আমি টেলিফোন ধরেছি। মার সঙ্গে আমার কী কী কথা হলো আমি এখন তা লিখব। আমার সবকিছু মনে থাকে। আজ থেকে একমাস পরেও যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমি বলতে পারব। একমাস পার হয়ে গেলে বলতে পারব। কি-না জানি না। পরীক্ষা করে দেখি নি। মা বলল, হ্যালো।

আমি বললাম, হ্যালো।

মা বলল, কী করছ?

আমি বললাম, কিছু করছি না।

মা বলল, আমি যে এতদিন বাইরে থাকছি তোমার খারাপ লাগছে না?

আমি বললাম, না।

মা বলল, তুমি কি আমাকে মিস করো না?

আমি বললাম, না।

মা বলল, আমি কিন্তু তোমাকে মিস করি।

আমি বললাম, তুমি কি বাবাকেও মিস করো?

মা বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বাবাকে মিস করলে তুমি বাবাকে ছেড়ে যেতে না।

মা বলল, তোমার বয়স কম, তুমি অনেক কিছু বুঝবে না।

আমি বললাম, বুঝিয়ে দাও। Be my teacher.

মা টেলিফোন রেখে দিল। আমি রুবিক কিউব নিয়ে খেলতে বসলাম। রুবিক কিউব হলো–

A puzzle consisting of a plastic cube covered with coloured squares that you turn to make each side of the cube a different colour.

রুবিক কিউবটি আমাকে দিয়েছেন ফারুক। তিনি বলেছেন, এই পাজল। সমাধানের সর্বনিম্ন সময় তিন মিনিট। ভিয়েতনামের একটি ছেলে এই রেকর্ড করেছে। তার নাম গিনিজ বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে।

আমি বললাম, ছেলেটার নাম কী?

উনি নাম বলতে পারলেন না।

আমার রেকর্ড পাঁচ মিনিট তিন সেকেন্ড। আমি প্রতিদিনই পাঁচবার এই পাজলের সমাধান করি। মার সঙ্গে কথা বলে টেলিফোন রাখার পর আমি যে পাঁচবার সমাধান করেছি তার সময় হলো–

৬ মিনিট ১০ সেকেন্ড

৬ মিনিট ০ সেকেন্ড

৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ড

৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড

৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ড

সূচিপত্র

আমার বাবা (কিংবা বাবা না) সালেহ ইমরান একজন ব্যারিস্টার। তিনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন ততক্ষণ বই পড়েন। আগে তাঁর সঙ্গে সপ্তাহে দুইদিন আমি মুভি দেখতাম। এখন একদিন দেখি। গত সপ্তাহে যে মুভি দেখেছি তার নাম–

A sound of Thunder.

টাইম ট্রাভেলের গল্প। লেখকের নাম Ray Bradbury.

বাবা (কিংবা বাবা না) বলেছেন ইনি খুব বড় একজন সায়েন্সফিকশান লেখক। আমার কাছে তাকে বড় সায়েন্সফিকশান লেখক মনে হয় নি। কারণ বড় লেখকরা ভুল করেন না। তিনি ভুল করেছেন, টাইম ট্রাভেল করতে হলে আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে যেতে হবে। সেটা সম্ভব না। আলোর গতি ধ্রুব। সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।

আমি বাবাকে (কিংবা বাবা নাকে) বললাম, লেখক ভুল করেছেন।

বাবা বললেন, বিজ্ঞানের সত্যের চেয়ে চিন্তার শুদ্ধতাটা দেখতে হবে। তাঁর চিন্তা শুদ্ধ।

বিজ্ঞানের সত্য আবার ভুল। বিজ্ঞানের মিথ্যা কিছু নেই। বিজ্ঞানের সবই সত্য। আমি বললাম, তুমি ভুল কথা বলেছ।

তিনি বললেন, হতে পারে আমি ভুল বলেছি।

আমি বললাম, কেউ ভুল বললে আমার খারাপ লাগে।

তিনি বললেন, খারাপ লাগাটা কমাতে হবে। মানুষ ভুল করবেই।

আমি বললাম, কেন?

তিনি বললেন, কারণ মানুষ কম্পিউটার না।

আমি বললাম, মানুষ অবশ্যই কম্পিউটার। কম্পিউটার ইনফরমেশন প্রসেস করে, মানুষও করে। মানুষের ব্রেইন হলো হার্ডডিস্ক। মানুষের চিন্তা হলো কমান্ড।

তিনি বললেন, আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্কে যাব না। কারণ এই বিষয় আমি জানি না।

আমি বললাম, কে জানেন?

তিনি বললেন, আলোচনা এখানেই বন্ধ। প্লিজ স্টপ।

আমার বন্ধু মতিন একজন লেখক। তিনি Ray Bradburyর চেয়ে বড় লেখক। কারণ তিনি ছোট ছোট ভুল করেছেন, বড় ভুল করেন নি। তিনি বইতে লিখেছেন পিপড়াগুলি পেছন দিকে হাঁটা শুরু করল। পিপড়া পেছন দিকে হাঁটে না। প্রাণী জগতের কেউই পেছনে হাঁটতে পছন্দ করে না। কারণ তাদের পেছনে কোনো চোখ নেই। মানুষও পেছন দিকে হাঁটতে চায় না। মোটরগাড়ি পেছনে যায়। ব্যাক গিয়ার দিলেই মোটর পেছনে যায়। Gear হলো–

Machinery in a vehicle that turns engine power into movement forwards or backwards.

উনার বইতে আরেকটা ভুল হলো, তিনি লিখেছেন—–অন্ধকার দেখতে হলে আলো লাগে। আলো ছাড়া অন্ধকার দেখা যায় না।

আলোর অভাবই অন্ধকার। তাহলে আলো দিয়ে আমরা কীভাবে অন্ধকার দেখব? উনি যে সব ভুল করেছেন, আমি সবই হলুদ মার্কার দিয়ে দাগ দিয়েছি। যেদিন তার সঙ্গে দেখা হবে সেদিন তাঁকে ভুলগুলি দেখাব। তার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে।

আমি বললাম, হ্যালো।

তিনি বললেন, হ্যালো কমল।

আমি বললাম, হ্যালো নতিম।

তিনি বললেন, হ্যালো লমক।

আমি বললাম, যে হারিয়ে গেছে তাকে কি পাওয়া গেছে? আপনার পরিচিত যে মেয়ে!

তিনি বললেন, তোমাকে কে বলেছে?

আমি বললাম, বাবা বলেছেন। (আমার বলা উচিত ছিল বাবা হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন বলেছেন। সেটা না বলে আমি বলেছি, বাবা বলেছেন। এটা ভুল।)

তিনি বললেন, তাকে পাওয়া যায় নি।

আমি বললাম, পুলিশের উচিত কুকুর দিয়ে খোঁজা। কারণ কুকুর হাফ কিলোমিটার দূরের গন্ধও পায়।

তিনি চুপ করে রইলেন।

আমি বললাম, তাকে যদি কোনোদিন খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে কি আপনার খারাপ লাগবে?

তিনি বললেন, তোমার যদি প্রিয় কেউ হারিয়ে যায়, তোমার কি খারাপ লাগবে?

আমি বললাম, মানুষের কেন খারাপ লাগে, কেন ভালো লাগে এটা আমি জানি না। আমি চিন্তা করছি। চিন্তা করে যেদিন বের করব তখন আপনার প্রশ্নের জবাব দেব!

আমি চিন্তা করার জন্যে খুব ভালো একটা জায়গা পেয়েছি। সিঁড়িঘরের ছাদ। ছাদ থেকে সিঁড়িঘরের ছাদে উঠার জন্যে লোহার একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়িঘরের ছাদে উঠে রাস্তার দিকে মুখ করে ছাদে বসা। পা ঝুলিয়ে বসতে হবে। উপর থেকে রাস্তার মানুষদের দেখা যাবে। কিন্তু রাস্তার লোকজন আমাকে দেখতে পাবে না। যাদের Batophobia আছে, তারা কখনো এই কাজটা পারবে না।

Batophobia হলো–Fear of heights.

এরকম আরো অনেক Phobia আছে।

যেমন—

- Abluthophobia : Fear of bathing.
- Acarophobia : Fear of itching or of the insects that cause itching.
- Achluophobia : Fear of darkness.
- Acousticophobia : Fear of noise.
- Acrophobia : Fear of heights.
- Agyrophobia : Fear of crossing streets.
- Aichmophobia : Fear of needles or pointed objects.
- Ailurophobia : Fear of cats.
- Altophobia : Fear of heights.
- Amathophobia : Fear of dust.
- Amaxophobia : Fear of being in or riding in vehicles.
- Ambulophobia : Fear of walking.
- Autophobia : Fear of being alone.
- Bacillophobia : Fear of microbes.
- Bacteriophobia : Fear of bacteria.
- Basophobia : Inability to stand. Fear of falling,
- Bathmophobia : Fear of walking.
- Bathophobia : Fear of depth.

- Belomophobia : Fear of needles.
- Belonephobia : Fear of pins and needles.
- Bogyphobia : Fear of demons and goblins.
- Bromidrosiphobia : Fear of bodily odors.
- Brontophobia : Fear of thunder storms.
- Cacomorphobia : Fear of fat people.
- Caligynephobia : Fear of beautiful women.
- Cancerophobia : Fear of cancer.
- Cardiophobia : Fear of heart disease.
- Catagelophobia : Fear of being ridiculed.
- Catoptrophobia : Fear of mirrors.
- Cenophobia : Fear of empty spaces.
- Cymophobia : Fear of waves.
- Cynophobia : Fear of dogs.
- Deipnophobia : Fear of dining and dinner conversations.
- Decidophobia : Fear of making decisions.
- Demophobia : Fear of crowds.
- Dentophobia : Fear of dentists.
- Dermatophobia : Fear of skin disease.
- Dextrophobia : Fear of objects on the right side of the body.
- Dipsophobia : Fear of drinking.
- Domatophobia : Fear of being in a house.

- Dromophobia : Fear of crossing streets.
- Dystychiphobia : Fear of accidents.
- Ecophobia : Fear of home.
- Eisoptrophobia : Fear of mirrors.
- Eleutherophobia : Fear of freedom.
- Elurophobia : Fear of cats.
- Entomophobia : Fear of insects.
- Eosophobia : Fear of dawn.
- Eremophobia : Fear of lonliness.
- Gametophobia : Fear of marriage.
- Helminthophobia : Fear of being infested with worms.
- Hemaphobia : Fear of blood.
- Hematophobia : Fear of blood.
- Herpetophobia : Fear of reptiles.
- Hierophobia : Fear of priests.
- Hippophobia : Fear of horses.
- Hodophobia : Fear of road travel.
- Homichlophobia : Fear of fog.
- Hydrophobia : Fear of water.
- Hygrophobia Fear of liquids. Fear of liquids, esp. wine and water.
- Hypengyophobia : Fear of responsibility.
- Hypnophobia · Fear of sleep.

- Hypsophobia Fear of high places.
- Nosophobia : Fear of becoming ill.
- Novercaphobia Fear of your mother-in-law.
- Nudophobia : Fear of nudity.
- Nyctophobia : Fear of the dark or of night.
- Ochlophobia : Fear of crowds or mobs.
- Ochophobia : Fear of vehicles.
- Odontophobia : Fear of teeth.
- Odynophobia : Fear of pain.
- Olfactophobia : Fear of smells.
- Ombrophobia : Fear of rain or of being rained on.
- Ommetaphobia : Fear of eyes.
- Onomatophobia : Fear of hearing a certain word or words, or name or names.
- Ophidiophobia : Fear of snakes.
- Ophthalmophobia : Fear of being stared at.
- Ornithophobia : Fear of birds.
- Orthophobia : Fear of property.
- Osmophobia : Fear of smells.

আরো অনেক আছে। সব এখনো যোগাড় করতে পারি নি। আমি তালিকা তৈরি করেছি আমার কী কী Phobia আছে তা জানার জন্যে।

২৭. মৃন্ময়ী জঙ্গলে এসে পৌঁছেছে

মতিন,

মৃন্ময়ী আমার এখানে এসে পৌঁছেছে। তার বয়েসী একটি মেয়ে এক জঙ্গলে আমার মতো জংলির কাছে বেড়াতে চলে আসবে, আমি ভাবতেই পারি নি। তুই কলকাঠি নাড়ছিস এটা বুঝতে পারছি। তোর কাঠি খেলার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ।

মৃন্ময়ী মুগ্ধ আমার কাণ্ডকারখানা দেখে। তার অবস্থা Alice in Wonderland-এর মতো। আমার সঙ্গে তার প্রথম কথা–এই হাতির বাচ্চাটা কি আপনার?

আমি বললাম, না। সে মাঝে মাঝে আমার এখানে বেড়াতে আসে।

এর কি কোনো নাম আছে?

আমি তাকে একটা নামে ডাকি। আপনি আপনার পছন্দমতো নাম দিতে পারেন।

আমি নাম রাখলাম, অম্বু।

অম্বু তো পানির আরেক নাম। হাতির নাম পানি মিয়া রাখা কি ঠিক?

ঠিক হোক না-হোক এর নাম অম্বু।

মৃন্ময়ী এখন কী করছে জানিস? অম্বুকে গোসল দিচ্ছে। তার গায়ে বালতি বালতি পানি ঢালা হচ্ছে এবং স্পঞ্জ দিয়ে ডুলা হচ্ছে। বিষয়টাতে অঙ্কুর তেমন আপত্তি আছে বলেও মনে হচ্ছে না। সে চারপায়ে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে মহানন্দে শুঁড় দোলাচ্ছে।

আমি বারান্দায় বসে লিখছি এবং এই মজার দৃশ্য দেখছি। লেখা বন্ধ করে মনায়ীকে বললাম, হাতিদের গায়ে মাটির যে প্রলেপ থাকে সেটা হাতিদের জন্যে জরুরি। তারা ইচ্ছে করেই গায়ে কাদা মাখায়। শরীরের তাপ ধরে রাখার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

মৃন্ময়ী বলল, আমার কাছে জ্ঞান ফলাবেন না।

কাজেই জ্ঞান ফলানো বন্ধ। আমি মৃন্ময়ীর আশেপাশে ঘুরছি অজ্ঞানী মূর্খসম।

আচ্ছা মায়ীকে যে আমার খুব পছন্দ হয়েছে–এটা কি তুই আমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারছিস? বুঝতে পারার তো কথা।

মৃন্ময়ীর যে আমাকে খুব পছন্দ এটা কি স্পষ্ট হয়েছে?

তোকে অন্ধকারে রেখে লাভ নেই, আসল কথা শোন–মৃন্ময়ী ঠিক করেছে সে আর শহরে ফিরে যাবে না। এইখানেই থাকবে। বিয়ে ছাড়া আমাদের এখন আর উপায় কী? হা হা হা।

মৃন্ময়ীর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শেষ করে আমি ট্রি হাউসে উঠে বিকট চিৎকার দিয়েছি। আমি বলেছি–

I am the happyest man
in the whole universe.

আমার চিৎকার শুনে গাছের সব পাখি উড়ে চলে গেছে। ওরা আর ফিরে আসবে এরকম মনে হয় না।

এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই বকবক করলাম, এখন তোর কথা শুনি। নিশুর মামলা সালেহ ইমরান নামের এক ব্যারিস্টার পরিচালনা করতে আসছেন শুনে ভালো লাগল। তোর কি মনে আছে বলাকা সিনেমাহলে জাজমেন্ট অ্যাট নুরেমবার্গ ছবি দেখে আমরা দুজন কী মুগ্ধই না হয়েছিলাম! বিখ্যাত সব আইনজ্ঞ। কী কঠিন তাদের জেরা!

নিশুর মামলার জেরাপর্ব দেখার শখ আছে। আমি চলে আসব। কিছুদিন নগরের ধুলাময়লা গায়ে মেখে প্রত্যাবর্তন।

মৃন্ময়ীরও অনেক গৃহস্থালী কেনাকাটা আছে। সে আবার বলে দিয়েছে তার প্রতিটি কেনাকাটার সময় আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

নতুন কিছু কি লিখছিস? সায়েন্সফিকশানের চমৎকার একটা আইডিয়া আমার মাথায় আছে। ধার নিবি? দশ এগারো বছরের একটি কিশোর। তার মামা জার্মানি থেকে তার জন্যে উপহার হিসেবে একটা ক্যামেরা এনেছেন। বিশেষ ধরনের ক্যামেরা... বাকিটা সাক্ষাতে বলব।

ভালো থাকিস। পৃথিবীর সবচে মায়াবতী মেয়েটিকে আমার কাছে পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ।

ইতি–
কঠিন গাধা

২৮. সালেহ ইমরান কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন

সালেহ ইমরান কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তার ভঙ্গি শান্ত। মতিনের কাছে মনে হচ্ছে, কলেজের প্রফেসর কালো কোট পরে ডায়াসে উঠছেন। বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা। কিংবা প্রেমের কবিতায় রূপকের ব্যবহার।

নিশুর একপাশে মতিন বসে আছে। অন্যপাশে মৃন্ময়ী। মতিনের পাশে কঠিন গাধা আশরাফ। নিশুকে অস্থির মনে হচ্ছে। মৃন্ময়ী নিশুর হাত ধরে আছে। মৃন্ময়ীর চোখ স্থির। সে পলক পর্যন্ত ফেলছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সালেহ ইমরান শান্তভঙ্গিতে বললেন, আপনার নাম খলিল?

প্রধান আসামি খলিল বলল, জি স্যার, ডাকনাম চুন্নু।

আসামিকে মোটেই নার্ভাস মনে হচ্ছে না। তার মাথার চুল আঁচড়ানো। মুখ ক্লিনড শেভড। তবে নতুন উকিল দেখেই হয়তো সরু চোখে তাকাচ্ছে।

আপনি জবানবন্দিতে বলেছেন, নিশু আপনাকে আপোসের প্রস্তাব দিয়েছে?

জি স্যার।

প্রস্তাব কোথায় দিয়েছে?

হোটেলে। বাড়ির সামনেই হোটেল আছে। বিসমিল্লাহ হোটেল।

হোটেলে আপনি কী করছিলেন?

খানা খাচ্ছিলাম।

বাড়ির সামনেই হোটেল। বাড়িতে খানা না খেয়ে হোটেলে খাচ্ছিলেন কেন?

সাথে আমার দুই বন্ধু ছিল। এদের নিয়ে একসঙ্গে খানা খেলাম। বন্ধুবান্ধব নিয়ে সবসময় বাড়িতে যাওয়া যায় না।

কী দিয়ে খানা খাচ্ছিলেন? আইটেম কী কী ছিল?

আইটেম স্যার মনে নাই।

আপনার প্রতিটি ঘটনা মনে আছে। নিশু কী কী প্রস্তাব দিল মনে আছে, আইটেম মনে নাই কেন?

স্যার এখন মনে পড়েছে। ঝাল চিকেন ফ্রাই। বিফ ভুনা, ডাল।

মাছের কোনো আইটেম ছিল না?

জি-না।

পেট ভরে খেয়েছেন?

জি।

রানা ভালো ছিল?

ঐ হোটেলের রান্না স্যার ভালো।

সালেহ ইমরানের ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসির আভাস দেখা দিল। সেই হাসি তিনি দ্রুত মুছে ফেলে বললেন, আপনি জবানবন্দি দিয়েছেন যে, নিশুর ঘরে তিন বন্ধু নিয়ে ঢুকেছেন। খাওয়া-দাওয়া করেছেন। আপনি কিছুক্ষণ আগে বিসমিল্লাহ হোটেলে ঝাল চিকেন ফ্রাই, বিফ ভুনা এবং ডাল দিয়ে ভরপেট খেয়েছেন। আবার খেতে বসে গেলেন? আধাঘণ্টার ভেতর দুইবার লাঞ্চ!

খলিল সামান্য হকচকিয়ে গেল।

মতিন নিশুর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, বাঘের বাচ্চার হাতে পড়েছে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে, ইমরান সাহেব এই হারামজাদাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবেন। হারামজাদার রক্ত চেটে খাবেন।

খলিল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, নিয়ম রক্ষার মতো দুই এক লোকমা মুখে দিলাম। দাওয়াত করে এনেছে, না খেলে খারাপ দেখায়।

তারপর আপনার জবানবন্দিতে যা দেখলাম, আপনার ভাষাতেই বলছি, আপনি সেক্স করলেন।

জি স্যার। উনি চেয়েছেন বলে করেছি। স্বইচ্ছায় না।

আপনার বাকি দুই বন্ধুও করেছেন?

জি।

আপনারা তিনবন্ধুই তো এইসব কাজের ঘোর বিরোধী। সমাজে এধরনের অনাচার হোক চান না। অথচ নিজেরা কাজটা করলেন?

বললাম না স্যার জোরাজুরি।

তারপর ঘর থেকে স্বাভাবিকভাবে বের হয়ে গেলেন, কারণ তখনো জানেন না যে নিশু পুরো ঘটনা সাজিয়ে রেখেছে।

জি স্যার। শান্তিমতো বের হয়ে গেছি।

নিশু বলে নাই যে, আবার আসবেন?

মুখে কিছু বলে নাই, তবে ভাব সেরকমই ছিল।

কখন টের পেলেন ফরিয়াদি নিশুর মনে ছিল এই দুষ্টুবুদ্ধি?

মামলা করার পর টের পেয়েছি।

আপনাকে দুপুরে খেতে ডেকেছে। আপনি সঙ্গে আরো দুই বন্ধু নিয়ে গেছেন। পকেটে ক্ষুর। ক্ষুর নিয়ে গেলেন কেন?

পকেটে ক্ষুর ছিল না স্যার।

ছিল না?

জি-না। ক্ষুর ঐ হারামি মেয়ে যোগাড় করেছে। নিজের শরীর কাটাকুটি করে মামলা সাজায়েছে।

সালেহ ইমরান জাজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইওর অনার, এই আসামি ক্ষুরসহ ছিনতাই করার সময় পুলিশের হাতে একবার ধরা পড়েছিল। লালবাগ থানায় তার রেকর্ড আছে। আর ক্ষুরে তার হাতের ছাপও আছে। পুলিশের ফরেনসিক বিভাগের রিপোর্ট আছে। আমরা আদালতে জমা দিয়েছি।

মতিন বলল, বলেছিলাম না ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে? নিশু, অবস্থা দেখেছিস? পড়েছে রক্তচাটার হাতে। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে রক্ত চাটবে।

আশরাফ বলল, চুপ করে থাক তো। মনে হচ্ছে তুই এখনই রক্ত চেটে খেতে চাচ্ছিস।

খলিলের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ এখন স্পষ্ট। সে জিভ দিয়ে কয়েকবার ঠোঁট চাটল। গলা খাকারি দিল। কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, স্যার, এখন মনে পড়েছে। আমার পকেটে একটা ক্ষুর ছিল।

ক্ষুর সঙ্গে নিয়ে ঘুরেন?

লাইফের প্রটেকশানের জন্যে সঙ্গে সেই দিন ছিল। আমার অনেক শত্রু আছে। শহরের অবস্থা ভালো না। প্রটেকশান লাগে।

আপনার জুতার সাইজ কত? কত নম্বর জুতা পরেন?

জুতার নাম্বার দিয়ে কী করবেন স্যার?

জানতে চাচ্ছি। জুতার সাইজটা দরকার।

আমি জুতা পরি না স্যার। সবসময় স্যান্ডেল। বাটা কোম্পানির স্যান্ডেল।

ঐদিন ফরিয়াদি নিশুর ঘর থেকে আপনাদের তিনবন্ধুর নিশ্চিন্ত মনে বের হবার কথা। আপোসের ঘটনা ঘটেছে। চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটে নি। কিন্তু আপনি স্যান্ডেল ফেলে বের হয়ে গেছেন। তিনজনের মধ্যে দুজনই স্যান্ডেল ফেলে গেছেন। পুলিশ আলামত হিসেবে দুজোড়া স্যান্ডেল জব্দ করেছে। এই স্যান্ডেল জোড়া আপনার না?

খলিল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে।

সালেহ ইমরান বললেন, ইওর অনার, এই আসামিকে আর জেরা করার কিছু নাই। পরেরজনকে জিজ্ঞেস করব।

জাজ সাহেব সেই দিনের মতো কোর্ট অ্যাডজনর্ড করে দিলেন। সালেহ ইমরান নিশুর দিকে এগিয়ে এলেন। নিশু উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে পানি। সালেহ ইমরান বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কনভিকশন হবে। সর্বোচ্চ সাজা হবে। এদের একজনকে আমি রাজসাক্ষী করার ব্যবস্থা করব।

নিশু বলল, সর্বোচ্চ শাস্তিটা কী?

নারী নির্যাতন আইনের দণ্ডবিধি ৯-এ যাবজ্জীবন। Please dont cry. আপনি সাহসী মেয়ে। সাহসী মেয়েরা কাঁদে না।

মতিন সালেহ ইমরানকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছে। তার ইচ্ছা গাড়িতে উঠার আগমুহূর্তে সে ধন্যবাদ-সূচক সুন্দর কিছু কথা বলবে। সুন্দর কথা গোছাতে পারছে না। তার চোখের সামনে এখনো আদালতের দৃশ্য ভাসছে। একটা নেকড়ে বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটার পর একটা কথা সাজিয়ে নেকড়েটাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। নেকড়ে কিছু বুঝতেই পারে নি।

সালেহ ইমরান গাড়ির দরজা খুলে বললেন, কিছু বলবে? থ্যাংকস দিতে চাও?

চাই স্যার।

থ্যাংকস কমলের মাকে দাও। আমি তার কথাতেই মামলা হাতে নিয়েছি।

উনাকেও থ্যাংকস দেব।

সালেহ ইমরান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আজকের দিনটা আমার জন্যে অশুভ।

কেন স্যার?

কমলের মা আমাকে ডিভোর্সের কাগজ পাঠিয়েছে। ঘটনাটা ঘটবে আমি জানতাম। নিজেকে তৈরিও করে রেখেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, যতটা প্রস্তুতি আমার মধ্যে ছিল বলে ভেবেছি ততটা ছিল না।

স্যার, খবরটা কি কমল জানে?

না, জানে না। তাকে জানাতে হবে। যা ঘটেছে যেভাবে ঘটেছে সবই বলতে হবে। তার কাছে কিছুই লুকানো যাবে না। তোমাকে এত কিছু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কমলের যদি কোনো মানসিক সাপোর্টের প্রয়োজন হয় তাকে তা দেবে।

জি স্যার।

তোমার পরিচিত একটি মেয়ে যে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে কি পাওয়া, গেছে?
জি-না স্যার।

ব্রোথেলে খোঁজ করো। হারিয়ে যাওয়া তরুণীদের শেষ আশ্রয় ব্রোথেল।

সালেহ ইমরান গাড়িতে উঠে পড়লেন।

২৯. এই জীবনটাও তো সুন্দর

রাত একটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত কমল কম্পিউটারে একটা গেম খেলল। একটা পঁচিশ থেকে দুটা দশ মিনিট পর্যন্ত ইন্টারনেটে The Chariot of Time বইটার অনুবাদক রবার্ট কিং সম্পর্কে খোজ বের করার চেষ্টা করল। বইটার মূল রাশিয়ান লেখক Yori Medvedev নিশ্চয়ই এই ভুল করেন নি। যেমন এক জায়গায় আছে–

I was with the contemplator of Heaven.

এটা ভুল। Heaven-এর আগে 'the' article বসবে। শুদ্ধটা হবে–

I was with the contemplator of the Heaven.

ইন্টারনেটে রবার্ট কিং নামের কোনো অনুবাদকের খোঁজ পাওয়া গেল না। তার কোনো ওয়েবসাইট থাকলে কমল সবগুলি ভুল পাঠিয়ে দিত। ভুল থাকা ঠিক না।

দুটা দশ থেকে দুটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ মিনিট সে খাওয়া দাওয়া করল। খাওয়ার মধ্যে ছিল–

একটা চকলেট–কিটকেট।

একটা বিসকিট। বিসকিটের নাম–Danisa Tradional Butter Cookies.

একগ্লাস অরেঞ্জ জুস।

দুটা পনেরো মিনিটে সে রুবিক কিউব নিয়ে বসল। পাজলটা সে তিনবার সলভ করল। তার সময় লাগল–

প্রথমবার ৬ মিনিট ২ সেকেন্ড

দ্বিতীয়বার ৫ মিনিট ০ সেকেন্ড

তৃতীয়বার ৫ মিনিট ১০ সেকেন্ড

এরপর সে দরজা খুলে বের হলো। তখন সময় ২টা ৩১ মিনিট ১২ সেকেন্ড। সে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িঘরের ছাদে পা ঝুলিয়ে বসতে সময় নিল বার মিনিট। ছাদে বসেই সে ঘড়ি দেখল। রেডিয়াম ডায়াল ঘড়ি অন্ধকারে দেখা যায়। ঘড়িতে বাজে দুটা তেতাল্লিশ মিনিট তের সেকেন্ড।

কমল সিঁড়িঘরের ছাদের শেষপ্রান্তে বসেছে। এখান থেকে পড়লে সাড়ে চারতলা থেকে পড়া হবে। তার মোটেই ভয় করছে না। কারণ তার Batophobia নেই। তার আছে–

Acousticophobia : Fear of noise.

Broutophobia : Fear of thunder storms.

Demophobia : Fear of crowds.

Ophthalmophobia : Fear of being stared at.

Osmophobia : Fear of smells.

ছাদের উপর জায়গাটা ঠাণ্ডা। সামনের দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। এটা ভালো। পেছন দিক থেকে বাতাস দিলে সে ঝুপ করে নিচে পড়ে যেত। উপর থেকে নিচের রাস্তা দেখতে ভালো লাগছে। যখন রাস্তায় মানুষ থাকে তখন দেখতে অন্যরকম লাগে। যখন মানুষ থাকে না, তখন আবার আরেকরকম লাগে। এখন রাস্তাটাকে নদীর মতো লাগছে। মনে হচ্ছে, একটা নদী সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। নদীর দুপাশে উঁচু উঁচু বিল্ডিং।

কমল পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন বের করল। এই টেলিফোন তার মা তাকে দিয়েছেন। সে এই টেলিফোন কখনো ব্যবহার করে না। আজ মাকে টেলিফোন করল। অনেকেই ঘুমুবার সময় টেলিফোন বন্ধ করে ঘুমায়। কমলের মা বলেছেন, তিনি কখনো তা করবেন না। টেলিফোন সবসময় হাতের কাছে রাখবেন। কমলের যখন দরকার হয়, তখনই যেন সে মার সঙ্গে যোগাযোগ। করতে পারে।

চারবার রিং বাজার পর মুনা ঘুম ঘুম গলায় বললেন, কে? কমল?

হ্যাঁ, মা।

এত রাতে তোমার টেলিফোন! কী সমস্যা? এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?

কমল বলল, আমি চিন্তা করছি। চিন্তা করার সময় জেগে থাকতে হয়। ঘুমিয়ে চিন্তা করা যায় না।

দিনেরবেলা চিন্তা করবে। এখন ঘুমুতে যাও। আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে তুমি বাতি নিভিয়ে বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে। এক... দুই...

মা শোন, তিন পর্যন্ত গোনার মধ্যে আমি বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারব। এক থেকে তিন গুনতে সময় লাগবে তিন সেকেন্ড। আমি যেখানে আছি সেখান থেকে ঘরে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুতে সময় লাগবে বার মিনিট।

তুমি কোথায় আছ?

সিঁড়িঘরের ছাদে।

Oh my God! তুমি সেখানে কী করছ?

তোমাকে তো বলেছি, চিন্তা করছি।

তুমি এক্ষুনি নেমে এসো। এক্ষুনি।

না। চিন্তা শেষ না করে নামব না। এমন হতে পারে চিন্তা শেষ করার পরেও নামব না। আমার এখানে বসে থাকতে ভালো লাগছে।

প্লিজ কমল, তুমি এসব কী বলছ? আমার হাত-পা কাঁপছে। তুমি কী নিয়ে চিন্তা করছ?

কমল বলল, আমি বেঁচে থাকলে আমার জন্যে ভালো হবে, না মরে গেলে আমার জন্যে ভালো হবে–এইটা নিয়ে চিন্তা করছি।

মুনা হতভম্ব গলায় বললেন, তুমি যে এখানে বসে আছ তোমার বাবা জানেন?

এই সময় কমল শুনল, পাশ থেকে কে যেন বলল, সমস্যা কী? কমল গলা চিনতে পারল, আহমেদ ফারুকের গলা। তিনি এত রাতে মার সঙ্গে আছেন? কমল বলল, মা, টেলিফোনটা আহমেদ ফারুককে দাও।

মুনা টেলিফোন রেখে দিলেন। কিংবা তার হাত থেকে টেলিফোন পড়ে গেল।

কমল ঘড়ি দেখল।

রাত তিনটা চল্লিশ মিনিট।

কমল আগের জায়গাতেই আছে। রাস্তায় পুলিশের একটা গাড়ি। দমকল বাহিনীর দুটা গাড়ি। কিছু লোকজনও দেখা যাচ্ছে। ছাদে সালেহ ইমরান দাঁড়িয়ে আছেন। সালেহ ইমরানের পাশে মুনা। মুনার চোখ লাল। তিনি একটু পরপর চোখ মুছছেন। একটু দূরে আহমেদ ফারুক। ফারুকের সঙ্গে দুজন পুলিশ অফিসার। পুলিশ অফিসার দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। তারা কেউ সিঁড়িঘরের ছাদের দিকে যাচ্ছেন না। কারণ কমল জানিয়ে দিয়েছে, কাউকে সে যদি ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে তাহলে সে উপর থেকে ঝাঁপ

দেবে। সালেহ ইমরান পুলিশ অফিসারকে জানিয়েছেন, কমল যা বলছে তা করবে। সে কখনো কাউকে ভয় দেখানোর জন্যে কিছু করে না।

তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মতিন এসে পৌঁছল। সে কারো সঙ্গেই কোনো কথা বলল না। সরাসরি সিঁড়িঘরের লোহার সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। স্বাভাবিক গলায় বলল, লমক মিআ কি বসআ? (কমল আমি কি আসব?)

কমল বলল, নকে বেসআ? (কেন আসবে?) ছিরক ন্তাচি মিআ। (আমি চিন্তা করছি।)

মতিন বলল, প্লিজ আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে দাও।

না।

মতিন বলল, মানুষ কেন আনন্দ পায়, কেন ভয় পায়, এটা আমি বের করেছি।

কমল বলল, সোআ লেহতা। (তাহলে আসো।)

মতিন সিঁড়ির দিকে না গিয়ে সালেহ ইমরানের দিকে এগিয়ে গেল। সালেহ ইমরান ধরা গলায় বললেন, প্লিজ লুক আফটার মাই সান।

মতিন এগিয়ে যাচ্ছে। তার পা টলছে। কমল বলল, তোমার কি Batophobia আছে?

Batophobia কী?

উচ্চতা ভীতি।

হ্যাঁ, আমার উচ্চতা ভীতি আছে। আমি দোতলা থেকে নিচে তাকাতে পারি না।

তুমি নিচের দিকে তাকিও না, তুমি আই লেভেলে তাকাও। আমার পাশে এসে বসো। কিন্তু খুব কাছে না। এমনভাবে বসবে যেন হাত দিয়ে আমাকে ছুঁতে না পার।

আমার মাথা ঘুরছে, আমি ছাদের এত কিনারায় যেতে পারব না। তুমি বরং আমার কাছে আসো।

কমল বলল, না। আমি যেখানে আছি সেখানে থাকব। এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দিতে সহজ হবে।

নিচে ঝাঁপ দেবে?

হ্যাঁ। কারণ আমি চিন্তা করে বের করেছি, আমি মরে গেলে আমার জন্যে ভালো হবে।

কীভাবে?

তুমি কাছে এসো তারপর বলব। হাঁমাগুড়ি দিয়ে আসো। নিচে না তাকিয়ে আসো।

মতিন হাঁমাগুড়ি দিয়ে এগুলো! কমলের পাশে বসল। এক পলকের জন্যে চোখ গেল নিচে। মতিনের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। তার মনে হলো, এক্ষুনি সে পড়ে যাবে। কমল বলল, তোমাকে বললাম না নিচে তাকাবে না। সবচে ভালো হয় যদি চোখ বন্ধ করে থাক।

মতিন সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ বন্ধ অবস্থাতেই ছাদের শেষপ্রান্তে এসে কামালের মতো পা ঝুলিয়ে বসল।

কমল বলল, এখন চোখ খোল।

মতিন বলল, আমি চোখ খুলব না। এখন তুমি বলো, কেন তুমি মরে গেলে তোমার জন্যে ভালো হবে? তোমার বাবা-মা কত কষ্ট পাবেন সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পারছি না। মানুষ শরীরে ব্যথা না পেয়েও কেন কষ্ট পায় আমি বুঝি না।

এই কষ্টকে বলে মানসিক কষ্ট। মনের কষ্ট।

কমল বলল, মন বলে কিছু নেই। কাজেই মনের কষ্টও নেই। এই কষ্ট আমরা নিজেরা বানিয়েছি। এই নিয়ে আমি আর কথা বলব না।

তুমি কি ঠিক করে ফেলেছ যে, নিচে ঝাঁপ দেবে?

হ্যাঁ।

কখন ঝাঁপ দেবে?

পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে।

পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে কেন? এখন না কেন?

কমল বলল, আজ সানরাইজ হবে পাঁচটা চল্লিশে। আমি সানরাইজ দেখব। Sun-কে বলব, হ্যালো! তারপর ঝাঁপ দেব। আমি সূর্য পছন্দ করি।

মতিন বলল, তুমি তোমার প্রিয়জনদের আর দেখবে না, এটা ভেবে খারাপ লাগছে না?

শুধু সালেহ ইমরানের জন্যে খারাপ লাগছে।

বাবাকে নাম ধরে ডাকছ কেন কমল?

উনি আমার বাবা না। আহমেদ ফারুক আমার বাবা।

তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ।

আহমেদ ফারুক যদি তোমার বাবা হন, তাতে সমস্যা কী? তুমি তোমার জীবন যাপন করছ। তোমার বাবার বা মার জীবন না।

কিন্তু আমার মন খারাপ।

একটু আগে তুমি বলেছ, মন বলে কিছু নেই। কাজেই মন খারাপও নেই।

আমি ভুল বলেছি। সরি।

কমল শোন, তুমি মানুষকে যন্ত্র ভাবো। মানুষ যন্ত্র না। মানুষ এমন যে, কোনো কারণ ছাড়াই সে কষ্ট পায়। আমি তোমার কেউ না, কিন্তু তুমি ঝাঁপ দিলে আমি প্রচণ্ড কষ্ট পাব।

কেন?

কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার মা যেমন তোমাকে ভালোবাসেন, তোমার বাবা যেমন তোমাকে ভালোবাসেন, আমিও বাসি। আমরা যে-কেউ তোমাকে বাঁচাবার জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত আছি।

তুমি কি সত্যি কথা বলছ? কেউ সত্যি কথা বলে না।

আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি নিচে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি, যদি তুমি প্রমিজ করো আমি ঝাঁপ দেবার পর তুমি তোমার মার কাছে ফেরত যাবে। আমি কিন্তু ঝাঁপ দেব।

কমল ঠাণ্ডা গলায় বলল, তাহলে ঝাঁপ দাও। আমি দেখতে চাই তুমি সত্যি কথা বলছ।

মতিন বলল, পাঁচটা চল্লিশ মিনিট হোক। সূর্যটা দেখে যাই।

তুমি সূর্য ভালোবাস?

মতিন বলল, উজবেক কবি নদ্দিউ নতিম খুব ভালোবাসেন। আমি ততটা বাসি না। কমল, তুমি ঘড়ি ধরে থাক। পাঁচটা চল্লিশ বাজবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলবে।

কমল চোখের সামনে ঘড়ি ধরল।

মতিন উঠে দাঁড়াল। বসে থেকে ঝাঁপ দেয়া সমস্যা। দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দেয়াই ভালো। মতিন তাকাল সালেহ ইমরানের দিকে। উঁচু গলায় বলল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। পাঁচটা চল্লিশ বাজতেই কমল আপনাদের কাছে ফিরে যাবে।

গভীর আনন্দ নিয়ে মতিন অপেক্ষা করছে। এই আনন্দের উৎস কী সে জানে না। কে যেন তার মাথার ভেতর বলল, ভালো দেখিয়েছ। কে বলল কথাটা কে জানে?

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পাঁচটা চল্লিশ বাজতে বেশি বাকি নেই।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট হাসপাতালের হিমশীতল একটি ঘর। মতিন শুয়ে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে, সে যেন অনন্তকাল এভাবেই শুয়ে ছিল। তার চেতনার একটি অংশ কাজ করে। সে শব্দ পায়। একবার তার কাছে মনে হলো, কমল এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। কমল বলল, আমি সরি বলতে এসেছি। একবার মনে হলো, কে যেন তার গায়ে হাত রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, আমি মৃন্ময়ী। কেন এরকম করলেন? কেন? সালেহ ইমরান সাহেব একবার বললেন, কমল আমার সঙ্গে থাকবে। সে পড়াশোনা করতে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড। কমল বলেছে সে সাধারণ মানুষ হবার চেষ্টা করবে। আবার মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে জগৎ

থেকে এক ছায়ামুর্তি বলে, আপনি হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কে আমাকে খুঁজে বের করবে? আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? মতিন ফিসফিস করে বলে, তুমি তৌ।

মতিনের সবচে ভালো লাগে যখন উজবেক কবি নদ্দিউ নতিম তার পাশে এসে বসেন। তাঁর গা থাকে আতরের গন্ধ ভেলে আসে। তিনি একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন। মতিনের মনে হয়, বাহ! এই জীবনটাও তো সুন্দর।